বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা
(১৯৫২ - ১৯৭২)

Ph.D.

সৈয়দা খালেদা জাহান

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ)

অক্টোবর ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা
(১৯৫২-১৯৭২)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা
(১৯৫২-১৯৭২)

সৈয়দা খালেদা জাহান

Dhaka University Library
400473

400473

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ)

অক্টোবর ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

১০ কার্তিক ১৪০৮

২৫ অক্টোবর ২০০১

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সৈয়দা খালেদা জাহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য আমার তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা' (১৯৫২–১৯৭২) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে তিনি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

নাটক হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনমুখী শিল্পকর্ম। শিল্পের মধ্যে প্রধানতঃ নাটকেই সমকালীন জীবন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঘনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়। রাজনৈতিক উত্থান-পতন, বিশেষ বিশেষ সামাজিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়, সমাজ ও জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক প্রতিরোধের রূপরেখাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের নাটক। সমকালীন রাজনীতি ও পরিবর্তনশীল সমাজের রূপান্তর বর্তমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য। বাহান্ন থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে রচিত বাংলাদেশের নাটকের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রয়াসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও আমার গবেষণা-নির্দেশক ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বিষয়টি গবেষণার জন্য নির্বাচিত করেন। তাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, উপদেশ ও নির্দেশনার ফলেই গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে মিসেস রাশিদা জামানও আমাকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

তথ্য সংগ্রহ ও লেখাপড়ার জন্য আমি বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার ও আরকাইভস, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ গ্রন্থাগার, কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠান আমাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

এ ছাড়াও গবেষণাকালীন সময়ে বিভিন্ন সুধীজনের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি। এ পর্যায়ে ডঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, ডঃ মোস্তফা নূরউল ইসলাম, ডঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ ও ডঃ সুকুমার বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিত্ব আমাকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে পিতা মরহুম সৈয়দ গোলাম মুস্তাফা (এ্যাডভোকেট), মা সৈয়দা জাহানারা বেগম, এক্সিম ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আমার জীবনসাথী মোহাম্মদ করিমুজ্জামান, নরওয়ে অবস্থানরত বার্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি গবেষক ও আমার একমাত্র অনুজ সৈয়দ আরিফ মুস্তাফা এবং আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রদ্বয় মোহাম্মদ রিফাত করিম ও রাহাত করিম-এর কাছে নানাভাবে ঋণী। বাংলা একাডেমীর গবেষণা সহকারী জনাব মোহাম্মদ আবদুল লতিফ তালুকদার প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সরবরাহ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়া জনাব মোঃ এমদাদুল হকের কাছেও আমি নানাভাবে ঋণী।

২৫ অক্টোবর ২০০১

(সৈয়দা খালেদা জাহান)
পি-এইচ. ডি গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা	:		১
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	দেশকাল ও সমাজ	১৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটক	৩৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	ষাট দশকে ছাত্র জনতার আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটকে তার প্রভাব	১২৪
চতর্থ পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ	২৪৫
উপসংহার	:		২৯৪
গ্রন্থপঞ্জি	:		২৯৯
সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা	:		৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশের নাটক—একটি পরাধীন জাতির দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের অনির্বাণ বাক-প্রতিমা, ব্যথা-বেদনা ভারাক্রান্ত স্মৃতিচারণ আর যুগ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট বিপ্লবী চেতনার শিল্পভাষ্য। সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগের পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়েছে। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসন কবলিত মানুষের ক্রমাগত সংগ্রামকে ধারণ এবং অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসকচক্রের সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ—নাট্যসৃষ্টির সুস্থ পরিবেশ রুদ্ধ করেছিল, বিপর্যস্ত যুগ পরিবেশে বাস করেও নাট্যকারবৃন্দ যুগ সংক্ষোভ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহকে অঙ্গীকার করে মহৎ শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁরা তাঁদের নাট্যসৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেছেন চারপাশের বাস্তব পরিমণ্ডল থেকে। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন, ষাটের দশকের স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ একের পর এক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাদের চিন্তা-চেতনাকে। তাঁরা হয়েছেন প্রতিবাদী, সংগ্রামী জনতার মুখপাত্র। তাঁদের নাটকে সমাজ জীবনের বিবিধ ঘটনা-সংঘাত, রাজনৈতিক তথ্য ও সত্যের উপস্থাপনা করেছেন বিচিত্র উপাচারে। স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকেও তাঁরা ছিলেন সত্যানুসন্ধানী, সংরক্ত সমকালস্পর্শী এবং প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা ও সমাজ ভাবনায় ঋদ্ধ। বাংলাদেশের নাটক তাই অনেকাংশেই রাজনীতি নির্ভর, সমাজ-জীবনের বিশ্বস্ত রূপকল্প।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তু সমস্যা বেড়ে যায়, ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভয়াবহ চাপের সৃষ্টি হয়। অবশ্য নব্যগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠার এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বিত্তবান হিন্দু মধ্যশ্রেণী পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একক আধিপত্য বজায় রেখেছিল। 'দেশ বিভাগের পর তারা ক্রমবর্ধমান হারে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ শুরু করলে স্থানীয় মুসলমান নাট্যকারদের আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সুযোগ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। নবোদ্ভুত পাকিস্তান রাষ্ট্রটির রাজনীতি ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্তির দিকে এগোতে থাকে, যার একদিকে অবস্থান নেয় রক্ষণশীল ইসলামি মৌলবাদ এবং অন্যদিকে একত্রিত হতে থাকে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী শক্তি।'[১] এই সময়ে রচিত নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও দুটি প্রধান ধারা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। রক্ষণশীল মৌলবাদীরা ইসলামি ঐতিহ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী লেখকবৃন্দের নাট্যসমূহে রাজনৈতিক অঙ্গীকার দ্বারা

---

১. সৈয়দ জামিল আহমেদ--হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

চিহ্নিত সামাজিক সচেতনতার প্রকাশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দ্বিবিধ ধারা ক্রমবর্ধমান হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। দেশ বিভাগের মধ্যেই উত্তপ্ত ছিল আরেকটি বিরুদ্ধ ভাবনা-স্রোত, সাম্প্রদায়িক ভাবনা নির্ভর খণ্ডিত মানসিকতা, যা এ সময়ে রচিত বিভিন্ন নাটকের উপজীব্য হয়েছে।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে রচিত নাটকের নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় :

ক. ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটকে তার প্রভাব

খ. ষাটের দশকে ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটকে তার প্রভাব

গ. বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ

ক) ভাষা-আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটকে তার প্রভাব

বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনকে ঘিরে বাংলাদেশের নাটকে রেনেসাঁপর্বের সূত্রপাত, ঐতিহাসিক নাট্যরচনার পটভূমি থেকে বাস্তব জীবন-ঘনিষ্ঠ নাটক রচনার ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়। নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে বসবাস করে দেশপ্রেমিক নাট্যকারবৃন্দ সংগ্রামী ও প্রতিবাদী চেতনাকে বুকে ধারণ করে নিরলস নাট্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটক রচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়, পাশাপাশি সমকালীন সমাজ জীবনও তাদের নাটকে দুর্লক্ষ্য নয়। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনকে ঘিরে এ দেশের নাট্যচর্চায় যে অধ্যায় সূচিত হয়েছে তা প্রধানত দুটি স্বতন্ত্র ধারাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। একটি রাজনৈতিক বিষয়কে উপজীব্য করে রচিত নাটক, অন্যটি সমসাময়িক সামাজিক জীবনকে ঘিরে রচিত নাটক।

সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়কে নিয়ে নাট্যরচনায় যারা উৎসাহী হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন মুনীর চৌধুরী ও আসকার ইবনে শাইখ। ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে মুনীর চৌধুরী লিখলেন তাঁর 'নষ্ট ছেলে' (১৯৫০)। রক্ষণশীল সামন্ত পরিবারের বিপ্লবী কন্যা 'রাশেদা' সরকারের ধামাধরা পিতা এরতাজুল করিমের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গৃহত্যাগ করে সংগ্রামী জীবন বেছে নিয়েছেন। সামন্ত পরিবার থেকেই তিনি সামন্ত বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা রাশেদার এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন, মেনে নিতে পারেন নি শুধু পুরোনো ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক সামন্ত চিন্তা-চেতনায় লালিত এরতাজুল করিম। প্রাচীন ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে ধরে বটবৃক্ষের মতো বসে আছেন। আসকার ইবনে শাইখের 'দুর্যোগ' (১৯৫১) নাটিকাতেও ভাষা আন্দোলনের প্রকাশ ঘটেছে। সামন্ত-প্রভু আখতার সাহেবের যাবতীয় প্রলোভন, কন্যা রিজিয়ার ভালোবাসা উপেক্ষা করেও আমজাদ মেহনতী জনতার ডাকে সাড়া দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দুর্যোগময় রাতে গৃহত্যাগ করেছে। কারাপ্রাচীরের অন্ধকারে বসে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটে যাওয়া মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে মুনীর চৌধুরী লিখলেন 'কবর' (১৯৫৩)। 'কবর' নাটকটি বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে প্রথম প্রতিবাদী চেতনা সমৃদ্ধ নাটক, এ নাটকে ছাত্র-জনতার সংগ্রামী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ভাষা-আন্দোলনের এই রক্ততিলক বুকে ধারণ করে মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের নাটকে এক নতুন গতিপথ সৃষ্টি করলেন। এ সময়ে রচিত নাটকে রাজনৈতিক সচেতনতার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতাও প্রতিফলিত হয়েছে।

বাহান্ন থেকে ষাট পর্যন্ত রচিত অধিকাংশ নাটকেই গ্রামীণ জীবন ও সমাজব্যবস্থার বিচিত্র চিত্র বহুবর্ণিল ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি এদেশের কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনার রূপায়ণ ঘটেছে। এই সময়সীমার মধ্যে রচিত নাটকের সংখ্যা একেবারে কম নয়। তবে একমাত্র 'বহিপীর' ছাড়া অন্য কোনো নাটকে আঙ্গিকগত নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়নি। সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকারবৃন্দ নাট্যকাহিনীর প্রেক্ষাপট সাজিয়েছেন। কোনো কোনো নাটকে একাধিক সামাজিক সমস্যার প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাট্যকারবৃন্দ হচ্ছেন ইব্রাহিম খাঁ, জসীম উদ্‌দীন, নূরুল মোমেন, আ. ন.ম. বজলুর রশীদ, শওকত ওসমান, আসকার ইবনে শাইখ, ওবায়েদ-উল-হক, ফররুখ শিয়র, আলি মনসুর, আবদুল হক, আশরাফ-উজ-জামান, আযীম উদ্দিন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, রাজিয়া খান প্রমুখ।

আসকার ইবনে শাইখের 'বিদ্রোহী পদ্মা' (১৯৫৩) পদ্মাতীরের মানুষের সংগ্রামী জীবনালেখ্য। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। জমিদারের অত্যাচারের পাশাপাশি শ্রেণী সংগ্রাম, গণচেতনা ও নির্যাতিত মানুষের দাবি প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করেছেন। আসকার ইবনে শাইখের 'দুরন্ত ঢেউ' (১৯৫৩) চারটি নাটিকা সংকলন। দুর্যোগ, আওয়াজ, যাত্রী, দুরন্ত ঢেউ। 'আওয়াজ' (১৯৫৩) নাটিকায় দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী চকদার দুর্ভিক্ষের সময় চাউল মজুত করে রাখে পরে জনতার চাপে চাউল গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়। চকদার তৎকালীন সামন্ত প্রভুদের সার্থক প্রতিনিধি, রশীদ নিপীড়িত জনতার প্রতিনিধি। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর জনগণের তীব্র ক্ষোভ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছে। পাশাপাশি সম্মিলিত জনতার ঐক্যবদ্ধতাও লক্ষ্য করা যায়। 'যাত্রী' (১৯৫৩) নাটিকায় শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চিত্রিত হয়েছে। মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী যুবক এসরার শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে তুলেছে। 'দুরন্ত ঢেউ' (১৯৫৩) নাটিকায় বাহান্নর প্রতিবাদের পর এদেশের প্রতিবাদী জনতা মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

শওকত ওসমানের 'বাগদাদের কবি' (১৯৫৩) নাটকে নাট্যকার সচেতনভাবে ভাষা-আন্দোলনসহ এদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত সমাজব্যবস্থায় জীবিকার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে ওবায়েদ-উল হকের 'এই পার্কে' (১৯৫৩) নাটকের পাত্র-পাত্রীরা। ফররুখ শিয়রের

Dhaka University Institutional Repository

'ব্ল্যাক মার্কেট' (১৯৫৩) নাটকে ব্ল্যাক মার্কেটের পাশাপাশি মোহাজের সমস্যা, জমিদারের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে সামন্ত প্রভুরা নিম্নবিত্ত মানুষের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। সুদখোর মহাজনদের চিত্রও এ নাটকে উপস্থিত। আসকার ইবনে শাইখের 'প্রতীক্ষা' (১৯৫৪) নাটক গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত। দুর্ভিক্ষের সময় সুযোগ সন্ধানী সমাজপতি কিভাবে গরিবদের শোষণ করে বিত্তের পাহাড় গড়ে তোলে সেটি তুলে ধরেছেন। মোসলেম উদ্দিনের 'তিতুমীর' (১৯৫৪) ইতিহাস আশ্রিত নাটক হলেও এর মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন। তিতুমীরকে প্রতীক হিসাবে কল্পনা করে এদেশের জনসাধারণকে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। আলি মনসুরের 'পোড়োবাড়ী' (১৯৫৫) গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত। জমিদারের অত্যাচারের পাশাপাশি গ্রামীণ যুবকদের আত্মসচেতনতা ও প্রতিবাদী জীবনচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করেছে। ইব্রাহিম খাঁর 'ঋণ পরিশোধ' (১৯৫৫) নাটকে গ্রামীণ সমাজের মিথ্যা আভিজাত্যের অহংবোধ চিত্রিত করা হয়েছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমস্যার চিত্রও আলোচিত হয়েছে। আসকার ইবনে শাইখের 'বিল বাওড়ের ঢেউ' (১৯৫৫) নাটকে গ্রাম বাঙলার জেলে সমাজের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং সংগ্রামে লিপ্ত জেলে সমাজের জাগরণ ও সমবায় সমিতি গঠনের দৃশ্যও তুলে ধরেছেন। আলি মনসুরের 'বোবামানুষ' (১৯৫৬) নাটকে দুর্ভিক্ষের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই সাথে দুর্ভিক্ষের বাজারে জোতদার ও মহাজনদের অসৎ অর্থোপার্জনের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। আবদুল হকের 'অদ্বিতীয়া' (১৯৫৬) চোরাকারবার, দুর্নীতি ও বহুবিবাহ সমস্যা নিয়ে রচিত। আশরাফ-উজ-জামানের 'সয়লাব' (১৯৫৬)-এর মধ্য দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণীর দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। জমিদারি প্রথা অবলুপ্ত প্রায়, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে সমাজ জীবনে পরিবর্তন এসেছে। পুরোনো মূল্যবোধ বাতিল হয়ে নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের 'মধুমালা' (১৯৫৬) লোকনাট্য। গ্রামীণ পরিবেশে একজোড়া নর-নারীর প্রেম ভালোবাসার দ্বন্দ্বমুখর জীবনচিত্র। 'পল্লীবধূ' (১৯৫৬) নাটকটিতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক শহুরে যুবকের উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। 'বাদলবাঁশি' (১৯৫৬) জসীম উদ্‌দীনের অপর নাটক। গ্রামীণ পরিবেশে একজোড়া নরনারীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'করিম খাঁ'র বাড়ী' (১৯৫৬) একাঙ্কিকায় গ্রামীণ জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। স্বল্পায়তন বিশিষ্ট এ নাটিকায় মানবীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

অগ্নিগিরি (১৯৫৯) নাটকে আসকার ইবনে শাইখ ফকির মজনু শাহ'র বীরত্বের কাহিনী স্মরণ করে বাংলার মানুষদের জাগিয়ে তুলেছেন। আসকার ইবনে শাইখের 'অনুবর্তন' (১৯৫৯) নাটকে অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আ.ন.ম. বজলুর রশীদের 'ঝড়ের পাখি' (১৯৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

নাটকে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অসঙ্গতির পাশাপাশি আধুনিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছৃঙ্খলতা, বস্তুবাদ, কৃত্রিমতা ও বিলাসবহুল পঙ্কিল জীবনধারার নানা দিক তুলে ধরেছেন।

আলাউদ্দিন-আল-আজাদ একজন সমাজ সচেতন ও সংবেদনশীল নাট্যকার। তাঁর 'মরক্কোর জাদুকর' (১৯৫৯) একটি প্রতীকধর্মী নাটক। সত্য-সুন্দর, কল্যাণ-ন্যায়ের প্রতীকরূপে আলাদ্দিনকে এবং জড় স্বার্থবাদী, অসত্যের প্রতীকরূপে জাদুকরকে কল্পনা করেছেন। পৃথিবীতে সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই নাট্যকারের কাম্য। ফররুখ শিয়রের 'সামনের পৃথিবী' (১৯৬০) নাটকে আবহমান গ্রাম বাঙলার জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামের যুবক মানিক শহরে থেকে লেখাপড়া করে এবং পরবর্তীতে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। বংশমর্যাদা নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে এ নাটকে। গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণকে শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলা হয়েছে। কুচক্রী দবির উদ্দিনের চক্রান্তে গ্রামের সহজ সরল লোকদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। আযীমউদ্দীনের 'মা' (১৯৬০) নাটকটিতে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অধ্যক্ষ মি. আলমকে প্রতীক হিসাবে কল্পনা করে নাট্যকার মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছেন। আযীমউদ্দীনের 'অহংকার' (১৯৬০) নাটকে খান্দান ও বংশ মর্যাদাবোধের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চিত্রিত হয়েছে। কাজী-গাজী পরিবারের মধ্যে যে খান্দান ভিত্তিক সমস্যা সেটি তুলে ধরা হয়েছে। রাজিয়া খানের 'আবর্ত' (১৯৬০) নাটকে নাট্যকার মফস্বল শহরে আধুনিকতার স্পর্শ লেগে বাহ্যিক চাকচিক্য নির্ভর যে কৃত্রিম নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে আধুনিক চিন্তা-চেতনাসমৃদ্ধ রুচিবান মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চিত্রিত করেছেন। নুরুল মোমেনের 'যদি এমন হোত' (১৯৬০) নাটকে দেশের তরুণ সম্প্রদায় সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে এসেছে, গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছে। 'যদি এমন হোত' নাটকে সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারই নাট্যকারের মূল লক্ষ্য। 'বহিপীর' (১৯৬০) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একটি ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যপ্রয়াস। সামন্তযুগীয় মূল্যবোধের সঙ্গে নবজাগ্রত চেতনার সংঘাত এবং নবজাগ্রত চেতনার বিজয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে। আবদুল মতিন সরকার-এর 'অভ্যুদয়' (১৯৬০) নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত। প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে চিন্তা-চেতনার যে বৈপরীত্য সেটিও নাট্যকার তুলে ধরেছেন। পরবর্তীতে প্রবীণরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নবীনদের স্বাগত জানিয়েছেন।

খ. ষাটের দশকের ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটকে তার প্রভাব

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে এদেশের নাট্যচর্চায় যে প্রতিবাদী ধারা সংযোজিত হয়েছিল ষাটের দশকে সামাজিক শাসনের কঠোরতা নেমে এলে প্রগতিশীল মধ্যশ্রেণীর নাট্যকর্মীদের চিন্তা-চেতনায় কিছুটা

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যদিও এ সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাটক রচিত হয়েছে, শিল্পিত, সমাজ মনস্ক আধুনিক নাটক রচনার পাশাপাশি ইউরোপীয় আঙ্গিক সমৃদ্ধ নাটকও রচিত হয়েছে। মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' , 'চিঠি', 'দণ্ডকারণ্য', 'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'তরঙ্গভঙ্গ', 'সুড়ঙ্গ', 'উজানে মৃত্যু', সিকানদার আবু জাফর-এর 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা', 'শকুন্ত উপাখ্যান', 'মাকড়সা', আসকার ইবনে শাইখের 'রক্তপদ্ম', 'অনেক তারার হাতছানি', 'শেষ অধ্যায়', 'প্রচ্ছদপট', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ইহুদির মেয়ে', 'মায়াবী প্রহর', 'ধন্যবাদ', সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' 'মাইলপোস্ট', 'তৃষ্ণায়' সমকালীন সময়ের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটকে দুটি স্বতন্ত্র ধারার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাসমৃদ্ধ নাটক, দ্বিতীয়ত, সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নাটক।

সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়কে নিয়ে যারা প্রতিবাদী নাট্যরচনা করেছেন তারা হলেন, আসকার ইবনে শাইখ, মুনীর চৌধুরী ও সিকান্‌দার আবু জাফর। সমকালীন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আসকার ইবনে শাইখ লিখলেন 'অনেক তারার হাতছানি' (১৯৬৫)। এ নাটকে নাট্যকার ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে ১৯৬২ সালে সংঘটিত এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন। নাটকের এক প্রান্তে আছে স্বদেশের প্রতি তীব্র অনুরাগ, অন্য প্রান্তে আছে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। ১৮৫৭ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চিত্র তুলে ধরে নাট্যকার দেশের তরুণ সমাজকে জাগিয়ে তুলেছেন। ১৯৬২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির পটভূমিতে রচিত মুনীর চৌধুরীর কৌতুক নাট্য 'চিঠি' (১৯৬৬)। তাঁর 'চিঠি' নাটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে সমস্ত সমস্যা তুলে ধরেছেন যা ছিল চিরন্তন সমস্যা। ছাত্রদের পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন ও সংঘর্ষ ; ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়ঘটিত দ্বন্দ্ব, পরীক্ষায় উচ্চস্থান দখলের প্রতিযোগিতা, প্রক্টরের ক্ষমতা প্রয়োগ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সূক্ষ্ম ঘটনাগুলো তিনি কৌতুক রসের আবরণে চিঠিতে উপস্থাপন করেছেন। এ নাটকে প্রতিফলিত ঘটনাবলী সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে রচিত সিকান্‌দার আবু জাফরের রূপক নাটক 'মাকড়সা' (১৩৬৬)। 'মাকড়সা' একাঙ্কিকায় বর্ণিত পাঁচজন সাক্ষীই আসামির বিরুদ্ধে স্বপ্নচুরির অভিযোগ এনেছে। এই স্বপ্নচোর আসামি আর কেউ নয়, তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খান। সমাজে প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাটকগুলো রচিত হয়েছিল। ষাটের দশকে রচিত নাট্যসমূহে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতাও লক্ষ্য করা যায়।

আসকার ইবনে শাইখের 'রক্তপদ্ম' (১৯৬২) ইতিহাস আশ্রিত নাটক হলেও সমাজের সকল স্তরের মানুষের সংগ্রামী চেতনা নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে অবলম্বন করে রচিত। এ নাটকে নাট্যকারের যুদ্ধবিরোধী, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনা প্রতিফলিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। নুরুল মোমেনের 'নয়াখান্দান' (১৯৬২) সামাজিক নাটক। এ নাটকে প্রাচীন বংশ মর্যাদাবোধের অহংবোধকে দূরীভূত করে নয়াখান্দান সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই খান্দানের ধারক ও বাহক তথাকথিত অভিজাত শ্রেণী নয়, এরা হচ্ছে সমাজের সাধারণ মানুষ। আভিজাত্য ও খান্দানের অহংবোধ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তা নিয়ে আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখেছেন 'ইহুদির মেয়ে' (১৯৬২)। এ নাটকে কাব্য-নাট্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নুরুল মোমেন-এর 'আলোছায়া' (১৯৬২) কমেডি নাটক। এ নাটকে একজন শিল্পপতির পারিবারিক জীবন ও নানাবিধ সমস্যার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তবে সমাজ জীবনের বৃহত্তর কোনো সমস্যার চিত্র এ নাটকে অঙ্কিত হয়নি। আলাউদ্দিন আল আজাদের 'মায়াবী প্রহর' (১৯৬২) ট্রাজি-কমেডি। এ নাটকে চোরাকারবার ও দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ অফিসারের উৎকোচ গ্রহণের পাশাপাশি নাট্যকারের শ্রেণী সচেতনতা বিদ্যমান। আ.ন.ম. বজলুর রশীদের 'যা' হতে পারে' (১৯৬২) নাটকটি আধুনিক নগর জীবন ও তার বিচিত্র সমস্যা নিয়ে রচিত। আভিজাত্যের মোহ, বংশ গরিমার মিথ্যা অহংবোধ ভেঙ্গে দিয়ে তিনি আদর্শ ও নীতি প্রচার করেছেন। আসকার ইবনে শাইখের 'এপার ওপার' (১৯৬২) গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত। এ নাটকে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামের কৃষক, মজুর, তাঁতি, জেলে—সর্বশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। নাটকে বর্ণিত আসাদ চরিত্রটি আদর্শের ধারক ও বাহক। সে গ্রামবাসীদের মধ্যে নবজাগরণের সঞ্চার করেছে। আযীম উদ্‌দীনের 'কাঞ্চন' (১৯৬২) লোককাহিনী ভিত্তিক নাটক। হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথাকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' (১৯৬৩) নাটকটি। দরিদ্র স্কুল শিক্ষক মজিদ মাস্টারের জীবনের করুণ আলেখ্য এ নাটকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিকূল পরিবেশের শিকার দরিদ্র, অসহায় স্কুল শিক্ষক মজিদ মাস্টারের জীবন চিত্র যেন সমকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব কাহিনীর রূপকল্প। আ.ন.ম. বজলুর রশীদের 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৬৪) নাটকে আধুনিক সমাজ জীবন ও নগরকেন্দ্রিকতাকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন, পাশাপাশি আদর্শ ও নীতিবাদ প্রচারিত হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর 'ধন্যবাদ' নাটকে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকবর্গের প্রসাদপুষ্ট দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নব্য শিক্ষিত প্রতিবাদী যুবক আনিসের সোচ্চার কণ্ঠ শোনা যায়। গ্রামের নির্যাতিত, অবহেলিত মানুষের প্রতিনিধি আনিসের বিপ্লবী কণ্ঠে সমকালীন সামন্ত-প্রভুদের শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ষাটের দশকে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে কয়েকজন নাট্যকার আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাদেরই একজন। তাঁর নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় ভাবচেতনা ও নাট্যকৌশল সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে আমেনা নাম্নী একজন অসহায় রমণীর স্বীয় স্বামী ও সন্তান হত্যার কাহিনী নিয়ে লিখিত নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৪)। এই নাটকের পাত্র-পাত্রীরা সমাজ বাস্তবতা ও প্রতিকূল পরিবেশের শিকার। পরাধীনতার

Dhaka University Institutional Repository

গ্লানি, হতাশা-নৈরাশ্য, আত্মিক শূন্যতাবোধ ও সামাজিক অবক্ষয় যখন মানুষের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন আশাবাদ ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় তখন সেই বিপ্রতীপ পরিবেশে অবস্থান করে মানব সত্তার যন্ত্রণাময় অনুভূতিকে রূপায়ণের প্রয়োজনেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে অভিব্যক্তিবাদী রীতিকে বেছে নিয়েছেন। সামরিক শাসনে অবরুদ্ধ নাট্যকারবৃন্দ কখনও কখনও রূপকের আশ্রয়ও নিয়েছেন। 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪) নাটকের কাহিনী রহস্যমণ্ডিত, অবিশ্বাস্য এবং এই রহস্য আর অবিশ্বাসের পটভূমিতেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নির্মাণ করেছেন মানুষের অন্তর্চেতনার অদৃশ্য গোপন জগৎ। এই নাট্যকাহিনীর ধোঁয়াটে অস্পষ্ট জগৎ ও সামঞ্জস্যহীন, আপাত বিচ্ছিন্ন সংলাপ নাটকে সংযোজন করেছে এ্যাবসার্ডধর্মী শিল্পমাত্রা। তাঁর অপর নাটিকা 'উজানে মৃত্যু'র নায়ক একজন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ও জীবনযুদ্ধে পরাজিত নৌকাচালক। অপর দুটি চরিত্র সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ও কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি। আধুনিক যুগ-যন্ত্রণা, অন্তহীন শূন্যতা, ক্লান্তি, নৈরাশ্য ও অন্তহীন প্রতীক্ষা 'উজানে মৃত্যু'র কেন্দ্রীয় বিষয়। কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ও সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার নৌকাবাহকের অবচেতন মনের সত্য-অসত্য কল্যাণ-অকল্যাণের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত রূপটি চিত্রিত করেছেন।

সামাজিক স্তর বিন্যাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আনিস চৌধুরীর 'এ্যালবাম' (১৯৬৫) নাটকের প্রেক্ষাপট। সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারকে পাশাপাশি উপস্থাপন করে তাদের সমস্যার চিত্রায়ণ করেছেন এবং সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। অধ্যাপক ইনামের মুখে প্রচারিত আদর্শবাদ মূলত নাট্যকারের নিজস্ব ভাবনার ফসল। আভিজাত্যবোধ ও খান্দানের অহংবোধ দূর করে মানুষকে যথার্থ মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন আ.ন.ম. বজলুর রশীদ-এর 'সংযুক্তা' (১৯৬৫) নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়। এ নাটকে আদর্শ ও নীতিবাদ প্রচারিত হয়েছে। লিলি আনোয়ারের মতো শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা দেশ সেবায় এগিয়ে এলে এদেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সিকান্‌দার আবু জাফর-এর ঐতিহাসিক নাটক সিরাজ-উ-দ্দৌলা (১৯৬৫)। নাট্যকার এ নাট্যকাহিনীতে সিরাজকে দেশপ্রেমিক, সাহসী ও নির্ভিক যোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্রিটিশ আন্দোলনের পরাজিত নায়ককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এদেশের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত জনতাকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে মুনীর চৌধুরীর 'মানুষ' (১৯৬৬) একাঙ্কিকাটি রচিত। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের বড় ছেলে মোর্শেদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়েছে, ঘরে ছোট খোকা খুব অসুস্থ। খোকার মুমূর্ষু অবস্থায় মা খুব বিচলিত। ঠিক এমনি সময় প্রাণভয়ে এক হিন্দু ডাক্তার মুসলিম পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাক্তারের চিকিৎসায় খোকা সুস্থ হয়ে ওঠে। পাড়ার মুসলমান ছেলেরা হিন্দু ডাক্তারকে খুঁজতে এলে মা তাকে মশারির ভিতর আশ্রয় দিয়ে তার জীবন রক্ষা করেছেন। মুনীর চৌধুরীর দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬) নাট্যগ্রন্থের প্রথম নাটিকা 'দণ্ড'। এ নাটিকায় স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বমুখর

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের মধ্যে আকস্মিকভাবে এক চোরের আবির্ভাবে দু'জনের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। 'দণ্ডধর' নাটিকাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রচিত। এই নাটিকায় চারজন প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ঘটিত অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংঘাত চিত্রিত হয়েছে। এখানেও এক চোরের আবির্ভাব নাটকে প্রাণসঞ্চার করে কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জাহানারার হৃদয়ে সেলিমের স্থান পাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দেয় দণ্ডধারী চোরটি। 'দণ্ডকারণ্য' নাটিকায় পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিতে নাট্যকার বর্তমান সমাজের আধুনিক নর-নারীর চিত্তবৃত্তির বহুমুখী বিকাশকে চিত্রিত করেছেন। এ নাটকে নাট্যকার পুরোনো ঐতিহ্যের নবায়ন করেছেন। সংলাপ রচনা ও বিষয়বস্তু নির্মাণে এ্যাবসার্ডরীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে অবস্থান করে পাখির রূপকে সিকান্দার আবু জাফর লিখেছেন 'শকুন্ত উপাখ্যান' (১৯৬৮)। নাট্যকার যুদ্ধ নয়, শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ জীবন কামনা করেছেন। পূর্ববাঙলার দক্ষিণাঞ্চলে সংঘটিত ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের পটভূমিতে সাঈদ আহমদ লিখেছেন তাঁর এ্যাবসার্ডধর্মী নাটক 'কালবেলা'। চট্টগ্রাম এলাকার একটি ছোট্ট দ্বীপ আলেকজাণ্ডারের মানুষগুলোর জীবনে প্রলয়ঙ্কারী জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা নেমে আসবে জেনেও তাঁরা তাঁদের অতীত স্মৃতিচারণ করেছে। তাদের নিরর্থক কালক্ষেপণ, সঙ্গতিহীন কথোপকথন, স্মৃতি-স্বপ্ন, হতাশা-নিরাশার প্রেক্ষাপটে নেমে আসে এক ভয়াবহ শূন্যতা। প্রকাশরীতির অভিনবত্বে, শিল্পকলার মুন্সীয়ানায় 'কালবেলা' নাট্যসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আ.ন.ম. বজলুর রশীদের শিলা ও শৈলী (১৯৬৭) সমকালীন বাঙালি জীবন ও যৌথ খামার এবং কৃষি আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। 'সত্য-সুন্দর সমিতির' মাধ্যমে এদেশের জনসাধারণকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আ.ন.ম. বজলুর রশীদের 'সুর ও ছন্দ' (১৯৬৭) নাটকে শিক্ষক মুনীর সাহেব ও তাঁর কন্যা লীনার মধ্য দিয়ে আদর্শ ও নীতি প্রচার করেছেন। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় আচ্ছন্ন শরীফের কুরুচিপূর্ণ আচার আচরণকে তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। নুরুল মোমেনের 'আইনের অন্তরালে' (১৯৬৭) সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। আইনকে সামনে রেখে আদালত প্রাঙ্গণের দুর্নীতি, অসমতা ও অসদাচরণ তিনি বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত করেছেন। নাট্যকার চারজন উকিলের মাধ্যমে শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় এবং ভালো-মন্দের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তা তুলে ধরেছেন, পরিশেষে সত্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে। 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬৮) শওকত ওসমান ও রামেন্দু মজুমদারের যৌথ নাট্যকর্ম। স্বৈরাচারী বাদশাহ-হারুনর রশীদ গোলাম বাদির স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে মুগ্ধ হন। বাদশাহ মেহেরজানকে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর গোলাম তাতারীর হাসি হারিয়ে যায়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্য কোনোটিই গোলামের মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি। পরিশেষে বাদশাহের শত অত্যাচারেও সে হাসতে পারেনি, তাতারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নাটকের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করে নাট্যকারদ্বয় বর্তমান সময়কে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। শৃঙ্খলবন্দি বাঙালিদের মর্মবেদনা উপলব্ধি করে তাঁরা লিখেছেন 'ক্রীতদাসের হাসি'।

নব্যগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে মুনীর চৌধুরী লিখেছেন 'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য' (১৯৬২)। এ গ্রন্থের প্রথম একাঙ্কিকা 'পলাশী ব্যারাক'। ব্যারাকের নিম্নবিত্ত মানুষের সমস্যা-সংকুল জীবনকে উপস্থাপন করে তিনি সরকারের রাষ্ট্রীয় অবস্থার মর্মমূলে আঘাত হেনেছেন। রাজনীতি সচেতন নাট্যকার মুনীর চৌধুরী পুলিশের কার্যক্রম তৎপরতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে 'ফিট কলাম' নাটিকাটি রচনা করেছেন। শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গোয়েন্দা পুলিশের নির্মম তৎপরতা, অন্যদিকে মুছল্লীদের শরিয়তের বিধি নিষেধ প্রচারে কঠোরতার প্রতি নাট্যকার তির্যক কটাক্ষপাত করেছেন। 'আপনি কে' নাটিকার কাহিনী বিন্যাস হয়েছে গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকাণ্ড নিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিছক বিনোদনমূলক বনভোজনের মধ্যেও তারা রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার লক্ষণ খুঁজে পেতো এই কারণেই বনভোজনে গোয়েন্দা পুলিশ প্রেরণ করতো। 'একতালা দোতলা' নাটিকায় পূর্ব-পশ্চিম দুই মেরুর বাসিন্দার প্রেম, আপাত বিরোধ, সংঘাত শেষ পর্যন্ত মিলনের মধ্য দিয়ে নাটিকার যবনিকাপাত ঘটেছে। 'মিলিটারী' একাঙ্কিকাটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। দাঙ্গা কবলিত শহরে সান্ধ্য আইন জারি হলেও এক মুসলমান তরুণ সাংবাদিক তার হিন্দু প্রেমিককে নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে। নাটকে নাট্যকারের উদার মানবতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে। 'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য' গ্রন্থের সর্বশেষ একাঙ্কিকা বংশধর। মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনকাহিনী এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। এক বাঁদরের উৎপাতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। তরুণ সাংবাদিক আশরাফের সহায়তায় বাঁদরটি ধরা পড়ে এবং আশরাফ-আমেনার প্রেমের পরিণতির ইঙ্গিত দিয়ে নাটিকার যবনিকাপাত ঘটেছে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক চেতনাকে কেন্দ্র করে রচিত 'একটি মশা'। 'নেতা' একাঙ্কিকায় পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। 'গুণ্ডা' নাটিকাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্বাচনের নেপথ্যে আনু ও আলমের রাগ অনুরাগ, মান-অভিমানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'বেশরিয়তি' নাটিকায় তৎকালীন মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা ও রক্ষণশীলতার অন্তরালে একজোড়া নরনারীর প্রেমকাহিনীকে চিত্রিত করা হয়েছে।

আ.ন.ম. বজলুর রশীদ-এর 'একে একে এক' (১৯৬৯) নাটকে আধুনিক সমাজ জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা, অতি আধুনিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা কিভাবে মানব জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তারই বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নুরুল মোমেনের 'শতকরা আশি' (১৯৬৯) নাটকটি সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াসে রচিত। এ নাটকে নাট্যকার নিরক্ষর মানুষের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সংশোধনের পথও বাতলে দিয়েছেন। 'রূপান্তর' (১৯৬৯) নাটকে আ.ন.ম. বজলুর রশীদ নীতি ও আদর্শ প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার চিত্রও তুলে ধরেছেন। আ.ন.ম. বজলুর রশীদের 'ধানকমল' (১৯৬৯) নাটকটিতে গ্রামীণ জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামীণ জীবনের সহজ সরল চিত্র রূপায়ণের পাশাপাশি মিয়া সাহেবের কুটিলতা, ষড়যন্ত্রও তুলে ধরেছেন। পরিশেষে গ্রামের মানুষের মধ্যে নবজীবন চেতনার সঞ্চার করে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন। নুরুল মোমেনের 'যেমন ইচ্ছা তেমন' (১৯৭০) একটি সামাজিক নাটক। দু' জোড়া নরনারীর প্রেমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। আধুনিক মহিলাদের অর্থ ও বিত্তের প্রতি যে মোহ সেটা সংসার জীবনে যে ভয়াবহ অশান্তির সৃষ্টি করেছে তেমনি সমাজ জীবনেও অভিশাপ বয়ে এনেছে। 'রূপলেখা' (১৯৭০) নাটকটিতে শিক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রসঙ্গটি বিশ্লেষিত হয়েছে। নাট্যকার নুরুল মোমেন শেষ পর্যন্ত subjective ও objective দুটি পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন। 'হোসেন সফদারের উইল' (১৯৭০) নাটকটিতে পারিবারিক হিংসা বিদ্বেষ ও সম্পত্তি নিয়ে বিভ্রাটের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আদর্শবাদী ইশতিয়াক শূন্য থেকে জীবন শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আসকার ইবনে শাইখের 'শেষ অধ্যায়' (১৯৭০) নাটকে জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের পাশাপাশি তরুণদের সমাজবাদী স্বপ্ন, চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। পুরোনো ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে, শিল্পযুগের সূত্রপাত ঘটেছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রেজা সাহেব সামন্ত আশ্রয়ী ধ্যান-ধারণার জটাজাল ছিন্ন করে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছেন এবং নতুনকে বরণ করে নিয়েছেন। আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে 'প্রচ্ছদপট' (১৯৭০) নাটকটি। নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখের দেখা তেইশ বছরের সমাজব্যবস্থাকে তিনি এ নাটকে তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় মানুষকে শোষণ করে সমাজের বিত্তবান জমিদার শওকত খান অর্থ-বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। তার একমাত্র পুত্র জাহেদ অধঃপতনের চরম স্তরে পৌছে গেছে। তবুও জমিদার সাহেবের বিবেকবোধ জাগ্রত হয়নি। নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে কোনো অনুশোচনা দেখা যায়নি।

সাঈদ আহমদ-এর 'মাইল পোস্ট' নাটকটি দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত। জড়পদার্থ মাইল পোস্টকে ঘিরে নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। এ নাটকে প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তাই নাটকের শেষে নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র মাইল পোস্টটির ঘাড় ভেঙ্গে দিয়ে অসহায় মানুষগুলো নিজেদের গন্তব্যস্থল সন্ধান করেছে। সাঈদ আহমদ প্রচলিত লোককাহিনীকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে সাজিয়েছেন 'তৃষ্ণায়' নাটকে। বহুল প্রচারিত কুমীর ছানা ও শেয়াল পণ্ডিতের লোকজ কাহিনীর অন্তরালে উপস্থাপিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী চেতনা। জিয়া হায়দারের 'শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ' (১৯৭০) রূপকধর্মী নাটক। চারজন শান্তিগড়ের যাত্রী একটি ছোট্ট ওয়েটিং রুমে তারা অপেক্ষমান। শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী, আনন্দ—প্রতিটি চরিত্র প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। শান্তির রাজ্যে পৌছুতে যে

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্রতার প্রয়োজন যাত্রীদের চরিত্রে তা অনুপস্থিত, তাই তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত গ্রাম 'শান্তি গড়ে' পৌছুতে পারেনি। কাহিনীর বৃত্তায়ণে, শিল্পকলার নৈপুণ্যে নাটকটি তাঁর চমৎকার সৃষ্টি।

গ. বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি জাতির জীবনে নেমে আসে এক ভয়াবহ বিপর্যয়। রাতের অন্ধকারে বর্বর পাকবাহিনী নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, মর্টার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুদীর্ঘ নয় মাস ধরে অমানবিক অত্যাচার, গণহত্যা, লুণ্ঠন আর ধর্ষণ চলতে থাকে। কিন্তু এদেশের জনসাধারণও মুখ বুঁজে বসে থাকেনি। তারা এই নির্যাতন, হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। স্বৈরাচারী শাসকবর্গের এই সমস্ত নির্যাতন আর নিপীড়নের বহু ঘটনা সমকালীন সাহিত্যের পাতায় স্থান পেয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের সেই অভিজ্ঞতা নির্ভর সাহিত্যধারাটি বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের রক্তকরোজ্জ্বল দিনগুলোকে ঘিরে যাঁরা নাট্যরচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন তাঁরা হলেন মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ, কল্যাণ মিত্র ও আলাউদ্দিন আল আজাদ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ লিখেছেন 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (১৯৭১) এবারের সংগ্রাম (১৯৭১), স্বাধীনতার সংগ্রাম (১৯৭১), কল্যাণ মিত্র লিখেছেন 'জল্লাদের দরবার' (১৯৭১), 'একটি জাতি একটি ইতিহাস' (১৯৭২)। মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে রচিত এই সমস্ত নাটক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এদেশের জনসাধারণের প্রেরণার উৎস ছিল। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত কাল পরবর্তী সময়ে মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ লিখেছেন 'বর্ণচোরা' (১৯৭২), আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নিশব্দ যাত্রা' (১৯৭২) ও 'নরকে লাল গোলাপ' (১৯৭২) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ লিখেছেন 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'। ছোট দারোগা নূর মোহাম্মদ ও সিপাহী দলিলুর রহমান কড়া পাহাড়ায় নিয়োজিত, পাকিস্তান সরকার ঘোষণা দিয়েছে বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবে। কর্তব্যরত দারোগা নূর মোহাম্মদ এদেশেরই সন্তান, সে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে, বর্তমানে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর তাবেদার। স্বল্প বেতনের সামান্য চাকুরিজীবী, অভাবগ্রস্ত দুঃখী পরিবারের একজন সদস্য সে। নদীর ঘাটে ছদ্মবেশী মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাকে হাতের নাগালে পেয়েও সে ছেড়ে দিয়েছে এবং সহকারী দলিলুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করেছে। 'এবারের সংগ্রাম' নাটকে মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকবর্গের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানি শাসকবর্গ এদেশের জনসাধারণকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানে বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছে। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ

দলে পরিণত হলে ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভূট্টোর পরামর্শে ক্ষমতা হস্তান্তরের তাল বাহানা শুরু করেন। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে কড়া সামরিক প্রহরাধীনে ঢাকা বিমান বন্দরে, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তানি সৈন্য ও অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত করেন। সকল প্রস্তুতি শেষে ইয়াহিয়া খান রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে পাক হানাদার বাহিনীকে এদেশের নিরীহ জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে যান। নিরস্ত্র বাঙালিও চুপ করে বসে থাকেনি। তারা তাদের অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকবর্গ এদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। নাট্যকার এ নাটকে মানুষ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের দৃঢ় মনোবল ও আত্মপ্রত্যায়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ নাটকে নাট্যকার বর্গী ও দুখুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শোষকদের শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। ঝগড়ুর সংলাপে তাদের সেই পাশবিক অত্যাচার এবং হত্যাযজ্ঞের মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক দৃশ্য প্রকট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের শুরুতে তারা পূর্ববাঙলার মানুষদের নিরস্ত্র করে রেখেছিল। এরপর গভীর রাতে এদেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, গায়ক, শ্রমজীবী মানুষ নির্বিশেষে হত্যা করে বধ্যভূমিতে ফেলে দেয়। বাঙালিদের একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে মরণঘাতী সংগ্রামে লেলিয়ে দিয়েছে। নাটকের শেষে ঝগড়ু ও দুখু বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, ঝগড়ু হুকমতকে, দুখু বর্গীকে জাপটে ধরে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে।

কল্যাণ মিত্র তার ‘জল্লাদের দরবার’ (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড) নাটকে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনার পাশাপাশি শাসকবর্গের অত্যাচারের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা তুলে ধরেছেন। ‘জল্লাদের দরবার’ নাটকের বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে ফতে খান, টিটিয়া খান, নবাব, নিয়াজী, জেনারেল হামিদ, নুরুল আমিন, দান্দাল, মোনেম খান প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপন করেছেন। নাটকের শুরুতেই দেখা যায়, অত্যাচারী শাসক ফতে খান দুঃস্বপ্ন দেখছেন জনতার আদালতে তার বিচার হচ্ছে, আদালতে বিচারকের আসনে উপবিষ্ট দুর্মুখ খান। পট পরিবর্তিত হয়েছে, তিনি টিটিয়া খানকে জরুরি তলব পাঠিয়েছেন, লারকানার নবাবও এসে উপস্থিত হয়েছেন। চারমাস ধরে যুদ্ধ করে তাদের চার হাজার সৈন্য নিহত হয়েছে, বিশ্বজনমতও বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তারা কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছেন না। ফতে খানের কাছে লারকানার নবাব পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা দাবি করেছেন, টিটিয়া খান মসনদ দাবি করেছেন। চারদিকের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিনি সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অন্ধকারে অশরীরী বস্তু দর্শন করতে শুরু করেছেন। নাট্যকার মাঝে মাঝে ন্যায় ও সত্যকামী দুর্মুখ খাঁকে উপস্থাপন করে সমকালীন রাজনৈতিক সত্যকে তুলে ধরেছেন। ষাটের দশক থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পুরো সময়টাই এ নাটকে চিত্রিত হয়েছে। প্রবল প্রতাপশালী পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এদেশের সংগ্রামী মানুষের কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলো কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থ হয়েছে। গণহত্যা, পাশবিক অত্যাচার আর ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়েও বাঙালি জাতি স্বাধীনসত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দীর্ঘ নয় মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা, মানসিক নির্যাতন আর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেও কল্যাণ মিত্র তার 'জল্লাদের দরবার' (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড) নাটকটিকে এদেশের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে নাটকটির তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কল্যাণ মিত্রের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অপর নাটক 'একটি জাতি একটি ইতিহাস'। এ নাটকে পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের পাশাপাশি যুদ্ধকালীন মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে নাট্যকাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। স্বদেশ প্রেমিক বিপ্লবী যুবক 'স্বদেশ' পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়। তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেছে তার বন্ধু সিরাজ। স্বদেশের বুকের রক্তে রাঙানো পতাকা বহন করেছে এ কালের 'সিরাজ'। পলাশী প্রান্তরে সিরাজ-উ-দ্দৌলার হাত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী যে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল, এ কালের সিরাজ পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে সেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে এদেশকে শত্রুমুক্ত করেছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নিঃশব্দ যাত্রা' মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত স্বল্পায়তন বিশিষ্ট নাটক। নাটকের দেশপ্রেমিক আদর্শ ছাত্রনেতা 'শওকত' প্রেমিকা লায়লাকে রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তার স্বার্থপর বন্ধু নিজাম দেশ সেবার নামে কলকাতা থেকে শর্টকোর্সে ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে শওকতের প্রেয়সী লায়লার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাকে পাওয়ার জন্য শওকতের নামে মিথ্যা সংবাদ প্রচার যে, সে মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছে। লায়লাকে বিভ্রান্ত করে সুযোগ বুঝে নিজাম তাকে বিয়ে করে সংসারী হয়। মুক্তিযুদ্ধে অবস্থান কালে এই সংবাদ পেয়ে শওকত মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তুলসীর আমবাগানে অসীম বীরত্ব নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর গুলিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিজাম তার চেহারা পাল্টে ফেলে নিজেকে দেশপ্রেমিক হিসাবে জনসমক্ষে প্রচার করে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়। নাট্যকার নাটকের শেষে শওকতের অশরীরী আত্মার উপস্থাপন করে নিজামের বিবেকবোধ জাগ্রত করেছেন। সে অনুতপ্ত হয়েছে। যুদ্ধের সময় নিগৃহীতা ফরিদার করুণ পরিণতি ও নাট্যকার তুলে ধরেছেন।

মমতাজ উদদীন আহমদের 'বর্ণচোরা' নাটকটি চারটি দৃশ্যে বিভক্ত নাটক। নাটকের ঘটনাকাল ২৫ মার্চ ১৯৭১ সাল এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। নাটকটি পরিকল্পনায় নতুনত্ব রয়েছে। এ নাটকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যারা এদেশের জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাদের চিত্র তুলে ধরেছেন। পাক শাসকগোষ্ঠীর প্রসাদপুষ্ট দালাল গোলাম সাদেক খান তিনি পাকবাহিনীর সহযোগিতা করেছেন। সুযোগ বুঝে বারবার তিনি তাঁর লেবাস পরিবর্তন করেছেন। নিজেকে একজন পাকিস্তানি বলে দাবি করেছেন, দেশপ্রেমিক ক্যাপ্টেন

Dhaka University Institutional Repository

জহুরকে পাক সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছেন। একমাত্র পুত্র বিপ্লবী মতিউরকে খান সেনাদের কাছে পাগল বলে পরিচয় দিয়েছেন, পুত্রবধূ বর্ণালীর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন, তাদের একমাত্র পুত্র 'পলাশ' যে একুশে ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেছিল তাকে দুধে বিষ মিশিয়ে হত্যা করেছেন। নিজের পুত্রবধূকে খান সেনাদের হাতে তুলে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি দেশপ্রেমিকের পোশাক পরতে চেয়েছেন, পুত্র মতিউরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। মতিউর তার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে, লাঞ্ছিতা স্ত্রী বর্ণালীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে তার বিশ্বাসঘাতক পিতাকে হত্যা করার জন্য।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নরকে লাল গোলাপ' যুদ্ধকালীন নিগৃহীতা রমণীদের নিয়ে রচিত নাটক। পাক হানাদার বাহিনী শুধুমাত্র বর্বরোচিত অত্যাচার চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি এদেশের শত শত নারীদের লাঞ্ছিত করেছে। নাটকে বর্ণিত সাজেদা, মঞ্জুরী, আলেয়া তারই শিকার। সমাজ-সংসারে এই সমস্ত নারী উপেক্ষিতা, নিগৃহীতা। যুদ্ধের অনাহুত সন্তান গর্ভে ধারণ করে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছে, আবার কেউ কেউ চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়ে সমাজে বেঁচে থেকেছে। স্ত্রী পুত্রহীন নিঃস্ব মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরেছেন। তিনি নিগৃহীতা নারী মঞ্জুরীর অনাহুত সন্তানের দায়ভার গ্রহণ করেছেন।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন নাট্যসমূহকে বিভাজন করা হয়েছে। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন, ষাটের দশকের ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই সমাজসত্য উদ্‌ঘাটনে ও জীবন ঘনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপনে এদেশের নাট্যকারবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিষয়াংশ নির্বাচন, প্রকরণ পরিচর্যা ও ভাষা ব্যবহারে অধিকাংশ নাট্যকার ছিলেন পরীক্ষা প্রবণ ও বৈচিত্র্য সন্ধানী। তাঁদের বিচিত্র নিরীক্ষা, শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ ও সৃজনশীলতায় বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য একটি শিল্প-সুষমামণ্ডিত সমৃদ্ধ শাখায় উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
দেশকাল ও সমাজ

ইংরেজ শাসনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে--যার ফলশ্রুতিতে একটি সৃজনশীল প্রাগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। 'সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব। সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে। শিক্ষা ও সংস্কার নীতির ফলে সৃষ্ট হয় শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবী প্রভৃতি শ্রেণী। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে উদ্ভব হয় ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় কর্মবৃদ্ধি ও শিল্পায়নের ফলে গড়ে ওঠে এক বিরাট চাকুরিজীবী শ্রেণী। উপরোক্ত প্রত্যেকটি শ্রেণী, উপশ্রেণীর ছিল অনন্ত সমস্যা, দাবি-দাওয়া। ঐ দাবি-দাওয়া, সমস্যা-সমাধানকল্পে গঠিত হয় নানা সংগঠন। পেশাগত সাংগঠনিক তৎপরতা থেকে শুরু হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ এবং পরবর্তী সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ও বাংলাদেশের আবির্ভাব প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ও তৎপ্রসূত রাজনীতির প্রত্যক্ষ ফল।'[১]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর এদেশের জনসাধারণ যে সুখ সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিল, শীঘ্রই তাদের মোহমুক্তি ঘটলো। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণায় লালিত পশ্চিমা সামরিক-বেসামরিক আমলা শ্রেণীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের এ অঞ্চলবাসী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নানাভাবে বঞ্চিত ও নিগৃহীত হতে থাকে। এই শোষণ ও বঞ্চনা চরম আকার ধারণ করে যখন তারা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। 'সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে পাকিস্তানের মোট ছয় কোটি নব্বই লক্ষ মানুষের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ জন ছিলেন বাংলা ভাষাভাষী। অর্থাৎ পাকিস্তানের পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পুশতু, বালুচি, ব্রাহুই, উর্দু, কাশ্মিরী ভাষা-ভাষীদের মোট সংখ্যার চেয়ে বাংলা ভাষা ভাষীদের সংখ্যা ছিল অধিক। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান গণপরিষদের আইনবিধি সংক্রান্ত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে (২৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি ও ২ মার্চ ১৯৪৮ খৃ.) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির উনত্রিশ নং, উপ-ধারা সংশোধন প্রয়াসে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে উর্দু ভাষার নাম যুক্ত করার সরকারি প্রস্তাবে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিম্নোক্ত সংশোধনটি উত্থাপন করেন—

That in Sub-rule 29, after the word "English" in line 2, the words, "or Bengali" be inserted.

---

১. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য—বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৭৭, ২য় সংস্করণ, মে ১৯৮১, পৃ. ৫৮৯-৫৯০

Dhaka University Institutional Repository

এই সংশোধনীর সমর্থনী ভাষণে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে যুক্তি উত্থাপন করেন তার অংশ বিশেষ হলো—

...What should be state Language of the state ? The state Language of the state should be Language which is used by the majority of the people of the state, and...I consider that Bengali Language is a lingua Franca of our state...if English can have an honoured place in rule 29 that the proceeding of the Assembly should be conducted in Urdu or English why Bengali, which is spoken by four crores fourty lakhs people should not have an honoured place...and therefore Bengali should not be treated as the provincial Language. It should be treated as the Language of the state and therefore...I suggested that after the word "English' the words or 'Bengali' be inserted in rule 29.

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবটি প্রবল সরকারি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এ সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় প্রস্তাবটির বিরোধিতায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ভাষণ থেকে—

'...Pakistan has been created because of the demand of a hundred million Muslims in this sub-continent and the Language of a hundred million Muslims is Urdu and...Pakistan is a Muslim State and it must have as its Lingua Franca the Language of the Muslim nation...Urdu can be the only Language which can keep the people of East Bengal or Eastern zone and the people of Western zone joined together. It is necessary for a nation to have one language and that language can only be Urdu and no other language.'[২]

গণপরিষদে বাংলাভাষা স্থান না পাওয়ার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ ১১ মার্চ প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালন এবং বিক্ষোভ সভা ও শোভা যাত্রার আয়োজন করে।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছিলেন—

> But let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Any one who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan.[৩]

---

২. রফিকুল ইসলাম—ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ভাষা আন্দোলন, মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৩৮

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ঐ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ১৯৪৮ সালে যারা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন তারা সরকারের চোখে পাকিস্তানের দুশমন ছিলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ ২৪ মার্চ ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে ভাষা সম্পর্কিত তাঁর মতামত পুনরাবৃত্তি করেন—

> There can be only one state language. If the component parts of the state are to march forword in unison, and that language, in my opinion can be only be Urdu.[৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত সভায় উপস্থিত কয়েকজন ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাহ্‌র উক্তির প্রতিবাদ করে সভা প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে।

১৯৫০ সালে লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধান প্রণয়নের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা করার কথা বলা হয়। এর বিরুদ্ধে বাঙালি প্রবল প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ফলে গণপরিষদের এই রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম লিখেছেন—

> ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্রের জন্য মূলনীতি নির্ধারণ সাব-কমিটির রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করেন। এই রিপোর্টে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার এবং পূর্ববাঙলাকে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের অতিরিক্ত মর্যাদা দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পূর্ববাঙলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দেশব্যাপী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমিতি ঢাকায় একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করে।[৫]

১৯৫১ সালে পূর্ববাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ১১ মার্চ পালনের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন বিষয়ে ছাত্র সমাজ আরো সচেতন হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে আব্দুল মতিন লিখেছেন—

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৫০ সালের মার্চের পর থেকে ধাপে ধাপে আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছিল। এই কমিটি ১৯৫০ সালের এপ্রিল বা মে মাসে সীমাবদ্ধ আকারে পতাকা দিবস পালনের মাধ্যমে যেমন বাংলা ভাষার দাবীর কথা নতুনভাবে তুলে ধরেছিল তেমনি জনগণের কাছে

---

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

৫. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলাদেশ (মনসুর মুসা সম্পাদিত) বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৭৪, পৃ. ৩৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক সহায়তার আহ্বান জানিয়ে একদিকে পরবর্তী কার্যক্রম পালনের জন্য সংগঠনকে আর্থিকভাবে সাবলম্বী করতে, অন্যদিকে জনগণকে সক্রিয় কার্যক্রমে সামিল করতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর ১৯৫১ সালে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন উদ্যম ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ১১ই মার্চ পালনের জন্য প্রচারপত্রের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়ে ১১ই মার্চ বার্ষিকী দিবসকে সংগঠিত করেছিল। এইভাবে ১১ই মার্চ পালনের মধ্য দিয়ে ছাত্র সমাজ অতীত ভাষা আন্দোলনকে (১৯৪৮ মার্চের) বর্তমান (১৯৫১ মার্চের) ও ভবিষ্যত (১৯৫২ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিতভাবে উপলব্ধি করার ভিত্তি পেয়েছিল। এরপর ঐ বছরই এপ্রিল মাসে কমিটি গণপরিষদের সদস্যদের কাছে নামে নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ও যুক্তিতে এক স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল।[৬]

১৯৫২ সালের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক উক্তির কারণে ভাষা আন্দোলন নতুন গতি লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, 'Urdu will be the state language of Pakistan.'[৭]

এই বক্তব্যের প্রতিবাদে সেদিন ঢাকার ছাত্র-জনতা প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঢাকাতে প্রতিবাদ সভা ও 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানসহ মিছিল চলতে থাকে। ৪ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ইতিমধ্যে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা' একুশে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ববাঙলা ব্যাপী ধর্মঘট, সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের আহ্বান জানায়।

এদিকে পূর্ব বাঙলার নূরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত্রি থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি ও সকল প্রকার সভা ও শোভাযাত্রা নিষেধ করেন। কিন্তু সরকারের সকল প্রতিরোধ পরিকল্পনা ভাষা সৈনিকদের দুর্বার গতি রোধ করতে পারেনি। ভাষা সৈনিকেরা তাঁদের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যায়।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ধর্মঘটের পর ছাত্র-ছাত্রীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনের সামনে সমবেত হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে সারারাত ধরে বাংলা ভাষার দাবি ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে অসংখ্য পোস্টার লেখা হয়েছিল। সেগুলোও কলাভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে দেখা যায়। সকাল দশটা-এগারোটার মধ্যে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীতে ভরে যায়। তারপর ঐতিহাসিক সভা শুরু হয় বারটার দিকে।[৮]

ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে 'দশজনের একটি দলে' বিভক্ত হয়ে শ্লোগান দিতে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের দিকে যেতে চেষ্টা করে। সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়

---

৬. আব্দুল মতিন, ভাষা ও একুশের আন্দোলন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ. ৪৭-৪৮

৭. ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১

৮. রফিকুল ইসলাম, ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৮, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় অগণিত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এরা ছাত্রদের বাধাদানে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। ছাত্ররা প্রতিবাদ স্বরূপ পুলিশদের ইট- পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং পুলিশ লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস বর্ষণ করে। এভাবে প্রায় বিকেল তিনটে পর্যন্ত ছাত্র ও পুলিশের মাঝে একটানা ও বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা সম্পর্কে কবির উদ্দিন আহমদ লিখেছেন—

> প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল করে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে গ্রেফতারী বরণ করতে থাকে। আর ধীরে ধীরে তারা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেট দিয়ে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্ধত পুলিশ বাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এম.এল.এ. ও মন্ত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকে। ছাত্ররা যতই শ্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ তাদের ওপর বেপরোয়া হানা দিতে থাকে। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে তাড়া করতে করতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ভিতর ঢুকে পড়ে। হোস্টেল প্রাঙ্গণে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায় ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। একদিকে ইট-পাটকেল আর অন্যদিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠি চার্জ আসে। পুলিশ তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছাত্রদের দিকে লক্ষ করে গুলি চালায়। ঘটনা স্থলেই আব্দুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমেদ শহীদ হন, আর ১৭ জনের মত গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাঁদের মধ্যে রাত আটটার সময় আবুল বরকত শহীদ হন।[৯]

পুলিশের গুলি চালানোর ফলে এই আন্দোলন ব্যাপকতর রূপ ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে কবিরউদ্দিন লিখেছেন—

> গুলি চালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে-মুখে যেন ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন ঝরতে থাকে। মেডিক্যাল হোস্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিশী হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যদের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবীও জানানো হয়। ১৪৪ ধারার নাম-নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলি চালনার সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট ও বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে। শহরের সমস্ত লোক তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে। মেডিক্যাল হোস্টেলের ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। মাইক দিয়ে যখন শহীদদের নাম ঠিকানা ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন সমস্ত মানুষের মন থেকে যেন সমস্ত ভয় ত্রাস মুছে গেছে, চোখে মুখে সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ প্রকাশিত হয়ে উঠেছে প্রতিটি মুখের রেখায় রেখায়।[১০]

---

৯. শিরোনাম : একুশে ফেব্রুয়ারি : আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জি, একুশের ইতিহাস, কবির উদ্দিন আহমদ, ২১ ফেব্রুয়ারি, সংকলন- ১৯৫২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮২, পৃ. ২৩২

১০. কবিরউদ্দিন আহমেদ—একুশের ইতিহাস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

একুশে ফেব্রুয়ারি যে তিনজন ছাত্র শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের লাশ ঐ রাতেই পুলিশ গোপনে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করে।[১১] তৎকালীন মেডিক্যাল কলেজের শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মঞ্জুরের উদ্যোগে রাতারাতি মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ২২ ফেব্রুয়ারি যে শহীদ মিনার তৈরি করা হলো, আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ সম্পাদক শামসুদ্দীন সাহেব সে মিনার উদ্বোধন করলেন ২৬ ফেব্রুয়ারি।[১২] ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের গায়েবানা জানাজার ব্যবস্থা করা হলো। লাশের অভাবে শহীদদের রক্তমাখা জামাকাপড় দিয়ে সংগ্রামী ছাত্ররা জানাজায় শরিক হলো। জানাজার পর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হলো।[১৩] এদিন বিভিন্ন সরকারি অফিস থেকে অগণিত বাঙালি সরকারী কর্মচারি রাজপথে বেরিয়ে পড়ে পুলিশের গুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠেন।[১৪] এই সংঘাত ও তীব্র প্রতিবাদ জনমনে বিপুল আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয় এবং সামন্ত মূল্যবোধাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের সুদৃঢ় ভিতকেও শিথিল করে।

পাকিস্তানি বেনিয়া পুঁজি সামন্ত শক্তির প্রতিভূ প্রতিক্রিয়াশীল খাজা নাজিমুদ্দীন, নূরুল আমীন চক্র বায়ান্নর আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মার্ক্সীয় চেতনার ধারক আব্দুল মতিন, মুনীর চৌধুরী, অজিত গুহ, আবুল হাশেম, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মনোরঞ্জন ধর, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখকে কেবল রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করলেন না—তাঁদেরকে গ্রেফতারও করলেন। ব্যাপক ধরপাকড়, অত্যাচার এবং গ্রেফতারের ফলে বায়ান্নর আন্দোলন জনমনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।[১৫]

একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নাটক মঞ্চায়নের জন্য রাজবন্দি রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে বাংলা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য কারারুদ্ধ মুনীর চৌধুরী ১৭ জানুয়ারি ১৯৫৩-তে লিখলেন 'কবর'।[১৬]

কমিউনিস্ট রাজবন্দিগণ নাটকটি ১৯৫৩-র একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মঞ্চস্থ করেন।[১৭] নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন শ্রীফণী চক্রবর্তী এবং প্রযোজনা ও দৃশ্যসজ্জায় ছিলেন শ্রী অমল সেন। বিভিন্ন

---

১১. এনায়েত রসুল, ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্ব ও পরিণতি, ভাষা আন্দোলন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭

১২. এম. আর. আখতার মুকুল—বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, পূর্বোক্ত ,পৃ. ২৫১

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭

১৫. একুশের সংকলন ৮০, স্মৃতিচারণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, পৃ. ১৪৫-১৫৪

১৬. আনিসুজ্জামান, 'কবর' থিয়েটার (ত্রৈমাসিক নাট্য পত্রিকা) রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, ৫ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭, পৃ. ১২৯

১৭. আলী ইমাম, 'কবর' প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, পারাপার', একুশের সংকলন ১৯৭১, উদ্ধৃত, থিয়েটার, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, পৃ. ১৩১, ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রে যারা রূপদান করেছিলেন তারা হলেন—মুর্দা ফকিরের ভূমিকায় নলিনী দাশ, নেতার ভূমিকায় অজয় রায় এবং কিশোর শহীদের মায়ের ভূমিকায় ছিলেন ধনঞ্জয় দাস।[১৮]

'কবর' মঞ্চায়ন সম্পর্কে শ্রী ধনঞ্জয় দাস তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন—

> নলিনীদার বুকফাটা কান্নার অপূর্ব অভিনয় এখনো যেন শুনতে পাই আমি। জেলখানার গদির উপর চাঙর চাঙর ঘাসভরা মাটি দিয়ে রচনা করা হয়েছিল কবরের পরিবেশ। সেই কবরে শায়িত ভাষা আন্দোলনের শহীদদের জন্য নলিনীদার নাটকীয় সংলাপ আর অভিব্যক্তিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল যেন এক জাত অভিনেতার আশ্চর্য প্রতিভা।[১৯]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কেবল সাংস্কৃতিক আন্দোলনই ছিল না ; এটা প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলন বলা যায়। এটাই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর গণবিরোধী ও ঔপনিবেশিক মনোভাবের বিরুদ্ধে বাঙালিদের অন্যতম আন্দোলনে পরিণত হয়। রাজনৈতিক স্বাধিকারের ব্যাপারে বাঙালিরা সচেতন হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বঞ্চিত বাঙালিরা সকল শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু করেছিল, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল তারই প্রথম সোপান। ভাষা আন্দোলনের প্রতি পূর্ব বাঙলার মানুষের সার্বিক সমর্থনের ফলে ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাঙলার প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে শাসকদল মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। যুক্তফ্রন্ট তাদের ২১ দফা কর্মসূচির প্রথম দফাতেই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের দাবি জানায়। 'রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রগতিশীল শক্তির এই প্রথম বিজয়কে তারা বেশি দিন সক্রিয় রাখতে পারেনি। রক্ষণশীল লীগ সরকার প্রগতিশীল শক্তির এই বিজয়কে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা সামন্ত চেতনাপুষ্ট বেসামরিক প্রশাসনের ষড়যন্ত্র ও সহায়তায় পূর্ববঙ্গে খাদ্য পরিস্থিতির অবণতি এবং বিভিন্ন কলকারখানায় দাঙ্গা[২০] বাধিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার মাত্র সাতান্ন দিনের মধ্যে পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ৯২ (ক) ধারা জারির মধ্য দিয়ে পতন ঘটায়।[২১]

এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির বিজয় ঘোষিত হয়। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বীকৃতিদানের পর বাঙালিদের অধিকার

---

১৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মমতাজউদ্দীন আহমেদ, মুনীর চৌধুরীর 'কবর' প্রসঙ্গে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

১৯. ধনঞ্জয় দাস, 'আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাংলাদেশ' মুক্তধারা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৭২

২০. তথ্য সূত্র : 'মর্নিং নিউজ' ঢাকা, ২১, ২৪, ২৬ ও ২৭ মার্চ এবং ১৮ মে ১৯৫৪ : তথ্য সংগ্রহ : সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, পৃ. ১১৯ ও অধ্যাপক কে আলী—বাংলাদেশ ও পাক–ভারতের ইতিহাস (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ) ২৪ তম সংখ্যা ১৯৯৪, পৃ. ১৭৮

২১. তথ্য সূত্র : রাজনৈতিক মঞ্চ, বিস্তারিত তথ্য : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ৫ম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

সচতেন রাজনীতি ক্রমশই প্রবল হতে থাকে। ১৯৫৭ সালে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই ধারা আরও তীব্রতর হয়। আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক আইন জারি করেন।[২২] ১০ অক্টোবর মাওলানা ভাসানীকে পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনে এবং পরবর্তী পর্যায়ে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে চারজন প্রাক্তন মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং হামিদুল হক চৌধুরীসহ তিনজন প্রাক্তন এম.পি.এ এবং তিনজন উর্ধ্বতন বেসামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করা হলো।[২৩] ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা এবং প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদও বাতিল করা হয়। কেবল তাই নয়—রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ, সভা সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা এবং পত্রিকার ওপর সেন্সরশীপও আরোপ করা হলো।[২৪]

১৯৫৮ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬১ সালের শহীদ দিবসকে কেন্দ্র করে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ আবার দানা বেঁধে ওঠে। এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিল এদেশের ছাত্রসমাজ। যেহেতু রাজনীতি করা নিষিদ্ধ ছিল সেহেতু 'শহীদ দিবস' উদ্‌যাপনের মাধ্যমেই রাজনৈতিক সংগঠন এবং আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রচেষ্টা চলে।'[২৫] ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে সোহরাওয়ার্দী নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতারের[২৬] ফলে ছাত্র রাজনীতি জঙ্গি এবং সরাসরিভাবে সরকারের বিরোধী হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ এই গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানায়।[২৭]

১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের অবসান হয় এবং আইয়ুব খান জাতিকে 'মৌলিক গণতন্ত্র' উপহার দেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করা হলো। এই শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। কিন্তু জনসাধারণ সেটা মেনে নেয়নি। এই শাসনতন্ত্রকে প্রণয়নের দাবি জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নয়জন[২৮] নেতা সেদিন বিবৃতি দিয়েছিলেন। ২৫ জুন ১৯৬২ তারিখের পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় ছাপা নয় নেতার যৌথ বিবৃতির কিয়দংশ নিম্নরূপ—

---

২২. পাকিস্তান সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং-৯৭৭/৫৮, ৭ অক্টোবর ১৯৫৮, গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যা ১৫ অক্টোবর ১৯৫৮

২৩. পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১৩ অক্টোবর, ১৯৫৮, তথ্য সংগ্রহ : সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০

২৪. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

২৬. নিরাপত্তা আইনে সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার, পাকিস্তান অবজারভার, ৩১ জানুয়ারি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র পূর্বোক্ত পৃ. ১২৫

২৭. সূত্র : ৭ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ ঘটনা সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোট/অবজারভার, ৭ ফেব্রুয়ারি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

২৮. সর্বজনাব হামিদুল হক চৌধুরী, নূরুল আমীন, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, মাহমদু আলী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক এবং পীর মোহসীন উদ্দিন আহমেদ

Dhaka University Institutional Repository

> Rule of material lqw has at least been ended. Gloom that enveloped the country for long 45 months has been partially lifted. Door of progress towards a democratic system seems to be in the process of opening but democracy has yet to come. The constitution promulgated by Field Marshal Ayub Khan only holds out a hope but does not under it.
>
> The main subject that agitates public mind deeply today is again the constitution of the country. This was the main topic during the recent elections though the election was limited to a small section of the people. Practically every candidate pledged his support for getting a democratic constitution. During the last six weeks since election, the volume of opinions for a workable constitution has increased considerably. We will go failing in our duty if we do not express ourselves on this vital question through only means available to us ; we believe, in this, we share the opinion held by most in the country.[২৯]

শাসনতন্ত্র নিয়ে আন্দোলন শেষ না হতেই শুরু হলো শিক্ষা কমিশন বাতিলের আন্দোলন। ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়। এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ জানানোর জন্যে সারাদেশে হরতাল আহ্বান করে। এই আন্দোলনে ঢাকায় ও যশোরে গুলি, লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে একজনের মৃত্যু, শতাধিক আহত ও অনেকেই গ্রেফতার হন। এ সম্পর্কে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় ছাপা হয়—

> One person was killed and over hundred injured after police firings preceded by tear-gassing and lathi charge on demonstrating crowds in different parts of the city yesterday (Monday).
>
> The demonstrations followed procession by students and members of the public on the city observed complete hartal in support of the students demand for scrapping of the Education Commission's Report.

সরকার নিহতদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া, গুলি বর্ষণের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিশন গঠন, ছাত্রদের বিরুদ্ধে হুলিয়া প্রত্যাহার এবং মামলা দায়ের না করার প্রতিশ্রুতি দিলে ২২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।[৩০] ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে চট্টগ্রামের সরকার হাটে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণের কারণ অনুসন্ধানে

---

২৯. তথ্য সূত্র : অবজারভার, ২৫ জুন ১৯৬২, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

৩০. পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

Dhaka University Institutional Repository

তদন্ত কমিশন গঠনের অঙ্গীকার করলে ২৮ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।[৩১] ঐ তারিখে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এনায়েতুর রহমান এক সভায় বক্তৃতা দানকালে উল্লেখ করেন, বিগত আট মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ১৮ দিন পূর্ণাঙ্গ ক্লাস হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে বন্দি করা হয়েছে ১৬০০ ছাত্রকে।[৩২] রাজনৈতিক নেতারাও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্রের দাবি পুনরুত্থান করেন।[৩৩] ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সীমিত আকারের রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চার বছরের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থে ছাত্র সমাজই তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকাসহ পূর্ববাঙলার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ববাঙলার মানুষ এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। 'এই অবস্থার পটভূমিতে রাজনৈতিক আন্দোলন নতুন করে দানা বেঁধে ওঠে এবং 'সর্বদলীয় সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন কর্ম-পরিষদ' গঠিত হয়।[৩৪]

১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে কেবলমাত্র সংসদীয় পথে আইয়ুব খানের অপসারণ সম্ভব নয়। এই ধারণার প্রভাব প্রতিফলিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ১৪ দফা কর্মসূচির মধ্যে।[৩৫] ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধ, রাজনৈতিক অবস্থা, ক্রমশ তাদের ধ্যান-ধারণাকে বদলে দেয়। 'এই রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ তাদের ৬-দফা দাবী দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করে।'[৩৬] আওয়ামী লীগের আহ্বানে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সমগ্র পূর্ববাঙলা ব্যাপী হরতাল পালিত হয়।[৩৭] হরতালের দিন সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী ঢাকায় নিহতদের সংখ্যা ৪ এবং নারায়ণগঞ্জে নিহত ৬ এবং আহত ১৩।[৩৮] এই হরতালের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি জঙ্গিরূপ প্রকাশ পায়। ৭ জুন পুলিশের গুলিবর্ষণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলি

---

৩১. পূর্বোক্ত, ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

৩২. পূর্বোক্ত, ঢাকা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

৩৩. পূর্বোক্ত, ঢাকা ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২
বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (২য় খণ্ড), পৃ. ১৮১

৩৪. সর্বদলীয় ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন 'কর্ম-পরিষদের প্রচারপত্র', মার্চ ১৯৬৪, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র , পৃ. ২১৬

৩৫. 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রচারপত্র, জুন ১৯৬৫

৩৬. পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচারপত্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক আব্দুল মমিন কর্তৃক ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (২য় খণ্ড), পৃ. ২৭১

৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৮ জুন ১৯৬৬

৩৮. পূর্বোক্ত, দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জুন, ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচিতে আসার চেষ্টা করে।[৩৯] আইয়ুব সরকার এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আওয়ামী লীগের মুখপাত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক' বন্ধ করে দেয়।[৪০]

১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান তার শাসনামলের দশ বছর জাঁক-জমকের সাথে পালনের জন্য উৎসাহী হয়ে, তা পালনের ব্যবস্থা নিলেন।

৬৮-র ২৭ অক্টোবর মহা আড়ম্বরে উন্নয়ন দশক পালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে কিন্তু পূর্ববাঙলার জন্য ছিল হতাশা আর বৈষম্য। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের উন্নয়নের ব্যবধান আকাশ প্রমাণ। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মরুভূমিতে খাল খনন করা হয়, কিন্তু পূর্ববাঙলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো বাস্তব ব্যবস্থা গৃহীত হয় না। এ দেশবাসীর যে তিমির সেই তিমির। এমন নজির হাজার হাজার। কোথাও বৈষম্য ছাড়া কথা নেই, সর্বত্র ব্যবধান, সর্বত্র অসম বণ্টন। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দফতরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। যেমন পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক, পাকিস্তান ইন্টার ন্যাশনাল এয়ার লাইন্স, ন্যাশনাল ব্যাংক, বীমা কোম্পানিসমূহ, ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থা, সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর, সামরিক একাডেমী ইত্যাদি। আমদানির ব্যবধান ছিল অবিশ্বাস্য।[৪১]

উন্নয়ন দশক পালনের রেশ কেটে যেতে না যেতেই শুরু হয় আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনে ছাত্রসমাজ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। '১৯৬৯ সালের জানুয়ারি ছাত্রসমাজ একটি প্রগতিশীল রূপরেখা ও আন্দোলনের কর্মসূচি ১১ দফার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।[৪২] ছাত্র সমাজ ২১ দফার দাবির ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি 'দাবী দিবস' পালন করেন। সভা শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস ও রঙিন জল নিক্ষেপ করে।[৪৩] পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুনরায় মিছিল বের করার চেষ্টা করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে।[৪৪] ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি সম্পর্কে মোহাম্মদ ফরহাদ লিখেছেন—

---

৩৯. 'দমননীতি' গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হউন'—সম্মিলিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রচারপত্র, ৮ জুন, ১৯৬৬, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র , পৃ. ২৭১

৪০. পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা ১৮ জুন, ১৯৬৬ (শিরোনাম : দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বাতিল), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (২য় খণ্ড), পৃ. ২৭৭

৪১. সেলিনা হোসেন, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৭

৪২. ছাত্র সমাজের প্রচারপত্র, জানুয়ারি ১৯৬৯

৪৩. দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৯

৪৪. দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

> পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী (পূর্ববাঙলা) পুনরায় ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিলের আহ্বান দেয়া হয়েছিল। এটা প্রদেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করে তোলে। ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী জমায়েত হয় ও বিরাট মিছিল বের করে। এই দিন ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ছাত্রদের বিশাল মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। ফলে স্বতন্ত্র ছাত্র ইউনিয়নের একজন ছাত্রনেতা আসাদ শহীদ হন। এই সংবাদ ঢাকা শহরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। হাজার হাজার নর-নারী, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসে সমবেত হয়। নভেম্বর-জানুয়ারি মাসের রাজনৈতিক পটভূমিতে আগের কয়েক দিনের ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ফলে সমগ্র পূর্ববাঙলায় যে দারুণ রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, ছাত্রনেতা আসাদের মৃত্যু তাকে আইয়ুব-মোনায়েম শাহীর বিরুদ্ধে এক বিপুল গণ-জাগরণের সূত্র দিয়ে যায়। ছাত্র নেতারা পরদিন ঢাকায় হরতাল ও ২৪ জানুয়ারি সারা পূর্ববাঙলায় পূর্ণ হরতাল আহ্বান করে।[৪৫]

ছাত্র নেতারা পরদিন ২১ জানুয়ারি ঢাকায় এবং ২৪ জানুয়ারি সারা পূর্ববাঙলায় পূর্ণ হরতাল পালনের ঘোষণা দেয়। ২১ তারিখের পরিস্থিতি আঁচ করে আইয়ুব সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েন। ২৪ তারিখে আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। এ প্রসঙ্গে সেলিনা হোসেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> ২৪ তারিখে ঢাকা শহরে যে ঘটনা ঘটে, তা ছিল অসাধারণ, অভূতপূর্ব। এ কারণে এ দিনটিকে পরবর্তী সময়ে 'গণ-অভ্যুত্থান' দিবস বলে অভিহিত করা হয়েছে। মানুষের ঢল প্লাবিত করে ফেলে রাজপথ, গণ জাগরণের উত্তুঙ্গ জোয়ার। পুলিশ, ই.পি.আর.কুলোতে পারে না। গুলি বর্ষণ করে সেনাবাহিনী। সেক্রেটারিয়েটের সামনে মৃত্যুবরণ করেন রুস্তম। পরবর্তী পর্যায়ে গুলিতে নিহত হন নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিয়ুর। সমগ্র নগরী বিক্ষোভে কাঁপে। দুপুরে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় পল্টন ময়দানে। সেখান থেকে মিছিল এসে জমায়েত হয় ইকবাল হলের মাঠে। এই জমায়েতে বক্তৃতাকালে শহীদ মতিয়ুরের পিতা বলেন, 'এক মতিয়ুরকে হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিয়ুরকে পেয়েছি।[৪৬]

২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ সম্পর্কে মোহাম্মদ ফরহাদ লিখেছেন—

> এই দিনটি আমাদের ইতিহাসের এক মহান দিবস হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২৪ জানুয়ারির অভ্যুত্থান ছিল অবিশ্বাস্য। ন্যূনপক্ষে অর্ধলক্ষ বিক্ষুব্ধ জনতা এই দিন ঢাকা শহর তছনছ করে ফেলার অবস্থা করে। সরকারী বড় বড় আমলাগণ ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ, ই.পি.আর. অচল হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রেস ট্রাস্টের দুইটি পত্রিকা—মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তানের অফিস জ্বালিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ জনতা আরজু হোটেলে আগুন দেয়। এই হোটেলের মালিক আগরতলা মামলার সরকারি সাক্ষী ছিলেন।

---

৪৫. মোহাম্মদ ফরহাদ, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, প্রকাশকাল ১৯৮৯, পৃ. ৩৭

৪৬. সেলিনা হোসেন, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

কনভেনশন মুসলিম লীগের অনেক নেতার বাড়ি জনতা ঘেরাও করে। মধ্যাহ্নে বিক্ষুব্ধ জনতা সেক্রেটারিয়েট ঘেরাও করে ও আগুন দিতে চেষ্টা করে। ২৪ জানুয়ারি ছিল পূর্ববর্তী দুই তিন মাসের আন্দোলনের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এইদিন সকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ মিছিলে বের হয়। এদের মধ্যে শহরের গরীব বস্তিবাসী, ছোট-খাট সর্বপ্রকার কলকারখানার মজুররাই ছিল সংখ্যায় বেশি। সর্বপ্রকার অফিস-আদালতের কর্মচারীরাও বের হয়ে আসে। আদমজী, তেজগাঁও, পোস্তাগোলা, ডেমরা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা হাজারে হাজারে মিছিল করে পল্টনে এসে উপস্থিত হতে থাকে। পল্টনের ময়দানে ভেসে যায়—জনতার ভীড় পথে পথে জমে যায়।[৪৭]

১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন[৪৮] —যার ফলে আলোচনা বা সমঝোতার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। সরকার প্রবল গণ-আন্দোলনের চাপে ২২ ফেব্রুয়ারি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তিদান করেন।

মুক্তিলাভের পর ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়। উক্ত সভায় শেখ মুজিব কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন, কারণ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পূর্ব-পাকিস্তানই ছিল। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানকে সাবেক প্রদেশগুলিতে ভাগ করার দাবি জানান।

২৮ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রায় সকল বিরোধী দলীয় নেতা উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন। গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তব্য পেশ করেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হলো—

> The issue of deprivation of political rights finds expression in the 11-point programme of students of East Pakistan, as also in the 6-point programme of the Awami League, as a demand for the establishment of a Parliamentary Democracy, based on the Principal of the supremacy of the Legis lature in which there is a representation of all units on the basis of population, and to which representatives are directly elected by the people on the basis of universal adult franchise.

---

৪৭. মোহাম্মদ ফরহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

৪৮. তথ্য সূত্র, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

Dhaka University Institutional Repository

> The issue of economic injustice is reflected in the 11-point programme in the form of clearly formulated demands for re-organisation of the economic and educational system of the country. The 6-point programme of my party clearly recognises the need for radical economic re-organisation, and the demand for regional autonomy, as outlined in it, is insisted upon as an essential precondition for economic re-organisation and the implementation of effective economic programmes.
>
> The issue of Justice for the different regions and units of Pakistan is the basis of the demand for the establishment of a Federation providing for full regional autonomy as embodied in the 6-point programme. This is also the basis of the demand for dismemberment of one unit and the establishment of a sub-Federation in west Pakistan.[৪৯]

১৪ মার্চ গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে। আইয়ুব সরকার সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা ও প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের দাবি মেনে নিতে এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করতে সম্মত হয়। কিন্তু আইয়ুব ছয় দফাভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে গোল টেবিল আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গোলটেবিল বৈঠক হতে প্রত্যাবর্তন করে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জনগণকে তাদের দাবী আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। পূর্ব-পাকিস্তানের গণ-আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে, প্রশাসন যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের উদ্যোগে কমিটি গঠন করা হয়।

গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পরেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নিজের হাতে ক্ষমতা বজায় রেখে পরিস্থিতি শান্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর পদ হতে মোনেম খানকে অপসারণ করে তার স্থানে ড. এম.এন. হুদাকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এরপর দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে এবং রাজনীতিবিদরাও নতুন নির্বাচন ও নতুন সংবিধানের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী হয়ে ওঠেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে শাসন ক্ষমতা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান

---

৪৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে হস্তান্তর করেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ইয়াহিয়া খানকে উদ্দেশ্য করে লেখা পত্রে তার মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে—

প্রেসিডেন্ট হাউস
রাওয়ালপিণ্ডি
২৪ মার্চ, ১৯৬৯

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

অতীব দুঃখের সহিত আমাকে সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে যে, দেশের সমুদয় বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান উদ্বেগজনক মাত্রায় অবস্থার যদি অবনতি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এমতাবস্থায়, ক্ষমতার আসন হইতে নামিয়া যাওয়া ছাড়া কোন গন্তব্যন্তর দেখিতেছিনা। তাই আমি পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর হস্তে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া যাওয়ার সাব্যস্ত করিয়াছি, কেননা, সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার একমাত্র কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র।[৫০]

ক্ষমতা লাভের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি নিজেকে জনদরদি নেতা হিসাবে দেশবাসীর কাছে পরিচয় দিতে চেষ্টা করলেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তা'তে জনগণের মনে আশার সঞ্চার হয়। তার এই ভাষণ এ বিষয়ে স্পষ্ট আশ্বাসবাণীস্বরূপ ছিল—

> I would like now to give you the details of the time-table to which we should work for change over of power to the elected representatives of the people. First, the provincial Legal frame work holding elections should be ready by march 31, 1970. Next, as already announced by the chief Election Commissioner, the Electoral Rolls will be ready by June, 1970 with the completion of the Electoral Rolls, the Election Commission will be engaged in delimiting the various constituencies both for central and provincial elections in accordance with the provisions which will be made in the legal

৫০. সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মার্চ, ১৯৬৯, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (২য় খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৬

Dhaka University Institutional Repository

> frame work. As you are aware, delimitation is finalized after hearing the objections, if any, form the people. Therefore, some time has to be given to this task. Further there are climatic difficulties for holding elections both in East and West Pakistan from June 1, to the end of September. I have therefore, decided to hold general elections in the country on October 5, 1970. The Provincial elections will be held after the National Assembly completes its task of constitution making. The assembly will be required to complete this work within a period of 120 days from its first sitting. I would be happy if they can finalize if even before the expiry of this period.[৫১]

ইয়াহিয়া খান পরবর্তীকালে ক্ষমতা হস্তান্তরের 'আইনগত কাঠামো আদেশ ১৯৭০ (Legal Frame Work Order 1970) পেশ করেন।[৫২] যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২টি আসন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয়।[৫৩]

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকচক্রের অবহেলাপূর্ণ মনোভাবের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও তীব্রতর রূপ নেয়। এই প্রেক্ষাপটে, ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনের মধ্যে ১৬২ টি আসন লাভ করে।[৫৪] এই ফলাফল কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীর কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। নিয়ম ভঙ্গ করে ভুট্টোর 'পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি, জাতীয় পরিষদে বিরোধী দল হিসাবে আসন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আওয়ামী লীগের এই বিজয়কে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী মেনে নিতে পারেনি। তারা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

এদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণও নীরবে বসে থাকেনি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বাধিনায়ক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পে এদেশব্যাপী হরতাল, মিছিল চলতে থাকে। দেশের বিভিন্ন অংশে সেনাবাহিনী জনতার মিছিলে গুলি বর্ষণ করে।

---

৫১. The Dawn, 29 November 1969 (Extracts from president. Yahia Khan's Address to the Nation on 28th November, 1969). সংগ্রহ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৬

৫২. মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ৩১ মার্চ ১৯৭০

৫৩. পূর্বোক্ত, মর্নিং নিউজ

৫৪. দি ডন, করাচি, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, '......এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।[৫৫] সেইসঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য কয়েকটি শর্তও আরোপ করেন।

৮ মার্চ ১৯৭১ থেকে পূর্ববাঙলার রাষ্ট্রযন্ত্র বস্তুতপক্ষে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।[৫৬] বিভিন্ন আদেশের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাই স্বাধীনতার পক্ষে তাদের বক্তব্য দেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সামগ্রিক নেতৃত্ব মেনে নেয়।[৫৭]

১৯৭১-এর ১৬ মার্চ শেখ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা ঢাকায় আসেন। শেখ মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা চলতে থাকে—অনেকের ধারণা ছিল আলোচনা সফলতার দিকে এগুচ্ছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া-শেখ মুজিবের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা সভা না ভেঙ্গে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং তার পূর্বেই টিক্কা খানের নেতৃত্বে রাতের অন্ধকারে পাক সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে যান। ফলে ঐদিন রাত্রে সংঘটিত হয় ইতিহাসের এক নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড। বিভীষিকাময় ২৫ মার্চ বাঙালির ইতিহাসে 'কালো রাত্রি' হিসাবেই পরিচিত হয়ে থাকবে। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বিদেশী লেখকের লেখনী থেকে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> What happened after March 25, is a gruesome and tragic story of a helpless people, who are being crushed by a powerful military machine. The Swadhim Bengla Betar Kendra repoted on March 29 that the Pakistan Army, Airforce and Navy had massacred 300,000 people and urged free Nations of the world to check this genocide. Pakistan's military authorities selected targets for extinction and fell upon the youth and intellectuals like mad wolves. Dacca University was fired upon, killing hundreds of students, Professors and scholars. Many girl students residing in the University Campus were kidnapped by the Army and molested. Later, On April 13, the Pakistani troops forced 300 students of st. Francis Xavier School in Jesore to line up and machine gunned them.

---

৫৫. জয় বাংলা (বিশেষ সংখ্যা) ঢাকা, ৭ মার্চ, ১৯৭১

৫৬. দি ডন, ৮ মার্চ ১৯৭১

৫৭. বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ, সুকুমার বিশ্বাস, 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, পৃ. ৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

> The Pakistan Army attacked the civilians without any warning. It started so suddenly that when the Army moved into the streets of Dacca to annihilate the important centres of the independence movement, people were taken by a big surprise, as they were told a day before that a decision to give them autonomy was in the offing.[৫৮]

প্রথম দিকে (বিশেষ করে ঢাকায়) পাকিস্তান বাহিনী অসংখ্য নিরীহ মানুষ হত্যা করে বাংলাদেশে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় ছাপা হয়—

> Caught completely by surprise, some 200 students were killed in Iqbal Hall, headquarters of the militantly anti-Government student's union, I was told. Two days later, bodies were still smouldering in burnt-out rooms, others were scattered outside, more floated in a nearby lake, an art students lay across his easel.
>
> At another hall, reportedly, soldiers buried the dead in a hastily dug mass grave which was then bull-dozed over by tanks. People living near the University were caught in the fire too and 200 yards of shanty houses running alongside a railway line were destroyed.
>
> As the University came under attack, other columns of troops moved in on the Rajarbag, headquarters of the East Pakistan Police, on the other side of the city. Tanks opened fire first, witness said, then the troops moved in and levelled the men's sleeping quarters, firing incendiary rounds into the buildings. People living opposite did not know how many died there, out of the 1,100 police based there not many are believed to have escaped.[৫৯]

২৫ মার্চের ভয়াবহ আক্রমণের পর সমগ্র বাংলাদেশে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ইবি আর, ইপি আর, পুলিশ, আনসার ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র যুদ্ধের পর্যায় শুরু হয়। '২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নামে চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং বর্বর পাকসেনা দলকে প্রতিহত করার জন্য সকল

---

৫৮. Bleeding Bangladesh Editorial Department, Sagar Publications, New Delhi, 1971, p. 12-13. বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ : মোহাম্মদ জাহেদ হোসেন, বাংলাদেশের ছোটগল্প জীবন ও সমাজ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ১৭৫

৫৯. তথ্য সূত্র : ডেইলি টেলিগ্রাফ, ৩০ মার্চ ১৯৭১, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮৮

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালির প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পরবর্তী দিন মেজর (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) জিয়াউর রহমান কর্তৃক আরও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।[৬০] তিনি তাহার নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিশ্ববাসীর সমর্থন কামনা করেন।[৬১] ৩০ মার্চ মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র) হইতে আর এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমাণ্ডার হিসাবে ঘোষণা করেন।[৬২] তিনি এই কথা স্পষ্ট করিয়াছেন যে, মুক্তিবাহিনীর সর্বোচ্চ কমাণ্ডার মুজিবই উক্ত সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতেছেন।[৬৩] এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের সর্বত্র পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এরপর ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিগণ কুষ্টিয়া জেলার মুক্ত মুজিবনগরে মিলিত হয়ে গণপরিষদ গঠন করে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' জারি করেন। আর এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে সার্বিক আনুষ্ঠানিক রূপ দান করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশকে 'সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্র প্রধান করা হয়।[৬৪]

১০ এপ্রিলের ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুসারে বাংলাদেশের গণ-প্রতিনিধিগণ অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করতে উদ্যোগী হন। উক্ত ঘোষণাপত্রে জারি হওয়ার পর (রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে) উপরাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৩ এপ্রিল তাঁর মন্ত্রীসভা নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। তাজউদ্দীন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এ.এইচ. এম. কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট ও পুর্নবাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কর্ণেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। এভাবেই গঠিত হয়েছিল স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। 'মুজিবনগর' এই সরকারের অস্থায়ী রাজধানী ছিল এবং সেই হতে 'মুজিবনগর সরকার' ও বলা হয়। এই বিপ্লবী সরকার ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর বৈদ্যনাথতলা আম্রকাননে (মুজিবনগর) আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ ও কার্যভার গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে এগারটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন আতাউল গনি ওসমানী।

---

৬০. R. Jahan, Pakistan—Failure in National Intergnation, p. 198, তথ্য সংগ্রহ, বিপুল রঞ্জন নাথ, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, বুক সোসাইটি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৩৬২

৬১. A.M.A. Muhith, Bangladesh—Emergence of a Nation, p. 227, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২

৬২. মুক্তি সংগ্রাম (প্রথম পর্ব), পৃ. ৩৫৫-৩৫৬, সংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২

৬৩. A.M.A. Muhith, Ibid, p. 227, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২

৬৪. বিপুল রঞ্জন নাথ, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, বুক সোসাইটি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, পৃ. ৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার গঠনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা সম্ভব হয়। এই মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে দ্রুত বিশ্বজনমত গড়ে ওঠে। এই সরকার গঠিত হওয়ার ফলে বাঙালিগণ সংগ্রামী চেতনায় ও নব আশায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং তাদের মনোবল বেড়ে যায়। ঘরে ঘরে আন্দোলন শুরু হয়, জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সঞ্চার হয়। পাক–শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজার দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এদেশ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়। মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহীদ হন। সারাদেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে রাজাকার, আল–বদর, আল–শামস্ ইত্যাদি পাকিস্তানি দোসররা এদেশের প্রখ্যাত শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী ও সাংবাদিকসহ অনেক বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। স্বাধীনতা লাভের এক সপ্তাহের মধ্যেই মুজিব নগরস্থ স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার ঢাকায় আগমন করে দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তখন বাংলাদেশের শাসন 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' অনুসারেই পরিচালিত হতে থাকে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার হতে মুক্তিলাভের পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭২ সালের ১৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর মন্ত্রী সভার ২১ জন সদস্য নতুন সংবিধানের অধীনে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের মনে যে স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, পঞ্চাশের দশক পুরোটাই ছিল তাদের সেই সংগ্রামী চেতনার উন্মেষকাল। ষাটের দশক ছিল ছাত্র জনতার সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল তাদের সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় পদক্ষেপ। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন—১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল যার পরিণতিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

বাহান্ন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক নিয়মের চরম পরীক্ষা আর রক্তাক্ত পথক্রমার মধ্য দিয়েও বাঙালি জাতি তার সৃজনশীল চেতনাকে অব্যাহত রেখেছিল। সুদীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ ও নিপীড়নের ফলে জাতির সৃষ্টিশীল চেতনায় যে ক্ষোভ–প্রতিবাদ, দ্রোহ–বিদ্রোহ ও সংগ্রামমুখর দৃষ্টিভঙ্গির স্ফূরণ ঘটেছিল তারই রূপকল্প হিসাবে গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের নাটকের প্রেক্ষাপট।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটক

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এদেশের তরুণ ছাত্রসমাজ বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। ভাষা আন্দোলনই ছিল বাঙালিদের প্রথম সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়-দফা আন্দোলন, উনসত্তরের এগারো দফা ও গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহে বিকশিত হয় এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যোগায়।[১]

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন প্রভাব বিস্তার করে তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব কম নয়। এদেশের জনসাধারণ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। এই সচেতনতা তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে নানাভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। সমকালীন শিল্প-সাহিত্যে-এর বহুমুখী প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বসবাসকারী প্রাগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মননশীল সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়।

গতানুগতিক নাট্যধারার পট-পরিবর্তিত হয়ে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক জীবন নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন এদেশের জনসাধারণকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি যুগিয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয়। মার্কসীয় ধ্যান-ধারণাপুষ্ট মানবতাবাদী নাট্যকারবৃন্দ সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়কে উপজীব্য করে নাট্য রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে মুনীর চৌধুরী লিখলেন তাঁর কালজয়ী নাটক 'কবর'। 'যার উত্তাপে এদেশের মানুষ আপন অস্তিত্বকে খুঁজে পেল, শুরু হলো সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার প্রাণপ্রবাহ।'[২] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটকে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতাও লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে রচিত নাটককে দুটি স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত করা যায়—

ক. রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ নাটক।

খ. সমাজ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নাটক।

---

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান—বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ১৩-১৪

২. জিয়াউল হাসান, মুনীর চৌধুরীর নাটক, প্রথম প্রকাশ :১৯৯০, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

ক. রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ নাটক

১

পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানি শাসকদের রাজনৈতিক উৎপীড়নের শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মৌলিক অধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত একজন আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মী রাশেদাকে নিয়ে মুনীর চৌধুরী ১৯৫০ সালে লিখলেন 'নষ্ট ছেলে'। পরবর্তীতে তিনটি একাঙ্কিকা একত্রিত করে ১৯৬৬ সালে 'কবর' নামে প্রকাশ করেন।

বিপ্লবী নেত্রী রাশেদার পিতা এরতাজুল করিম তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষক, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী, রাজনীতি করার অপরাধে তিনি কন্যাকে ত্যাগ করেছেন। নাট্যকার মুনীর চৌধুরী স্বল্প পরিসরে এরতাজুল করিমের চরিত্রটি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন—

> এরতাজ। ...যে মেয়ে কতকগুলো বে-শরিয়তি স্বদেশ বুলির মোহে বে আব্রু হয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এরতাজুল করিম তেমন মেয়েকে কন্যা বলে স্বীকার করে না।[৩]

এরতাজুল করিম বুর্জোয়া মানসিকতাপুষ্ট শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি। তিনি স্বার্থলোভী মজুতদার, প্রগতি বিরোধী, রাজনীতি বিদ্বেষী, উদার মানবিকতা বর্জিত, বাহ্যিকভাবে পলিস্ট অথচ অন্তর্গত কার্যপরিচয় ক্লেদাক্ত। তিনি তার চালের গুদামে চালবাজি' এবং শ্রমিকের'শ্রম চুরি' করে সম্পদের পাহাড় গড়েন। ...চৌদ্দ পুরুষের রক্তে তাজা খান্দান নিয়ে এরতাজুল গর্বিত, সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনা তাকে পীড়িত করে না। অথচ তার সন্তানদের মাঝে এই মানবতাবাদী চেতনা জাগ্রত। নাট্যকার সচেতনভাবে বিরুদ্ধবাদী এরতাজুলের পরিবার থেকেই সাম্যবাদী আন্দোলনের সূচনা করেছেন, শেকড়ে আঘাত দিয়েছেন।[৪]

'নষ্ট ছেলে' নাটিকাটির কেন্দ্রীয় চরিত্র রাশেদা নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিপুষ্ট। নাট্যকার ছাত্রজীবনে প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার ছোটবোন নাদেরা বেগমও তুখোড় রাজনৈতিক নেত্রী ছিলেন। মুনীর চৌধুরীর মতো তিনিও বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে জেল খেটেছেন।[৫] 'নষ্ট ছেলে' নাটিকার বিপ্লবী নেত্রী সম্ভবত নাদেরা বেগমেরই প্রতিচ্ছবি। এ সম্পর্কে তাদের অগ্রজ অধ্যাপক কবীর চৌধুরী লিখেছেন—

---

৩. মুনীর চৌধুরী, নষ্ট ছেলে, 'কবর', চট্টগ্রাম থেকে শাহীন বুক ক্লাব ১৯৬৬ সালে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করে। মানুষ, নষ্ট ছেলে, কবর তিনটি একাঙ্কিকার সংকলন। দ্রষ্টব্য : নষ্ট ছেলে, পৃ. ২৯-৩০

৪. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ৬৭

৫. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খণ্ড), ২য় সং ১৯৭৯, পৃ. ৩৩১

Dhaka University Institutional Repository

> The spoilt kid has an autobiographical element in it to the extent that the character of Apa is unmistakably modeled on the younger sister of the play wright who as a banned political member of a party wanted by the police successfully carried on her political activities for a long time as an underground worker till her final arrest.[৬]

এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্যটি স্মরণযোগ্য—

> ...নাদেরা বেগমের বিরুদ্ধে জেল নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যাদি অভিযোগ আনার পর ৩০শে নভেম্বর (১৯৪৯) জেল গেটে একজন সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারের জন্য তাকে হাজির করা হলো। এই বিচারের সময় নাদেরা বেগম কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করে বিচারক সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিজের জুতো ছুঁড়ে মারেন। এই ঘটনার পর নাদেরা বেগমের চুলের মুঠি ধরে তাকে মারতে মারতে জেল গেট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।[৭]

এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে নষ্ট ছেলে নাটিকার প্রগতিশীল অধ্যাপক এম্রানের সংলাপে—

> এম্রান। তারা ত খবরের কাগজে ইস্তাহার দিয়েছে, তোমার আপার ফাপানো কালো চুলের ঝুঁটি ধরে যে তাকে কয়েদখানার দুয়ারে পৌছে দেবে তার এনাম মিলবে দু'হাজার টাকা।[৮]

'নষ্ট ছেলে' নাটিকায় সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বাস্তব আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মী রাশেদাকে ঘিরে নাটিকাটি গড়ে উঠলেও তা প্রত্যক্ষভাবে প্রচলিত মূল্যবোধকে আঘাত হেনেছে। এখানে প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চিত্রিত হয়েছে। এ নাটকে নবীন ও প্রগতিশীলদের প্রতিনিধিত্ব করছে—রাশেদা, আমিন, খোকা ও বুবি। প্রগতিশীল দর্শনের অধ্যাপক এম্রান সাহেব এদের চিন্তা-চেতনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রাচীন তথা রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি এরতাজুল করিম ও জাহাঙ্গীর। প্রগতিশীলরা সমাজ শোষণ থেকে মুক্তির পক্ষে, অন্যদিকে রক্ষণশীলদের কাছে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার ছাড়া দেশ-সমাজ কোনো প্রাধান্য পায় না। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাশেদার আপোষহীন সংগ্রাম নাটকের উপজীব্য। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য সে তৎকালীন স্বৈরাচারী শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। শোষণে নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত লাখো লাখো অনাহারী মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেয়ার সংগ্রামে সে পথে নেমেছে—

---

৬. Munier Chowdhury, Three plays, Translated by Kabir Chowdhury, Bangla Academy, Dhaka, 1990

৭. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ-১৯৭৯, ঢাকা, পৃ. ৩৫

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

রাশেদা। আমাগীকাল ঈদ, হাজার হাজার লাখ লাখ লোক কালও রোজা রাখবে, কারণ তাদের ঘরে খাবার নেই। নামাজ পড়তে যেতে পারবে না, কারণ কাপড় নেই। ঘর থেকে বেরুতে পারবে না, ক্ষুধায়, লজ্জায়।[৯]

সমকালীন সময়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার। রাশেদার সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার করুণ প্রতিচ্ছবি। দেশবিভাগের পর বাঙালিদের উপর নতুন করে ধর্মীয় অনুশাসন জারি হওয়ায় রক্ষণশীল মুসলিম লীগ কর্মীদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রগতিশীল দর্শনের অধ্যাপক এম্রানের কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

এম্রান। ...দেখো তোমাদের কিন্তু আমি ভয় করি। মোল্লারা দেশশুদ্ধ চ্যাঁচামেচি করেও আজকাল আর আমাদের বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। সব্বাই ওদের আলখাল্লা আলগা করে ভেতরে ন্যাংটা চেহারাটা দেখে নিয়েছে।[১০]

পঞ্চাশের দশকে মুসলিম লীগের ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। তথাকথিত নীতিবাদীদের কাছে প্রগতিশীল তরুণরা 'নষ্ট ছেলে' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। এ নাটকে মুনীর চৌধুরী ঐ সমস্ত প্রগতিশীল নতুন প্রজন্মকে গৌরবান্বিত করে তুলেছেন অধ্যাপক এম্রানের সংলাপে—

জাহাঙ্গীর। ছেলেপুলের সামনে আপনি এগুলো কি বলছেন?

এম্রান। কাকে ছেলে মানুষ বলছো? আমাকে না নিজেকে? আমিনকে ছেলে মানুষ বোলো না। ওর বয়স কত জান? আমার বাহান্ন বৎসর এটা ওর, তোমার আটাশ সেটাও ওর, নতুন পৃথিবীর কয়েক হাজার বছরের অতীত তাও ওর, সেই সঙ্গে ওর নিজের বার বছর।[১১]

রাশেদা একজন কমিউনিস্ট কর্মী; পুলিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। অধ্যাপক এম্রানের সংলাপের মধ্য দিয়ে ভেসে উঠেছে রাশেদার বিপ্লবী জীবনের বাস্তব চিত্র—

এম্রান। ...এই রাত শেষ হলে কাল সকালে ঈদ। তোমার আপা তোমার মায়ের বড় মেয়ে, প্রথম সন্তান। পুলিশের তাড়া খেয়ে হয়তো কোনো জোলো জংলা ডোবার পাশে বসে শীতে কাঁপছে, মাথায় তেল পড়েনি তিন দিন, হাত খালি, হয়ত দুপুরে খাওয়াই হয়নি, হয়ত এতক্ষণে ধরা পড়ে মার খাচ্ছে, কত কিছুই হতে পারে।[১২]

---

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে রাশেদার পিতা এরতাজুল করিমের সংলাপের মধ্য দিয়ে তথাকথিত পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর তল্পিবাহক আমলার চিত্রও তুলে ধরেছেন—

> ...আমার সারা জীবনের গড়া স্বপ্ন, চৌদ্দ পুরুষের রক্তে তাজা খান্দান—সব এ বাড়ীর প্রতি ইটের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে। পুলিশ লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আজ সেগুলো ঘাটবে। এত বড় বেইজ্জতির আগে আমার মৃত্যু হয়নি কেন? বিষ জহর খেয়ে মরে যেতে পারল না মেয়েটা?[১৩]

বড় ভাই এরতাজুলের শ্রমিক শোষণ ও চালের আড়তের স্বার্থপর কারচুপি সম্পর্কে আদর্শবাদী এম্রান তীব্র কটাক্ষ করেছেন—

> ...চালের গুদাম থেকে রোজ তোমার আজকাল যা আয় হচ্ছে তাতে খান্দানের সোনার পাহাড় গড়ে উঠতে আর বেশি দেরি নেই। পুলিশের থানা তল্লাশী হাজারবার ঘুরে ফিরে গেলেও ওর চূড়া ছুঁতে পারবে না।[১৪]

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যে সংঘাত, নাট্যকার তা তুলে ধরেছেন রাশেদার সংলাপের মধ্য দিয়ে—

> শীতের মধ্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পেছনে গুণ্ডা পুলিশ। আমার মতো আরো অনেকের পেছনে। ছাপাখানায় গুণ্ডা-পুলিশ আমাদের কথাকে পর্যন্ত গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইছে।[১৫]

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী কেন্দ্রীয় চরিত্র রাশেদার মাধ্যমে যে আন্দোলনের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন তা সমাজ পরিবর্তনের অন্দোলন হলেও এর পটভূমিকায় রয়েছে এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন। রাশেদা একজন বিপ্লবী রাজনৈতিক নেত্রী, সে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায়। তার কার্যকলাপ ও কথাবার্তায় যে আন্দোলনের প্রকাশ ঘটেছে তা মূলত সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ।

২

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মোঃ আলী জিন্নাহ যখন ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়।[১৬] তখন বাঙলার মানুষ জিন্নাহ্‌র এই চাপিয়ে দেয়া অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি, শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছে—আসকার ইবনে শাইখ তখনই লিখলেন—'দুর্যোগ'। 'দুর্যোগ' স্বল্পায়তন বিশিষ্ট নাটিকা, এর

---

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩১
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
১৬. বদরুদ্দীন উমর, 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৯, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য দিয়ে নাট্যকার ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব ও আমজাদ নামের এক নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী যুবকের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রচলিত শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। পাকিস্তান সরকারের তাবেদার আমলা আখতার সাহেব একমাত্র কন্যা রিজিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমজাদকে লালন পালন করেন। কিন্তু আমজাদ তার বাসনাকে ধুলিস্মাৎ করে দিয়ে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। আখতার সাহেব স্ত্রী মাজেদার কাছে আক্ষেপ করে বলেছেন—

আখতার॥ ...আমার মুখ পুড়িয়েছে সে। আপিসের অনেকেই জানে, এই আমজাদের সঙ্গেই আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। এ অবস্থায় ওইসব পুচকে ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশে সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করা তার ঠিক হয়েছে।[১৭]

তৎকালীন সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণার ধারক ও বাহক আখতার সাহেব—যিনি জন্মগতভাবে সামন্ত ঐতিহ্যে লালিত, তীব্র অংহবোধ ও আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর আভিজাত্যের বেড়াজাল ভেঙ্গে মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে আসতে পারেননি, বরং ছাত্র আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। নবীন ও প্রবীণের এই বিরোধের চিত্রটি নাট্যকার নিম্নে উদ্ধৃত সংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন—

আখতার ॥ ছেলেদের এই আন্দোলনে তুমি নেতৃত্ব নিয়েছো?

আমজাদ ॥ ওদের সঙ্গে কাজ করছি আমি।

আখতার॥ সরকারের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ, সরকার নীরবে সহ্য করবেনা জান?

(আমজাদ নিরুত্তর)

রিজি। তুমি যাও।

(রিজিয়া চলে যায়)

তোমায় এসব ছাড়তে হবে। তুমি ছাত্র, লেখাপড়াই তোমার একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। তাছাড়া তোমার সামনে এবার এম.এ. আর সি.এস.পি. দুটো পরীক্ষা রয়েছে। ভাল করে না পড়লে......

আমজাদ ॥ সি.এস.পি. পরীক্ষা আমি দেব না।

আখতার॥ দেবে না? কারণ

(আমজাদ নিরুত্তর)

এই সমস্ত নোংরা রাজনীতি করবে তুমি?

আমজাদ॥ রাজনীতি নয়, দেশের সেবা আমার জীবনের ব্রত।

আখতার॥ কিন্তু আমি তা চাইনা। এ তোমার ব্রত হোক।

১৭. আসকার ইবনে শাইখ, দূরন্ত ঢেউ। আজিমপুর, ঢাকা থেকে শান্তি প্রকাশনী এই নাটিকা সংকলনটি ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রকাশ করে। অধ্যাপক আবুল কাশেমকে নাটিকা সংকলনটি উৎসর্গ করা হয়েছে। দূরন্ত ঢেউ, দুর্যোগ দ্রষ্টব্য : পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

আমজাদ॥ এ আমার আদর্শ।

আখতার॥ তুমি এ বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ?

আমজাদ॥ আদর্শ আমার স্থির লক্ষ্য।[১৮]

আখতার সাহেবের প্রচেষ্টা, রিজিয়ার ভালোবাসা কোনোটিই আমজাদকে ধরে রাখতে পারেনি। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে উপেক্ষা করে দেশের অসহায় গরিবদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছে। এক দুর্যোগের রাত্রে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যে সংঘাত তাও নাট্যকারের অন্তর্লোকে ক্রিয়াশীল ছিল। আমজাদের একটি সংলাপে এ কথার যথার্থতা সুস্পষ্ট—

আমজাদ॥ কাজের কি অন্ত আছে রিজি? নেই। আরে বাপদাদা চৌদ্দ পুরুষ যে ভাষায় কথা বলে এসেছে, আজ সে ভাষায় কথা বলার অধিকারও আমাদের থাকবেনা? মাথা খারাপ হয়েছে ওদের... দেশের লোকও ঘুমিয়ে নেই। সমস্ত দেশের বুক থেকে আজ আওয়াজ উঠেছে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে।[১৯]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে চিন্তা-চেতনার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত তরুণ এবং ব্রিটিশ ভারতে যৌবনপ্রাপ্ত বা অতিক্রান্ত যৌবন পৌঢ় ও বৃদ্ধদের মধ্যে মতগত পার্থক্য ছিল। বঞ্চনা প্রসূত অভিজ্ঞতার ফলে এবং ক্ষোভ বশে হিন্দুর শোষণমুক্ত বয়স্করা ক্ষতি স্বীকার করেও পাকিস্তানের স্থায়িত্ব রক্ষায় তৎপর ছিলেন। অন্যদিকে শিক্ষিত তরুণ সমাজ বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থেকে আন্দোলন ও বিক্ষোভের মাধ্যমে তাদের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। দুর্যোগ নাটিকার 'আখতার সাহেব' ব্রিটিশ শোষণ, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধ ও সংঘাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার কারণে তিনি পাকিস্তানের নিরাপত্তা কামনা করেছেন। কিন্তু আমজাদ নব্যশিক্ষিত তরুণ যুবক, সে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে মেনে নিতে পারেনি। দেশের দুর্দিনে তাই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। নিপীড়িত, লাঞ্ছিত জনতার শ্লোগানমুখর মিছিলে সে হারিয়ে গেছে। এভাবে দেশের তরুণ ছাত্রসমাজ প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে মানবিক মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ভাষা আন্দোলন এদেশের ছাত্রসমাজকে একটি প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করে এবং ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও পেশাদার শ্রেণীর ঐক্যজোট গঠনের রীতির সূত্রপাত করে।

৩

মাতৃভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের অকালমৃত্যু এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার নাট্যরূপ মুনীর চৌধুরীর 'কবর'। নাটকটির রচনাকাল ১৯৫৩, প্রকাশকাল ১৯৬৬ সাল। কারাবন্দি মুনীর

---

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী রনেশ দাশগুপ্তের অনুরোধেই 'কবর' নাটক রচনা করেন। এক সাক্ষাৎকারে নাট্যকার এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন—

> রনেশদাশ গোপনে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি। একটা নাটক লিখে দিতে হবে। জেলখানাতে অভিনীত হবে। রণেশদার হুকুম, আমাকে লিখতেই হলো নাটক। সেটি কবর।[২০]

তবে কবর নাটক নিছক ফরমাশি সৃষ্টি নয়। রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে নাটকটি রচিত হলেও এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।

নাটকের কাহিনী শুরু হয়েছে পুলিশের গুলি বর্ষণের পর শেষ রাতে গোরস্থানে। নাটকের চরিত্র সংখ্যা প্রধানত চারটি—রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ, মুর্দা ফকির ও গোরস্থানের গার্ড। এছাড়া আর আছে কয়েকটি ছায়ামূর্তি।

স্বৈরাচারী শাসকবর্গের নির্দেশে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের রাতের অন্ধকারে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করার জন্য নিয়ে আসা হয়। ইন্সপেক্টর হাফিজকে দায়িত্ব দিয়ে নেতা আশ্বস্ত হতে পারেননি, তিনি স্বয়ং কবরস্থানে উপস্থিত হয়েছেন। তার মতে—

> কিছু কাজ আছে যা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না, তা সে যত পটু হোক না কেন।[২১]

রাত প্রায় শেষ প্রহর। ভোর হওয়ার পূর্বেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু এ স্বল্প সময়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশগুলো মিলিয়ে আলাদা আলাদাভাবে দাফন করা সম্ভব নয় বলে সবাইকে এক গর্তে পুঁতে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়। এতে গোর-খুড়েরা প্রবল আপত্তি জানায়—

> মুসলমানের মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই, জানাজা নেই—তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না? এ হতে পারে না।[২২]

শহীদদের লাশ নিয়ে এ দুরাবস্থা দেখে ২৩ ফেব্রুয়ারি 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকায় লেখা হয়—

> ইসলামী বিধান অনুসারে মুসলমানদের লাশ অতি পবিত্র এবং অত্যন্ত তাজিমের সহিত দাফন কার্য সম্পন্ন করা বিধেয়। কিন্তু দুই দিনের পুলিশের জুলুমের ফলে শাহাদাত প্রাপ্ত লাশগুলি ইহাদের অভিভাবকদের ফেরত দেওয়া হয় নাই। শরীয়ত মোতাবেক তাহাদের শেষ কৃত্য সমাপন না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সরকারকে গোনাহের ভাগী হইতে হইবে। ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া জাহির করার পরও পাকিস্তানে এইরূপ ঘটিতে

---

২০. কবর প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণে আলী ইমাম, পারাপার, ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, একুশের সংকলন, উদ্ধৃত, থিয়েটার ৫ম বর্ষ , ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭, পৃ. ১৩১

২১. মুনীর চৌধুরী, 'কবর' , প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, শাহীন বুক ক্লাব, চট্টগ্রাম, পৃ. ৫৬

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া অত্যন্ত আপত্তিকর। মুসলমান জনসাধারণের মনের ক্ষতে ইহার দ্বারা লবণের ছিটা দেওয়া হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

গোরস্থানে অবস্থানরত মুর্দা ফকির সেও প্রতিবাদ করে ওঠে। লাশগুলো দেখেই সে বুঝতে পারে এদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। কারণ এ লাশের গন্ধ অন্যরকম। ঐষধের, গ্যাসের বারুদের গন্ধ। ফকির প্রতিবাদ করে এবং মুর্দা কবরে থাকবেনা এরূপ সম্ভাবনার কথা জানিয়ে যায়—

বাসি মরার গন্ধ আমি চিনি না। এ লাশের গন্ধ অন্যরকম। ওষুধের গ্যাসের বারুদের গন্ধ। এ মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন—এ মুর্দা কবরে থাকবে না। কবর ভেঙ্গে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।[২৩]

ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর সংবাদ শুধু শহরেই নয়, দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের সমস্ত দোকানপাট, গাড়ি-ঘোড়া, অফিস আদালত যানবাহন বন্ধ করে শ্রমিক-মজুর-কেরানী ও কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে এগিয়ে এসেছে। শহীদদের লাশগুলিকে মেডিক্যাল হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ভেতর গায়েবী জানাজা পড়া হলো। এদিন সমস্ত শহর মিলিটারীর হাতে দেয়া হয়েছে। তবুও দেখতে দেখতে অসংখ্য মানুষ জানাজায় এসে শরিক হলেন। ইমাম সাহেব মোনাজাত করলেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের অতি প্রিয় শহীদদের আত্মা যেন চিরশান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে।[২৪]

অতিরিক্ত মদ্যপান ও ভীতির কারণে নেতা ও হাফিজের মনে অতি প্রাকৃত আবহের সৃষ্টি হয়েছে। নাট্যকার নেতা ও হাফিজকে নেশাগ্রস্ত করে সমকালীন রাজনৈতিক সত্য তুলে ধরেছেন। তারা দেখে মুর্দাগুলো উঠে দাঁড়িয়েছে এবং কবরে যেতে অস্বীকার করছে। নেতা তার অভ্যাসমত মুর্দাদের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বুলি আওড়ানো শুরু করেন—

নেতা। দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরুব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এদেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক। কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে বসে।

মূর্তি। কবরে যাব না।

---

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

২৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র : চতুর্থ খণ্ড. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

নেতা। আগে কথাটা ভাল করে শোন। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠেছ। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূর্তি। ছিল। এখন নেই, খুলিই নেই। উড়ে গেছে ভেতরে যা ছিল, রাস্তায় ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা। জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাও নি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকে অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে। তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মত ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে যারা এখন মরেনি—তাদের নামে মিনতি করছি—তুমি যাও, যাও, যাও।

মূর্তি। আমি বাঁচবো।

নেতা। কি লাভ তোমার বেঁচে। অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া তোমার বেঁচে কি লাভ? তুমি বেঁচে থাকলে বার বার দেশে আগুন জ্বলে উঠবে, সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার না করে সে আগুন নিভবে না। তার চেয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত কবরে চলে যাও। দেখবে দু'দিনেই সব শান্ত হয়ে যাবে। দেশে সুখ ফিরে আসবে। (মূর্তি মাথা নাড়ে) আমি ওয়াদা করছি তোমাদের দাবী অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেবো। তোমার নামে মনুমেন্ট গড়ে দেবো। তোমার দাবী এ্যাসেম্বলীতে পাস করিয়ে নেবো। দেশ জোড়া তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করবো। যা বলবে তাই করবো।[২৫]

ছাত্র মূর্তি করবে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। উপরন্তু আরেক কেরানি মূর্তি উঠে নেতার প্রতিবাদ করে—

> আপনি মিথ্যেবাদী। কথা দিয়ে আপনি কথা রাখেন না। আপনি অনেক ওয়াদা করে সেবার আমাদের দেড়মাস লম্বা ধর্মঘট ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমার ছোট ছেলেটা তখন মারা যায়। আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা ভুলিনি। আপনি মিথ্যেবাদী।[২৬]

ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের সাথে সাধারণ কর্মজীবী মানুষও যে ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলো কেরানি তার দৃষ্টান্ত। এরপর হফিজ শহীদদের মায়ের ও স্ত্রীর রূপ ধারণ করে ওদের সমাধিস্থ হওয়ার প্ররোচনা দান করে। এক পর্যায়ে নেতা ক্ষুব্ধ হয়ে মুর্দা ফকিরকে গুলি করতে উদ্যত হলে ক'টি রক্তমাখা বুলেট হাতে মুর্দা ফকির এসে হাজির হয়। নেতার হাতে বুলেট তুলে দিয়ে সে গোরস্থানের সকল মুর্দাকে মিছিল করে আর একবার এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়—

> তোরা কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলী-গুলী হবে। স্ফূর্তি করে উঠে আয় সব। কোথায় গেলি? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে? আজ গুলি—গুলি হবে আজ। কবর খালি করে সব উঠে আয়।[২৭]

---

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮–৭৯

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

ভোর হওয়ার পূর্বেই সব লাশ কবর দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। ইন্সপেক্টর হাফিজ নেতাকে নিয়ে গোরস্থান ত্যাগ করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারির সেই আজিমপুর গোরস্থানের ভয়াবহ রাত্রির করুণ দৃশ্যপট যা তিনি কবর নাটকে তুলে ধরেছেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

> শুধুমাত্র কবর নাটকটিতে একুশের তাৎপর্য খোঁজা হলে খানিকটা ভুলই করা হবে। হয়তো আরো বেশি কিছু বলার চেষ্টা করেছি আমি। আরো বেশি কিছু।[২৮]

ছাত্রজীবনে মুনীর চৌধুরী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে তাঁর চিন্তা-চেতনায় প্রগতিশীল মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণা রূপায়িত হয়েছে। পাশাপাশি সমকালীন সময়ের রক্ষণশীল সুবিধাভোগী নেতার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার আচরণকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। উৎকোচ দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির হীন প্রবণতাও ছিল এসব নেতাদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক সদস্য মুসলিম লীগের জমিদারি উচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতা করলে তার মুখ বন্ধ করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মন্ত্রি সভার সদস্য করে নেওয়া হয়।[২৯] নাটকে শহীদদের কবরে ফিরে যাওয়ার জন্য নেতার বক্তৃতায় তাদের চরিত্রের গোপনতম দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর তল্পিবাহক মুসলিম লীগ নেতাদের ধর্মীয় রাজনীতির যাতাকলে এদেশের নিরীহ বাঙালিরা শোষিত হতে থাকে। কবর নাটকের সুচতুর ইন্সপেক্টর হাফিজ ঠিকই বুঝতে পেরেছিল, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে এসব সুযোগ সন্ধানীদের জন্য। নেতা তাকে রিককমেণ্ডেশন নিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলে সে বলে—

> মেহেরবাণী স্যার! পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি অফিসাররাই কেবল কিছু পেলাম না। ব্রিটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে, আমাদের এখনও সেই দশা। যদি আপনারাও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচবো কি করে? আমাদের ত কোনো রাজনীতি নেই স্যার। সরকারই মা-বাপ। যখন যে দল হুকুমত চালায় তার হুকুমই তামিল করি।[৩০]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এদেশের জনসাধারণের উপর নানাভাবে শোষণ চালিয়েছে। সম্পদের অসম বণ্টন প্রক্রিয়ায় এদেশের জনসাধারণকে বারবার দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হতে হয়েছে। দুর্ভিক্ষের এই করুণ বাস্তবতাকে নাট্যকার উপলব্ধি করেছেন কবর নাটকের হাফিজের বর্ণনায়—

---

২৮. 'কবর' প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, থিয়েটার, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৭৭, পৃ. ১৩৫

২৯. শান্তনু কায়সার, কবর আমাদের পদচিহ্ন, 'সচিত্র সন্ধানী' একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ১৯৮২, পৃ. ৪৩। সংগ্রহ, জিয়াউল হাসান, মুনীর চৌধুরীর নাটক, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ৯৮

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

...লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুজে দিতে চায়—কারণ ওর ধারণা, মানুষ শুধু এক রকমই মরতে পারে—খেতে না পেয়ে।[৩১]

এ প্রসঙ্গে ১০ জুলাই ১৯৪৯ সালের 'আজাদ' পত্রিকার একটি সংবাদ উল্লেখ করা যেতে পারে—

ইহা একটি দুর্বোধ্য রহস্য যে পাকিস্তানের এক অংশে যখন প্রচুর খাদ্য রহিয়াছে এবং শুধু তাই নয়, সেই খাদ্য হইতে কিছু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভবও হইতেছে—পাকিস্তানের অন্য অংশে তখন দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়া দুর্ভিক্ষ ঘনাইয়া আসিতেছে।

'কবর' নাটকের মুর্দা ফকিরের চরিত্রটি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সে তার সর্বস্ব হারিয়েছে। স্বজন হারা, নিস্ব ও উন্মাদ প্রায় মুর্দা ফকির গোরস্থান ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না, আপন মনে কবরের সঙ্গে কথা বলে। নাট্যকার হাফিজের সংলাপের মধ্য দিয়ে মুর্দা ফকিরের পরিচয় তুলে ধরেছেন—

লোকটা এমনিতে ভাল লেখাপড়া জানে। ভাল আলেম গ্রামের স্কুলে মাস্টারী করত। তেতাল্লিশে দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলেমেয়ে, মা-বৌকে মরতে দেখেছে। কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতের বেলায় শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্থান থেকে কিছুতেই নড়তেই চায়না। বলে, মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি। বড় ট্র্যাজিক স্যার।[৩২]

মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে মার্কিন নাট্যকার Irwin Shaw-এর Bury The Dead[৩৩] নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দুটি নাটকের বিষয় ও সংলাপের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্যে কবর তাঁর সার্থক সৃষ্টি।

১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় অবস্থানরত কয়েকজন ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রগতিশীল মার্কিন সৈনিকের সাথে মুনীর চৌধুরীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। সে সময় তাঁর আমেরিকান সাহিত্য পাঠের অধিক সুযোগ ঘটে এবং তখনই তিনি Bury The Dead নাটকটি পড়েন। নাটকটি মুনীর চৌধুরীকে অবচেতনভাবে খানিকটা প্রভাবান্বিত করলেও তাঁর মূল জীবনদৃষ্টি ও নান্দনিক চরিত্র্য লক্ষণ থেকে দূরে ঠেলে দেয়নি। বরং স্বাদেশিক বিষয় উপকরণ, মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ও আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্যে কবর নাটকটিকে করেছে বিশিষ্ট।[৩৪]

---

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

৩৩. মার্কিন নাট্যকার Irwin shaw-এর Bury The Dead নাটকটি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নাট্যকার নাটকটি তাঁর মাকে উৎসর্গ করেন।

৩৪. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

কবর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত আর Bury The Dead বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। এই নাটকে বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈন্যরা কবরে যেতে চায় না, তাদের আত্মীয়স্বজনরা তাদের কবরে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করে। কবর নাটকে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের লাশ কবরে যেতে চায় না, প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ কবরে ফিরে যাবার জন্য তাদের অনুরোধ জানায়। দুটি নাটকেই উজ্জ্বল আলোর ব্যবহার নেই ; আলো আঁধারি, ভৌতিক, আশরীরী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। কবর দেয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মদ খায়, সংলাপ গঠনেও সাদৃশ্য বিদ্যমান। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ছাত্রের সঙ্গে নেতার কথোপকথনে 'বেরী দ্যা ডেড' নাটকের চতুর্থ মুর্দার সংলাপই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

নেতা। ...বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠেছ। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূর্তি। ছিল এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।[৩৫]

'বেরী দি ডেড' নাটকের চতুর্থ মুর্দার সংলাপে শোনা যায়—

Fourth corpse। I was there at the end and thought I had life in my hand for another day, but a shell came and life dripped into the mud.[৩৬]

ইন্সপেক্টর হাফিজের সংলাপের সঙ্গে 'প্রথম জেনারেল'-এর সংলাপে সাদৃশ্য লক্ষণীয়—

হাফিজ। অবুঝের মত কথা বোলো না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ। অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।[৩৭]

First General। I grant, my friends, that it's unfortunate that you're dead...Gentlemen, your country demands of you that you lie down and allow yourselves to be buried.[৩৮]

মুর্দা ফকিরের সংলাপে রিপোর্টারের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে—

ফকির। ...এই মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন—এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙ্গে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।[৩৯]

Repoter। ...Never! Never! Never! you can't put them down, put one down and ten will spring up like weeds in an old garden.[৪০]

---

৩৫. কবর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
৩৬. John Gassner (Ed.) Twenty Best Plays of the Modern American Theatre, 16th printing, 1939, New York, Crown publishers, p. 751
৩৭. কবর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
৩৮. Same as to the No. 36, P. 749
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
৪০. Ibid, p. 762

Dhaka University Institutional Repository

আবার কোনো কোনো সংলাপে 'বেবী দি ডেড' নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো—

নেতা। ...পুঁতে ফেল। দশ–পনেরো–বিশ–পঁচিশ হাত যত নিচে পারো। পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে ভরাট করে গেঁথে ফেল।...[৪১]

Second Businessman। Bury them! Bury them six feet under!

Third Businessman! Sink'em with lead.[৪২]

উভয় নাটকের সবচেয়ে অধিক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে। এ দৃশ্যে মুর্দা ফকিরের শহীদদের প্রতি আহ্বান (...উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়...') এবং মার্থা ওয়েবস্টারের আহ্বানে (Tell'em all to stand up! Tell'em! Tell'em) একই ধ্বনি উচ্চারিত হয়।[৪৩]

সংলাপ নির্মিতির ক্ষেত্রে দুটি নাটকের মধ্যে সাযুজ্য বিদ্যমান থাকলেও দুটি নাটকের ভৌগোলিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং চরিত্রায়ণের ভিন্নতা সুস্পষ্ট। শ্রেণীস্বার্থ, মানবিকতা ও অস্তিত্বচেতনা নাটক দু'টির বিষয়গত ঐক্য রক্ষা করে বলেই দৃশ্যায়ন ও সংলাপ নির্মাণে সাদৃশ্য এসেছে। এই সাদৃশ্য লক্ষণকে সমভাবনার ফসল বলাই সমীচীন, পুরোপুরি প্রভাবজাত না বলে।[৪৪] প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের দমননীতি ও ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জাগ্রত জনতার আবেদনকে নাট্যকার লাশের মুখে প্রতিবাদী সংলাপে চিত্রায়ণের জন্য রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রসমূহ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও ঘটনাধারাকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। 'কবর' নাটক রচনায় মুনীর চৌধুরীর কৃতিত্ব ও শিল্পসাফল্য প্রশংসনীয়।

অভিব্যক্তিবাদ ও এ্যাবসার্ড নাট্যকলার যে সংগঠনশৈলী কিংবা অতি প্রাকৃত নাটকের যে আবহ, অংশত হলেও তা কবর নাটকে অনুসৃত হয়েছে।[৪৫] সংলাপ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপাত অসংলগ্নতা, কবরস্থানের ভীতিকর আলো আধারী পরিবেশে এক রহস্যময় জগৎ নির্মাণ করে নাট্যকার সেখানে উপস্থাপন করেছেন কতকগুলি ছায়ামূর্তি এবং মুর্দা ফকিরের সংলাপ ও আচরণে অতি প্রাকৃত আবহ সৃষ্টি হয়েছে। ছদ্মবেশ, ছলনা ও রহস্যের মধ্য দিয়েই চরিত্রসমূহের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য চরিত্রসমূহের সংলাপে

---

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
৪২. Ibid, p. 753
৪৩. জিয়াউল হাসান, মুনীর চৌধুরীর নাটক, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ১০৩
৪৪. মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
৪৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

আপাত বিচ্ছিন্নতা, এ নাটকে সেটি বিদ্যমান। নেতা, হাফিজ ও গার্ডের পারস্পরিক সংলাপে 'পূর্বাপর সম্পর্ক শূন্য'[৪৬] অথচ অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত যা অবিসংবাদিতভাবে এ্যাবসার্ড রীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—

নেতা। (বিবর্ণ মুখে) ইন্সপেক্টর। হার্টটা জানি কেমন করছে। বড় ভয় পেয়ে গেছি। একটু ধরে রেখো আমাকে! আর, আর একটু ঢেলে দিতে পারবে?

হাফিজ। না আপনার এখনও হুঁশ নেই। আমার নিজেরও হয়ত নেই। ঠিক বুঝতে পারছি না।

(পিছন হইতে গার্ড হঠাৎ লণ্ঠন হাতে ঢুকিয়া পড়িয়া প্রচণ্ড শব্দে বুট ঠুকিয়া স্যালুট করে।)

নেতা। (চমকাইয়া) কে? এটা কি আবার?

হাফিজ। (দেখিয়া) ইডিয়ট! এটা কি তোমার প্যারেড গ্রাউন্ড নাকি? বন্দুকের গুলীর মত স্যালুট করতে শিখেছ দেখছি। কি চাও?

গার্ড। গাড়িতে উইঠ্যা হগলে আপনাগো লাইগা এন্তেজার করতাছে। সব কাম খতম। কারফিউ শেষ হইতেও আর দেরি নেই!

হাফিজ। (প্রথম লক্ষ্য করিল যে, মঞ্চ খালি। ভাল করে কয়েকবার চোখ কচলায়) গুড! সব কাজ খতম ত? গুড। সব কাজ খতম স্যার। নীট জব। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি স্যার? ভাল করে দেখুন না নিজেই।

নেতা। (ধীরে ধীরে চোখ ঘুরাইয়া দেখে, তারপর সামনের দিকে অর্থহীন বিষণ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া থাকে) হুম।

গার্ড। কিছু তালাশ করতেছেন হুজুর? খুঁইজা দেখুম?

নেতা। না চলো।

হাফিজ। কিন্তু না স্যার। এসব কিছু না। গোরস্থানে এ রকম কত কিছু হয়। তার ওপর আবার স্যার মানে—

নেতা। হুম। চলো। আর দ্যাখো মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক।

(বুকে হাত চাপিয়া ধরে)

হাফিজ। এ্যাঁ? মুর্দা ফকির? ওহ্। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই! ইয়েস স্যার।

(সকলে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। গার্ড গ্লাস বোতল ইত্যাদি গুছাইয়া লইবে।)[৪৭]

সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত কবর নাটকে এ্যাবসার্ড ধর্মের প্রভাব পড়েছে। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়—

> এই নাটকেরও (কবর) স্থানে স্থানে এ্যাবসার্ড নাটকের আভাস লক্ষণীয়, যেখানে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা ধূসর ও অস্পষ্ট, যেখানে বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসের ঝলকানি, তবে সেই আভাস

---

৪৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, মুনীর চৌধুরীর নাটক : অ্যাবসার্ড ধর্ম, 'নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৯৩, পৃ. ২০২

৪৭. কবর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

প্রান্তীয়, কেন্দ্রীয় নয়। তবু মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করে তার মুখে সংলাপ দিয়ে এবং তথাকথিত জীবিতকে লাশের চাইতে নির্জীবরূপে তুলে ধরে এবং মুর্দা ফকিরের অদ্ভুত চরিত্রটি সৃষ্টির মাধ্যমে—মুনীর চৌধুরী এই নাটকে কিছুটা এ্যাবসার্ড চারিত্র্য এনেছেন।[৪৮]

ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের মতো মুনীর চৌধুরীও একদিন হারিয়ে গেলেন শত শত লাশের ভিড়ে। সমালোচক রফিকুল ইসলাম যথার্থই উল্লেখ করেছেন—

শুনেছি মহৎ স্রষ্টা ভবিষৎ দ্রষ্টা হন, মুনীর চৌধুরীর 'কবর' কি তাঁর নিজের এবং মাতৃভূমির ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ছিল না? কবর নাটক রচনার মাত্র বিশ বছরের মধ্যেই কি ঘটে গেল এদেশে আর তাঁর নিজের জীবনে? বায়ান্ন সালের 'কবর' নাটকের... দৃশ্য একাত্তর সালে সত্য হয়ে উঠল না? ...তিনি কি কবর রচনার সময় নিজের অজান্তে আপন নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৪৯]

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত কবর নাটকটিতে বিধৃত হয়েছে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতির বাস্তবচিত্র। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক মোহাম্মদ মজিরউদ্দিন লিখেছেন—

কবর রচনাটিতে একদিকে জালিমের অত্যাচারের পৈশাচিক চিত্র, ন্যায্য দাবীর কাছে অত্যাচারীর ন্যাক্কারজনক পরাভব ও সংগ্রামী মানুষের অমর আত্মার বিজয় ফুটে উঠেছে।[৫০]

'কবর' নাটকের চরিত্রগুলি যেমন নেতা, ইন্সপেক্টর হাফিজ, মুর্দা ফকির এবং মূর্তিগুলি একুশে ফেব্রুয়ারির মর্মন্তুদ ঘটনার যথার্থ প্রতিনিধি, তাদের সংলাপ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ, যার মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবর্গের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের জঘন্য ও বীভৎস রূপ চিত্রিত করা হয়েছে। ধর্মের ছত্রছায়ায় তারা নিজেদের হীন স্বার্থোদ্ধারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। কবর নাটকের স্বল্প পরিসরে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নেতার চরিত্রে শাসক মুসলিম লীগ সরকারের, হাফিজের চরিত্রে আজ্ঞাবহ আমলার, মুর্দা ফকিরের চরিত্রে প্রতিবাদী জনতার আর মূর্তিগুলি সংগ্রামী ছাত্র সমাজের প্রতিকৃতিরূপে অঙ্কিত হয়েছে। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি ঘটে যাওয়া মর্মন্তুদ কাহিনীর প্রতিবাদী নাট্যরূপ 'কবর'। জিয়া হায়দারের মতে, এ নাটকের মূল্য যুগান্তকারী এবং বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একমাত্র রাজনৈতিক নাট্য-দলিলরূপে সম্মানিত।[৫১] বিশিষ্ট সমালোচক আবু হেনা মোস্তফা কামালের মতে, কবর সম্ভবত বাংলাদেশের সাহিত্যে প্রথম প্রতিবাদী নাটক।[৫২] তাই কবর আমাদের আধুনিক নাট্য ঐতিহ্য ও

---

৪৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪০০, জুন ১৯৯৩, পৃ. ২০২

৪৯. রফিকুল ইসলাম, মুনীর চৌধুরীর জীবন কথা, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, আকরম হোসেন সম্পাদিত বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১৮-১৯

৫০. মোহাম্মদ মজির উদ্দিন—বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, পৃ. ৪৭৩

৫১. জিয়া হায়দার, নাট্য ও নাটক, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ১০৬

৫২. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মুনীর চৌধুরীর নাটক, কথা ও কবিতা, ঢাকা, মুক্তধারা ১৯৮১, পৃ. ৯৬

অস্তিত্বের শেকড়, বাতিল মূল্যবোধ ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিকে কবর দিয়ে অগ্রসর চেতনা সৃষ্টির দিক নির্দেশক প্রতিবাদী নাট্যসাহিত্য।[৫৩] বাংলাদেশের গণ–নাটকের ইতিহাসে 'কবর' চির জ্যোতির্ময় ধ্রুবতারকা।[৫৪]

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ চেতনা ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। বাঙালিদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে। ...১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলাদেশের প্রথম গণচেতনার সুসংগঠিত বহিঃপ্রকাশ এবং পরবর্তীকালে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।[৫৫]

খ. সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নাটক

১

আসকার ইবনে শাইখের 'বিদ্রোহী পদ্মা' পদ্মাতীরের সংগ্রামী মানুষের জীবনালেখ্য। পদ্মাতীরে জেগে ওঠা নতুন চরকে কেন্দ্র করে জমিদার–প্রজার দ্বন্দ্ব–সংঘাতের কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত। পদ্মায় জেগে ওঠা চরকে নিয়ে গরিব চাষীরা স্বপ্ন দেখে : 'নতুন চরে কিন্তু ধান হবে প্রচুর'[৫৬] কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে জমিদারের লোক তরফদার চায় তাতে জমিদারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে—

রহমত॥ আপনের নামে বন্দোবস্ত। আমাগো চর, এত বড় আইছে ধান গাছ—

তরফ॥ তোমরা বন্দোবস্ত করে নিয়েছ নাকি?

রফিক॥ এর কোনো প্রয়োজন পড়ে না তরফদার সা'ব। ওপাড় ভেঙ্গে এপাড়ে চর জেগেছে। দু'পাড়েই এদের জমি। চর তো এদেরই। জমিদার শুধু খাজনা পাবে।

তরফ॥ তবু এর মালিক তো জমিদার। তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া নিশ্চয়ই করতে হবে।

রহমত॥ কথাটা ভুল কইলেন তরফদার সা'ব। মালিক জমিদার না। মালিক আল্লাহ্।

তরফ॥ হেঃ হেঃ শোন কথা। আল্লা? আল্লা তো আছেনই। কিন্তু ওপারে জমিদারের ডিহি কাছারী ভাঙ্গল পদ্মা, এ পারের চরে জমিদারের স্বত্ব থাকবে না?[৫৭]

---

৫৩. পূর্বোক্ত, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, পৃ. ৬০

৫৪. কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য, বাংলা একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব, প্রকৃতি ও বিকাশ, ১৯৮৮, পৃ. ৪৫০

৫৫. কে. এম. রাইস উদ্দিন খান, বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬, পৃ. ৬৪২

৫৬. 'বিদ্রোহী পদ্মা' ঢাকা, শান্তি প্রকাশনী থেকে ১৯৫২ (১৩৫৯) সালে প্রকাশিত হয়। পদ্মাপারের মানুষের হাতে নাট্যকার নাটকটি উৎসর্গ করেন। পরবর্তীতে বিদ্রোহী পদ্মা নাটকটি আবিদ আজাদ ও মাহবুব হাসান সম্পাদিত আসকার রচনাবলী ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আসকার রচনাবলী (১ম খণ্ড) প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, বিদ্রোহী পদ্মা, দ্রষ্টব্য : পৃ. ২০৫

৫৭. বিদ্রোহী পদ্মা, পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

গরিব চাষীদের কষ্টে বোনা ফসলের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে জমিদারের, তাকে সহযোগিতা করে ধূর্ত, কায়েমি স্বার্থবাদী শ্রেণীর লোকজন। এদের চক্রান্তে পড়ে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয় নিরীহ, অসহায় প্রজা। রহমত, ঈশান, অর্জুন, জমধর, রফিক মাস্টার জমিদারের নায়েব দেওয়ান কর্তৃক অপমানিত হয়েছে, হারিয়েছে তাদের মুখের গ্রাস। পদ্মাতীরের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে জমিদারের অন্যায় অবিচার নীরবে সহ্য করে এসেছে। রফিক মাস্টার হিন্দু-মুসলমান প্রজাকে সংঘবদ্ধ করেছে : 'পদ্মা তীরের মানুষ তোমরা, পদ্মা তোমাদের কানে কানে কথা কয়।[৫৮] রফিক মাস্টার জমিদারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে—

রফিক ।। যাদের অত্যাচারে তোমাদের সুখ-শান্তি নষ্ট হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে।

অর্জুন ।। কত শক্তিমান তারা।

রহমত ।। আমরা সকলে একত্রে আরও বেশি শক্তিমান।

ঈশান ।। তাছাড়া ধর্মও তো আছে। ওরা শুধু ধনেই মারে না, মানেও মারে।

রহমত ।। অর্জুন ! জন্মভূমি ছাড়া অন্য কোথাও সুখ পাইবা না।

রফিক ।। ওদের জাত সকল দেশেই আছে। আর দুর্বল লাঞ্ছিত হয় সব দেশেই একইভাবে।

অর্জুন ।। আপনেরা সবেই পাশে থাকবেন ?

রহমত ।। সবেই আমরা চেষ্টা করি, সবেই আমরা গরীব। পরস্পরের পাশে যদি না থাকি, কেউ বাঁচতে পারব না।

রফিক ।। জালেমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ধর্মের নির্দেশ।[৫৯]

জমিদার দেওয়ানের প্রচেষ্টায় ঈশানের মেয়ে সুধাকে অপহরণ করে। ধূর্ত-কূট বুদ্ধিসম্পন্ন নায়েব নিজেকে হিন্দু বলে হিন্দু সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করে হিন্দুদের স্বপক্ষে আনায় প্রয়াসী হয় এবং সুধাকে অপহরণের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছে। সুধাকে অপহরণের জন্য নায়েব আমুকে দায়ী করেছে :

নায়েব ।। শোন ঈশান ! এ কাজ আমু করেছে। আর সুধাও ইচ্ছা করে যায়নি, জোর করে নিয়েছে, কেস্ তোমাকেই করতে হবে। এ ব্যাপারের সঙ্গে সমস্ত হিন্দুর মান-সম্মান জড়িত। হিন্দুর মেয়ে সুধা, আমিও হিন্দু। আঘাত শুধু তোমার মনেই লাগেনি ; আমার মনেও লেগেছে। জমিদারের চাকরি করি। বাধ্য হয়ে আমাকে হিন্দু প্রজার উপরও জুলুম করতে হয়। কিন্তু ভগবান জানেন, কি কষ্ট আমি এতে পাই।

(আর বলতে পারে না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে)।

---

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

এক অন্তর্যামী ছাড়া আমার মনের কথা কে জানবে বল? তুমি কি মনে কর, আগের দিন হিন্দুর আছে? থাকলে এত বড় সাহস আমুর হয়?

(ঈশান মুখ তুলে তাকায়)

তুমি কি মনে কর, রফিক মাষ্টারের এ কাজে হাত নেই।[৬০]

জমিদার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে চরের ধান নিজের গোলায় তুলতে চেয়েছিল। গ্রামবাসীরা জমিদারের চক্রান্ত বুঝতে পেরে রফিক মাস্টারের নেতৃত্বে তারা সম্মিলিতভাবে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। প্রজাদের সম্মিলিত প্রতিবাদে জমিদার পরাজিত হয় এবং প্রজারা সোনার ধান ও সুধাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

'জমিদারী-প্রথা' বিলুপ্ত হলেও গ্রাম বাঙলার নিরীহ মানুষ অত্যাচারী জমিদারের শোষণ-নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পায়নি। কিন্তু নির্যাতিত অসহায় মানুষও নেমে থাকেনি। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে সংগ্রাম করে পরিশেষে বিজয় অর্জন করেছে। উদ্ধৃত সংলাপে তারই স্বাক্ষর পাওয়া যায়—

রহমত।। আমার ক্ষেতের ধান উঠব দেওয়ানের গোলায়? আমরা উপাস করব, ভাঙ্গা ঘরে আমার মেয়ে মরব ঔষধ না পাইয়া, আর দেওয়ান দালানে বইসা আমার ধন দুই হাতে উড়াইব?

রফিক।। (রহমতের দিকে দৃপ্ত চোখে চেয়ে) উড়াতে আর দেব না। তবে এ স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বুক উঁচু করে দাঁড়াব দেশের লাঞ্ছিত মানুষ। কিন্তু তা মুহূর্তের আবেগ নয়। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সবল হয়ে, সাবধান হয়ে।[৬১]

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে সামন্তশক্তি তাদের শাসন আর শোষণকে সুদৃঢ় করতে সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মকে বারবার ব্যবহার করেছে। সাম্রাজ্যবাদী মদদপুষ্ট সামন্ত শক্তি এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে হিন্দু-মুসলমান মিলিত বাংলাদেশ হিসাবে গ্রহণ করতে দেয়নি। বিভিন্ন সময়ে সামন্ত শক্তির স্বার্থসিদ্ধির মানসে এদেশে বার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এক শ্রেণীর হিন্দু সামাজিকভাবে অসহায় বোধ করতে থাকেন। বৃহত্তর হিন্দু সম্প্রদায়ের এই মনোভাব নাট্যকার গভীরভাবে অনুভব করেছেন।[৬২] আমু সুধার প্রসঙ্গে রহমতের বক্তব্য—

রহমত।। ...আমার ভাইয়ের সাত খুন মাফ? এই অভ্যাসখান যদি আস্তে আস্তে বাড়ে, তখন? তখন তো আমার ভাই দেইখা কেউ ছাইড়া দিবা না। এই সমস্ত কিছু না। আসলে তোমরা সব মেদি হইয়া গেছ এখন।

---

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯
৬২. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

অর্জুন॥ কথাটা ঠিকই। এখন আমরা আর আগের আমরা নাই। এইখানে মুখ তুইলা কথা কইতে ডর করে।[৬৩]

'বিদ্রোহী পদ্মা' নাটকে নাট্যকার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি কামনা করেছেন। রহমতের সংলাপের মধ্য দিয়ে সেই আশা ব্যক্ত হয়েছে —

রহমত॥ অর্জুন শরীরটা কাইটা দেখ তোর শরীরেও যে রক্ত, আমার শরীরেও তাই। আমরা পর না অর্জুন, পর না। আমরা মানুষ, সবেই এক মানুষ, সবেই মানুষ। দুষমনের কথায় ভুলিস্ না ভাই। চর খালি আমার না সবেরই। হিন্দু-মুসলমানের এই নতুন চর।[৬৪]

'বিদ্রোহী পদ্মা' নাটকে সমকালীন সমাজ ও জীবনের বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে হিন্দুরা পাকিস্তানে বসবাস করতে একদিকে যেমন নিরাপদ বোধ করেনি, তেমনি মুসলমানদের কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখেছিল। সুযোগ সন্ধানী সামন্ত প্রভুরা এই বিরোধকে আরও তরান্বিত করেছে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করেছে। নাট্যকার একদিকে যেমন ধনী সম্প্রদায়ের কায়েমি স্বার্থবাদী রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন অন্যদিকে মেহনতি মানুষের প্রতি তার সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। 'বিদ্রোহী পদ্মা' নাটকটি শ্রেণী সংগ্রাম, গণচেতনা ও নির্যাতিত মানুষের দাবি প্রতিষ্ঠার শিল্পভাষ্য।

২

আসকার ইবনে শাইখের 'আওয়াজ' নাটিকায় আলিম চকদার নামের এক মজুতদার-চোরাকারবারীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় সে প্রচুর ধান গোলাজাত করে রেখেছে। রাতের অন্ধকারে প্রতি সপ্তাহে তিন শ' মণ ধান সীমান্তের ওপারে পাচার করে দেয়—

চকদার॥ কোন রকমে শুধু পাকিস্তানের সীমানা পর্যন্ত নিয়ে দিলেই খালাস। সীমানা পার করবার ব্যবস্থা ওরাই করবে।

খালেক॥ কিন্তু এতটুকু পথ, ধানের ব্যাপার, নির্বিঘ্নে যাবে কিনা, তাই ভাবছি।

চকদার॥ যাবে রে বেটা, যাবে। কেন আগেই ভয় পাস? প্রতি সপ্তাহে তিন শ' মণ করে ধান—লাভের দিকটাও একটু ভেবে দ্যাখ। মনোরঞ্জন ওদিকের বর্ডারে ট্রাক নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে।[৬৫]

চকদার সীমান্ত দিয়ে চাউল বিদেশে পাচার করে দেশে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি করে, চাউলের দামও দ্বিগুণ বেড়ে যায়—

---

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩
৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮
৬৫. আবিদ আজাদ ও মাহবুব হাসান সম্পাদিত, আসকার রচনাবলী (২য় খণ্ড), প্রকাশ ১৯৯২, আওয়াজ, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

...এই দুই এক মাসেই এ অঞ্চলের ধান সব চলে যাবে বাইরে, তখন, তখন দেখে নিস বেটা ধানের কি দাম হয়। হেঃ হেঃ—স্টকে হাত দেব তখন।[৬৬]

খাদ্যের অভাবে দেশের জনসাধারণ দুর্বিসহ জীবনযাপন করেছে। শেষ সম্বল ঘটি, বাটি, থালা এমনকি জমি পর্যন্ত সামান্য মূল্যে চকদারের কাছে বন্ধক রেখে সেই অর্থ দিয়ে চড়া দামে ধান কিনে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করেছে। দেশের জনসাধারণের দুর্দিনে লোভী-মুনাফাখোর চকদারের গোলা ভর্তি হচ্ছে ধানে। নিপীড়িত গ্রামবাসীদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে রশীদ মিয়া। চকদার তাকে থানার ওসি সাহেবের কাছে 'কমিউনিস্ট' বলে অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—

বেশ তো, থানায় ও.সি-কে একটু বলে দাও না? কোনো একটা কেসে দিলে বুঝে আসবে কত ধানে কত চাল হয়। হ্যাঁ, কালকেই যেয়ো থানায় আমার চিঠি নিয়ে। বলবে রশীদ কমিউনিস্ট। তারপর ব্যবস্থা দারোগা সাহেবই করবেন।[৬৭]

রশীদ মিয়া চকদারের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, জনতাকে সচেতন করে তোলে—

রশীদ॥ প্রয়োজন হলে একা দাঁড়াবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সামনে তোমার প্রচুর খাদ্য, কেন দুর্বলের মত চাও না খেয়ে?

....

রশীদ॥ গাঁয়ের গরীবেরা ধান কিনতে পারে না। পঁচিশ ত্রিশ টাকা ধানের মণ, অথচ চকদারের গোলা ভর্তি ধান।

রমু॥ চকদার তো কয় ধান নাই।

রশীদ॥ আর পাকিস্তানের হাজার হাজার মণ ধান রাতের অন্ধকারে চলে যাচ্ছে তার সীমানা পেরিয়ে। কে দাঁড়াবে এর বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে? তুমি মরছ না খেয়ে, তোমার ভাইবোন মরছে, মরছে , আরও মরবে। এর প্রতিকারও যদি করতে হয়, করবে তুমিই।[৬৮]

রশীদের কথায় গ্রামের লোকেরা সচেতন হয়ে উঠেছে, চকদারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জনতার কাতারে বাউলও মিলিত হয়েছে :

জাগবে সায়েব, জাগবে। আপনের কথা শুইনা জাগবে সবাই। বুঝতে পারছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমার আল্লা-রসুলের আদেশ। এখন থ্যাইকা আগুনের সুরে বাজবে আমার একতারা—আগুন ধরবে মানুষের মনে, শক্তি জাগাবে ভাঙ্গা বুকে, শুকনা হাতে। সায়েব, রাইত যখন অইছে, ভোর অইতে কতক্ষণ।[৬৯]

---

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯
৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহপুষ্ট পুঁজিবাদী-বিত্তশালী-জমিদার-মহাজন ব্যবসায়ী শ্রেণী শোষণ করে নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে, চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বঞ্চিত করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, নাটিকায় অঙ্কিত চকদার চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। প্রতাপশালী চকদার ষাট বছর বয়সে এক তরুণীকে তৃতীয় স্ত্রী করে ঘরে এনেছে। তার মেঝ বৌ কটাক্ষ করে বলেছে—

> না রে ছোট মিল করিস না—করুক সাধাসাধি। ষাট বছরের বুড়ো গেল ক্যান তোরে বিয়া করতে।[৭০]

সংগ্রামী জনতার প্রতিনিধি রশীদ মিয়া গ্রামের লোকদের একত্রিত করেছে। তার সঙ্গে এসেছে প্রকিওরমেন্ট অফিসার ও পুলিশ। চকদার শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ জনতাকে কন্ট্রোল দরে ধান দিতে বাধ্য হয়। জাগ্রত জনতার সম্মিলিত কণ্ঠ—

> "চকদার! ধানের গোলা খুলে দাও" দাম দিয়ে নেব, অন্যায় করব না, করতেও দেব না।' সহ্য করেছি বহু অন্যায়, আর নয়।[৭১]

সংঘবদ্ধ জনসাধারণের সম্মিলিত কণ্ঠের তীব্র প্রতিবাদ 'আওয়াজ'। এ আওয়াজ—পাক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। জনগণ চকদারের বিরুদ্ধে যে আওয়াজ তুলেছে, সেই আওয়াজই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসাধারণের আওয়াজ হয়ে জঙ্গীশাহীর শাসন থেকে এদেশকে মুক্ত করেছে। শ্রমজীবী মানুষের দাবি প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর—আওয়াজ।

৩

স্বদেশ প্রেম ও জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই বাঙালি এক সময় পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এই স্বপ্ন বিভিন্ন সময়ে নানা রূপ-রীতিতে বিদ্রোহরূপে স্ফূরিত হয়েছে। ছাত্র আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, সাধারণ জনতার আন্দোলন---বিভিন্নভাবে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে বিভিন্ন নাটক। আসকার ইবনে শাইখের 'যাত্রী' নাটিকাটি শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। এ নাটিকায় লেখকের রাজনৈতিক মতামত ও দেশ সম্পর্কে সুতীব্র অনুভবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নায়ক এসরার একজন দেশপ্রেমিক, সাহসী, সৎ ও শ্রমিক নেতা। দারিদ্র্য, অনাহার আর রোগ-শোকে পীড়িত পরিবারের সদস্য। ঘরে

---

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

তার রুগ্ন মা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে, হতাশাগ্রস্ত স্ত্রী, ক্ষুধার্ত শিশু সন্তান—সবকিছু পিছনে ফেলে পরাধীন দেশের জ্বালা যন্ত্রণা ও ব্যর্থতার কথা ভেবে সমস্ত দেশবাসীর মুক্তির জন্য কারাবরণ করেছে। সেলে বসে স্ত্রীর চিঠি পড়ছে, তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে অসহায় পরিবারের দুঃখ ভরা নানা ছবি। ইন্সপেক্টর তাকে প্রলোভন দেখায়, এসব আন্দোলন ছেড়ে দিয়ে বন্ডটি সই করার জন্য পরামর্শ দেয়—

> আমিও আপনার মত রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। আমিও আপনার ভাই। ভাই হিসেবেই কয়েকটা কথা বললাম। পরিবার পালনের দায়িত্বই আপনার প্রধান ও প্রথম। মনে রাখবেন, চ্যারিটি বিগিনস্ এ্যাট হোম। আচ্ছা, এই বণ্ড আমি রেখে গেলাম। একটু পরেই আমি আসব আবার। বুড়ো মা, স্ত্রী, পুত্র, ওদের কথা ভেবে দেখুন, এদের মুখ চেয়ে যদি মনে করেন, আপনার বাড়ী যাওয়া উচিৎ, তখন সই করবেন।[৭২]

নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-বেদনা, তাদের অসহায়, চিত্তের বিক্ষুব্ধতা তাকে বিচলিত করে তোলে, চোখের সামনে শ্লোমোশন ছবির মতো ভেসে ওঠে—

> বাঁশী বাজছে—তাড়াহুড়া করে শ্রমিকেরা চলেছে কাজে—কল চলে, প্রচণ্ড শব্দ হয় কলের—দুর্বল শরীরে প্রাণপনে কলের হাতল ঘুরায় শ্রমিকদের কয়েকজন, অবসাদে শরীর ভেঙ্গে আসে—শ্রমিকদের দুঃখের সংসার, পেটভরে খেতে পায় না, ঔষধ পায় না রোগে—আবার মিলের বাঁশী বাজে—রুগ্ন শরীরে কাজে চলে শ্রমিকেরা মিল মালিক বসে পাইপ টানছেন, শ্রমিকদের দরখাস্ত আসে, সেটা পড়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি, দরখাস্তখানা ছিড়ে ফেলে দিয়ে আবার পাইপ টানেন—শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে—মালিক ফোন করেন—মিলের গেইটে বিক্ষোভ হয়—পুলিশ আসে—রাজপথে চলে শ্রমিকের মিছিল, তাদের দলীয় পতাকা ওড়ে বাতাসে, এসরারের কানে ভেসে আসে মিছিলের গান, এগিয়ে যাওয়ার গান। লক্ষ্যের পথে এ যাত্রা তাদের চলবেই।[৭৩]

মালিক পক্ষের প্রলোভন সত্ত্বেও সে অন্যায়ের সাথে আপোস করেনি, সে অপেক্ষা করছে নতুন দিনের আশায়। বন্ডের কাগজটি ছিঁড়ে ফেলে, সমস্ত দেশবাসীর হয়ে সে তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে—

> আলোকের আশায় মিছিল চলছে। লাঞ্ছিতের মিছিল, বঞ্চিতের মিছিল। পথ দুর্গম হলেও এরা থামবেনা। দুর্নিবার যাত্রী দল—আমিও এদেরই একজন।[৭৪]

তার সংলাপের মধ্য দিয়ে জনতার জাগ্রত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'যাত্রী' নাটিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে মানুষের অধিকার আদায়ের পথে এসরার ত্যাগী, বিপ্লবী আদর্শের প্রতীক। ভাষা আন্দোলনের পর এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। নাট্যকার সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা স্রোতের প্রেক্ষাপটে জনগণের সচেতনতাকে উপলব্ধি করেছেন।

---

৭২. আবিদ আজাদ ও মাহবুব হাসান সম্পাদিত, আসকার রচনাবলী (২য় খণ্ড) প্রকাশ ১৯৯২, যাত্রী, পৃ. ৩৭
৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৪

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর এদেশের প্রতিবাদী জনতা মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকে 'দুরন্ত ঢেউ' নাটিকায় আসকার ইবনে শাইখ সেই চিত্র তুলে ধরেছেন। এই নাটিকার নায়ক 'আলম সাহেব' একজন রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত। পাকিস্তান সরকারের তল্পিবাহক, কায়েমি স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। মুসলিম লীগের সেক্রেটারী খাঁ সাহেবের কন্যা সাবেরা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু খাঁ সাহেব শেষ পর্যন্ত এ বিয়েতে রাজি হননি—

> ছেলেটার মন মেজাজও হঠাৎ কেমন হয়ে গেল, কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশে—বুঝতেই পারেন, এরপর বিয়ে দেওয়া আর সম্ভব ছিল না।[৭৫]

খাঁ সাহেব ছাত্র রাজনীতির ঘোর বিরোধী। পঞ্চাশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল, এদের ডাকে বেশ কয়েকবার, কটি জেলায় আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। খাঁ সাহেবের দৃষ্টিতে এরা পাকিস্তানের শত্রু। নাট্যকার পাকিস্তানের তাবেদার খাঁ সাহেবের সংলাপের মধ্য দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরেছেন—

খাঁ সাহেব ॥ এ সমস্ত ছেলে ছোকরারা ভাবে, আমরা দেশের শত্রু। দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল কি করে হবে, কিভাবে চললে পাকিস্তান দুনিয়ায় পাবে মর্যাদা, তা যেন আমরা কিছুই বুঝি না।

এম.এল.এ ॥ বোঝে শুধু ওরাই। বুঝলেন এসব পাকামো। একটা কিছু বলতে হয়, তাই বলে। এর ফল, আর যাই হোক, ভাল হবে না। দেশের মধ্যেই যদি বিরোধ থাকে তাহলে উন্নতি সম্ভব নয়।

খাঁ সাহেব ॥ দেশের শত্রু ওরা। তা না হলে এখন চারদিকে কমিউনিস্ট–আন্দোলন, এর মধ্যে কোথায় সবাই একতাবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াবে, না ওরা রুখে দাঁড়াচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে।[৭৬]

স্ত্রীর অসুখে চেঞ্জে এসে কক্সবাজারে আকস্মিকভাবে আলমের সঙ্গে তার দেখা হয়। সেখানেও তিনি তাকে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন—

খাঁ সাহেব ॥ ...এখন এসব বাজে খেয়াল ছেড়ে দাও। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু করা তো ঠিক নয়।

আলম ॥ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে? (একটু হাসলেন)

খাঁ সাহেব ॥ না, এই আমরা নানা কথা শুনি কিনা! আর ওই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে লাগলে তোমার ক্ষতিও হতে পারে, তাই অবিশ্যি তোমার ভালোর জন্যই বলছি।[৭৭]

---

৭৫. দুরন্ত ঢেউ, আসকার ইবনে শাইখ রচনাবলী (২য় খণ্ড), পৃ. ৪২

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, বড় বড় ঢেউ উঠেছে সাগরে। সে ঝড়ে শুধু গাছপালা ও শক্ত উঁচু পাড় ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই ঝড়, দুরন্ত ঢেউ একদিন অন্যায়ের পাষাণবেদী ভেঙ্গে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করবে, দেশপ্রেমিক আলম সাহেব তার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন—

> ...ঢেউয়ের আঘাতে ধ্বসে পড়ছে শক্ত উঁচু পাড়, ভেঙ্গে পড়বে অন্যায়ের পাষাণ পাঁজা, দুরন্ত ঢেউ আজ সবখানে।[৭৮]

'দূরন্ত ঢেউ' নাটিকাটিতে কায়েমি স্বার্থবাদী, আত্ম-অহংবোধ সম্পন্ন এলিট শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনতা রুদ্র রোষে ফেটে পড়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সাধারণ মানুষের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের অবসান ঘটে। ফলে পাক শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনতা একে একে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলে। ছাত্র-জনতার এই বিরোধ আর প্রতিবাদের নাট্যরূপ 'দুরন্ত ঢেউ'।

৫

ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে রচিত শওকত ওসমানের রূপক নাটক 'বাগদাদের কবি'[৭৯] সমকালীন রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উচ্চকিত। নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত, প্রথম অঙ্কে দু'টি, দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি, চতুর্থ অঙ্কে দুটি এবং পঞ্চম অঙ্কে দুটি দৃশ্যের সংযোজন করা হয়েছে।

ইতিহাসখ্যাত বাদশাহ হারুনর রশীদের রাজত্বকালের একটি বিশেষ দিক, তাঁর ব্যক্তিক জীবন, প্রেম ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনী আবর্তিত হলেও নাটকে নাট্যকার তাঁর সমকালীন দেশকাল চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেননি।[৮০]

> ইসহাক॥ ...এই খাজনা কোথা থেকে আসে? গরীবের খুন নিংড়ে আনা হয় নাকি? তাঁদের দীর্ঘশ্বাসে, হারুনর রশীদ তোমার বাগানের সাইপ্রাস যতটুক চঞ্চল হয়, তোমার মনে তার অল্প আঁচড়ও লাগে না।... তোমার নেমকের দৌলতে, তোযামোদী করেছি আমার কাব্যের মারফত।... আজকাল রাস্তাঘাটে গরীবের লাশ।

---

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৭৯. চট্টগ্রাম থেকে কোহিনূর লাইব্রেরী ১৯৫২ সালে (শ্রাবণ ১৩৫৯) নাটকটি প্রকাশ করে। লেখার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, "...একবার ইসলামের ইতিহাস পড়ার সময় এই নাটকটি লেখার ইচ্ছা হয়। সেই অভিসন্ধি নিয়ে কয়েকজন ইংরেজ লেখকের সঙ্গে আত্মিক মোলাকাত ঘটে। স্যার উইলিয়াম বার্টনের আলেফ লায়লার অনুবাদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ড্রাইডেনের গ্রানাডা বিজয় ও আওরঙ্গজেব এবং স্বর্গীয় ইংরেজ কবি ফ্লেকারের 'সমরকন্দ অভিমুখে সোনালী সফর' নাটক ইত্যাদির মারফত। এই নাটকের আবহাওয়া রচনায় ইসলামের ঐতিহাসিক ছাড়া তারাও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নাটকের কাঠামো ফ্লেকারের কাঠামোর ভাবানুসরণ মাত্র। কাহিনীর ভিত্তি আলিফ লায়লা ও তুর্কি উপকথা।' শওকত ওসমান, বাগদাদের কবি, ভূমিকা ও শুদ্ধিপত্র অংশ দ্রষ্টব্য।

৮০. নীলিমা ইব্রাহীম, বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র-১৩৭৯, পৃ. ৪৪৫

Dhaka University Institutional Repository

একটা সচরাচর ঘটনা হামেশাই দেখা যাচ্ছে। কেউ জহর খেয়ে মরে, কেউ আত্মহত্যা করে। অধিকাংশ মরে ক্ষুধার তাড়নায়।[৮১]

নাট্যকার বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলনসহ এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করেছেন সচেতনভাবে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার তথা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নাট্যকারের মানসলোকে ছিল জাগ্রত। জনতাকে দেখতে চেয়েছেন শাসকের ভূমিকায়।[৮২] তাই রফির সংলাপে দেখা যায় —

রফি ॥ বাগ্দাদের ভিক্ষুক। সড়কে সড়কে আরো দশ হাজার রয়েছে আমার ইশারার অপেক্ষায়। আর কয়েক লহমা পরে তারা চম্‌কে দেবে খলিফার মহলের শাস্ত্রীদের ; সমস্ত বগ্দাদ নাস্তানাবুদ করবে, খুন করবে খলিফাকে... ।[৮৩]

দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগ নেতারা তাদের ধর্মীয় রাজনীতি শুরু করে। ধর্মের অজুহাতে ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। শোষণের যাতাকলে এদেশের জনসাধারণকে পেষণ করে তারা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে চেয়েছে। রফির সংলাপে নাট্যকার সমকালীন বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরেছেন—

রফি ॥ ...মুলুক ধ্বংস হোয়ে যাচ্ছে, ইলেমের আঞ্জাম নেই, ধুঁকে ধুঁকে তিলে তিলে মরছে দেহাতী মানুষ—শহরের গলিতে ভিক্ষুক—এদিকে ইসলামের গৌরব ফলাচ্ছেন যত দাগাবাজ শয়তান খিঞ্জিরের দল। হারুনর রশীদকে আজ ইসলামের 'সবক' দিয়ে আসতে হবে কিরীচে সঙ্গীনে। লজ্জা করে না—মুসলমান ভাই ভাই তবে শাহ সুলতান শাহজাদা—হারামজাদাদের এত রোয়াব কেন? কোন ইসলামী জৌলযে? তাদের শাদী মোবারকে এত নজরানার ভড়ং কেন? ইসলাম... ।[৮৪]

ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে এদেশের জনসাধারণ একটা শোষণহীন, সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল। স্বৈরাচারী শাসকবর্গ ধর্মের ছত্রছায়ায় বসে তাদের হীন স্বার্থোদ্ধারের জন্য এদেশের শ্রমজীবী, নির্যাতিত মানুষের সেই স্বপ্নকে বারবার ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। কবি ইসহাক হাসানের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে—

ইসহাক ॥ ...মেহনত করে যারা খায়, তাদেরই সঙ্গে ডেরা বেঁধে নেব, তাদেরই প্রশংসায় রচনা করব কাসিদা, গজল—আর দরবারে নয়। যাব, সমরকন্দের পাহাড়ী কোনো গাঁয়ে। মেহনতী মানুষেরাই আমার নতুন বন্ধু হবে—

---

৮১. বাগদাদের কবি, পূর্বোক্ত পৃ. ২৫-২৬
৮২. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭
৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণের দৌলত যাদের বে-সুমার।...চলো...জালেমদের মুল্লুক নাস্তানাবুদ হবে—যারা জালেমদের নাস্তানাবুদ করে মানুষের মুল্লুক গড়তে পারে, তাদেরই ডেরা—আমাদের ডেরা—চলো, দোস্ত...।[৮৫]

'বাগদাদের কবি' নাটকের রূপকীয় আবরণে নাট্যকার তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছেন। কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ ও সংলাপ রচনার দক্ষতায় নাটকটি সার্থকতার দাবীদার।

৬

সমাজ জীবনের সর্বত্র যে বৈষম্য, হীনমন্যতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় চলছে তারই নাট্যরূপ ওবায়েদ-উল-হকের 'এই পার্কে'। তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। পেশা-সূত্রে সমাজ-জীবন ও তার বিভিন্ন স্তরকে তিনি গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিলেন। সমাজ জীবনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ফসল 'এই পার্কে'।

এ নাটকে কাহিনীর ধারাবাহিকতা নেই, সামাজিক সমস্যার কিছু কিছু খণ্ড চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তিন অঙ্কবিশিষ্ট এ নাটকে নাট্যকার শিক্ষিত (বি.এ.পাস) বেকার যুবক আলিমের হতাশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে নবতর কর্মপথে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রগুলোর সংযোগ স্থল একটি পার্ক—এই পার্কেই একে একে আলিম, বোরহান, উকিল, মক্কেল, পকেটমার, কবি, ক্যানভাসার, বাদশাহ, পুলিশ অফিসার সবার সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জনৈক বাঙালির কুকুর প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় সংলাপ আওড়ানো বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের নামান্তর।

উকিল সেও একজন হতভাগ্য মানুষ, স্বল্প আয়ে তার জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করেন। নাট্যকার তার লেখনীর মধ্য দিয়ে উকিলের সংসারের চিত্র তুলে ধরেছেন—

উকিল॥ বাড়ী মানে একখানা ছোট ঘর। রাজধানীতে বাড়ী পেয়েছি এই ভাগ্যি। ছেলেটা বসবার কামরায় পড়ছে। তা'ছাড়া বাড়ীর প্রবেশ দ্বারের পাশেই মলদ্বার। এই সক্কাল বেলায় বলদবাহিত মলবাহী গাড়ীখানা আমার বাড়ীর সামনেই এসে দাঁড়ায়। সমস্ত পাড়ার মল বোঝাই করে, কুকুর আর কাকেদের কোলাহল জাগিয়ে তবে সেটা নড়বে। ইতিমধ্যে দু'চারজন মক্কেল যদি বা আসে ওই মলযান দেখে আর সামনে এগোয় না। তাই সকালে ঘন্টা খানেক এই পার্কে বসেই মক্কেল বিদেয় করি। আর কিছুটা পাবলিসিটিও হয় এতে। এখানে না এলে আপনার সাথে তো পরিচয় হোত না। আপনার বন্ধু-বান্ধবদের কোন মামলা-টামলা থাকলে আমাকে অবশ্যি স্মরণ করবেন আশা করি। রোজ সকালের দিকে এখানেই পাবেন আমাকে।[৮৬]

---

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

৮৬. ওবায়েদ-উল-হক, এই পার্কে, ১৯৫৩ সালে গুলনাহার হক কর্তৃক ফেনী (নোয়াখালী) থেকে প্রকাশিত হয়, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

উকিল নিজে টানাটানি করে সংসার চালালেও বি.এ. পাস বেকার যুবক আলিমকে আইন পড়ার পরামর্শ দিয়েছে—

> তবে আইনটা পড়ে ফেলুন। ভালো পাস করলে হাকিম হবেন। না হলে বার-এ বারবার যাতায়াতেও কোন রকমে চলে যাবে। এদিকেও unlimited possibility রয়েছে। মিনিস্টার মিনিস্টার তো আমাদের lawyer দেরই প্রায় একচেটে কারবার।[৮৭]

অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত সমাজব্যবস্থায় জীবিকার সন্ধানে সবাই হন্যে হয়ে ঘুরছে। কবি, ক্যানভাসার, পকেটমার সবাই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতো অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বেঁচে থাকার এই কঠিন সংগ্রাম তাদের নানাভাবে নানাদিকে পরিচালিত করেছে। বেকার যুবক আলিম জীবিকার সন্ধানে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই গেছে—কাজ করতে চেয়েছে। কিন্তু সব স্তর থেকেই সে লাঞ্ছনা আর উপদেশের বোঝা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। পুলিশ অফিসার বেকার যুবক আলিমকে কটাক্ষ করে বলেছে—

> পুঃ অফিসার। অতদূর লেখাপড়া করে আপনি কোন চাকুরি পান না এটা বিশ্বাস করা কঠিন।
>
> আলিম। আপনার বিশ্বাসের জোর কম। নতুবা সরকারী স্বীকৃতি মতেই তো এদেশে বেকার সংখ্যা লক্ষাধিক। Employment exchange-এ খোঁজ নিয়ে দেখবেন আমার মতো অপরাধী আরও লাখ লাখ রয়েছে।
>
> পুঃ অফিসার। আপনি নিশ্চয়ই ঠিক মতো চেষ্টা করেন নি।
>
> আলিম। অনেক করেছি। কোনটার জন্যে Overqualified কোনটার জন্যে Under qualified, Duly qualified হই যেখানে সেখানে no Vacancy। এক স্কুলে যদিও বা একটা ভ্যাকান্সী পূরণ করার সুযোগ পেলাম তাও মাসের শেষে বেতনের জন্য হাত পাততে হেডমাস্টার বল্লেন,
>
> বিদ্যাধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে
> যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।[৮৮]

এই পার্কে আরও একজন হতভাগ্য কেরানীও এসে জুটেছে, চাকুরি নেই, স্ত্রীর হার্টের অসুখ, ঠিকমত খেতে পায় না—কোনোমতে দিন চলে। কোনো সম্মানজনক পেশা জোগাড় করতে না পেরে আলিম শেষ পর্যন্ত রিকসা চালাতে শুরু করে, সেখানেও বিড়ম্বনার শেষ নেই। নিম্নবিত্ত পরিবারের এক তরুণী যাত্রীকে নিয়ে সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে—

---

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

তরুণী। আমার বাবা নেই, ভাই নেই। গোটা সংসারের ভার আমার ওপর। সামান্য যা সঞ্চয় ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা না করলে গোটা পরিবার অচল। সত্যি বলতে কি, মার অসুদ পথ্যি, বোনদের খাওয়া পরা, কোনটিই হয়ত এরপর চলবে না।[৮৯]

নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের করুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করে নাট্যকার ব্যথিত হলেও তাদের সমস্যার কোনো সমাধান তিনি দিতে পারেননি। বেকার যুবক আলিম মাতৃহীন কেরানীর শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়েছে। সে তার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা মুছে দিয়ে বিত্তহীন জনগণের চেতনাকে জাগিয়ে তুলবে—

> ...এমন করে বাঁচাবো যেন কোন একদিন এই দুনিয়ার বিত্তহীন জনগণের সুপ্ত চিত্তকে সে জাগিয়ে তুলতে পারে, তারই মতো লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মা-বাপের বুক থেকে খসে পড়া, ছিঁড়ে পড়া অনাবৃত, অনাহত অনাথ শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।[৯০]

তথাকথিত জনকল্যাণ সমিতিগুলো সম্পর্কে নাট্যকার অনীহা প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি জনকল্যাণ সমিতির স্বার্থলোলুপ দৃষ্টিভঙ্গি, সমিতির অসারতা প্রত্যক্ষ করেছেন। বাদশাহ ও আলিমের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেটি তুলে ধরেছেন—

বাদশাহ। চল আমরা বেকার সমিতি গঠন করে আমাদের দাবী-আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন চালাই।

আলিম। কোনো লাভ হবে না তাতে। সমিতির প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারী জেনারেল তোমাদের কাঁধে চেপে মাথা তুলে দাঁড়াবে, হাওয়াই জাহাজে চড়ে খুব সুরত Air hostess দের হাতে চকলেট-লজেন্স চুষে লন্ডন-আমেরিকা ঘুরে বেড়াবে। আর তোমরা তাঁদের গলায় মালা ঝুলাবে, পায়ে হাত বুলাবে, গল্লা ফাটিয়ে জিন্দাবাদ চিল্লাবে। তোমাদের বেকারত্বের অবসানে তাদের নেতৃত্বের আয়ু শেষ। সুতরাং তোমরা যেই বেকার সেই বেকারই থাকবে।[৯১]

নাটকে কাহিনীর ধারাবাহিকতা না থাকলেও চরিত্র সমূহের তীক্ষ্ণ, সরস সংলাপ চরিত্রগুলোকে বাঙ্ময় করে তুলেছে।

'এই পার্কে' ট্রাজিক গুণে গুণান্বিত। সার্থক ট্রাজেডির নায়কের অনেক গুণই আলিম চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে 'এই পার্কে' ওবায়েদ-উল-হকের একটি মঞ্চসফল সার্থক সৃষ্টি।[৯২]

---

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১-৭২

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৯২. নীলিমা ইব্রাহীম, বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, পৃ. ৪৭১

৭

ফররুখ শিয়র একজন সমাজ সচেতন নাট্যকার। 'ব্ল্যাক মার্কেট'[৯৩] নাটকের মধ্য দিয়ে তার সেই সমাজ সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারী, মজুতদারির বিস্তীর্ণ কর্মকাণ্ড এই নাটকের পটভূমি। ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন—

> ১৯৪৩ সাল। বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ এসে লেগেছে অবিভক্ত বাংলার গ্রামে মাঠে প্রান্তরে। খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য দ্রব্য গিয়ে ওঠে চোরাকারবারীর আর মজুদদারের গুদামে। শুরু হয় অনাহারে মৃত্যু। সে এক বীভৎস মৃত্যু। পথে ঘাটে জীবন্ত কঙ্কালসার ক্ষুধাতুর মানুষের মিছিল। সেদিনের সেই কাহিনী আজ ইতিহাস।[৯৪]

ব্ল্যাক মার্কেটের পাশাপাশি নাট্যকার দেশবিভাগ পরবর্তী মোহাজের সমস্যা, নিরীহ প্রজার উপর সমকালীন জমিদারের অত্যাচারের চিত্র বিশ্বস্ততার সাথে অঙ্কন করেছেন। নাটকে অঙ্কিত চরিত্রসমূহ সমসাময়িক সামাজিক ব্যক্তিত্বের সার্থক প্রতিভূ। জমিদার আলী আহসান (সামন্ত প্রভুদের সার্থক প্রতিভূ) কমর উদ্দীন দীঘলকালির প্রেসিডেন্ট (অত্যাচারী ব্যক্তি) নরহরি শর্মা (সুদখোর মহাজন) ভূতমলজী (মাড়োয়ারী, ব্যবসায়ী) গোকুল (আলী আহসানের নায়েব) নিদান বক্স (ফতোয়াবাজ গ্রাম্য মৌলভী) ও সেহাবউদ্দীন (দেশপ্রেমিক কর্মী)।

গ্রামের লোকদের পেটে খাবার নেই, পরনে বস্ত্র নেই অথচ দুর্ভিক্ষের বাজারে জমিদার আলী আহসান, প্রেসিডেন্ট কমরউদ্দীন, ব্যবসায়ী ভূতমলজী এরা টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে। খাজনার জন্য নিরীহ প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে হৃদয়বান, দেশপ্রেমিক যুবক সেহাবুদ্দিন, ষড়যন্ত্র করে দুর্নীতিবাজ পুলিশ ইন্সপেক্টরের সহযোগিতায় তাকে জেলে পাঠিয়েছে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সেহাবুদ্দিন আবার দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। জমিদার কন্যা হাসিনাও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সেও দেশ সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছে। জমিদার আলী আহসানের নায়েব গোকুল সেহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে নিরীহ প্রজাদের লেলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে—

> গোকুল। … ঐ সেহাবুদ্দিনকে যদি সড়কির ঘায়ে সাবাড় করতে পারো, তবে খাজনা দিতে হবে না। যদি আর কিছু চাও তো তাও পাবে।
>
> পরাণ। আমি গরীব হতে পারি বাবু, কিন্তু লেভী নই। আলী হাসান সাহেব আমাগোরে জমিদার আর তুমি তার নায়েব ! কিন্তু ঐ সেহাবুদ্দিন আমাগোরে কেউ না। আমাগোরে উপুর দিয়া কত দুক্কু কত কষ্ট বয়া গ্যালো,

---

৯৩. ফররুখ শিয়র, ব্ল্যাক মার্কেট, প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৩

৯৪. ভূমিকা, ব্ল্যাক মার্কেট

Dhaka University Institutional Repository

তহন তো তোমরা কেউ আইসো নাই। এইতো গ্যালো বারের বাইস্যার পানিতে ঘর দুয়ার ভাইস্যা গ্যালো সেদিন ঐ সেহাবুদ্দিন ছাড়া, তোমাগোরে তো কাউকে চোকে পৈরলো না। সেহাবুদ্দিন কিছু না করতি পারুক চৈকের পানি তো মুছায়া দিচ্ছে। তার বিরুদ্ধে লাঠি আমি ধরতি পারমু না বাবু।[৯৫]

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকারের ধামাধরা সুবিধাভোগী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জঘন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। বিত্তহীন গরিব মানুষেরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছে--

কালু। ...ক্ষিধেয় যখন পেট হু হু করে জ্বলে ওঠে তখন খোদার নামও মনে আসে না, ভগবানের নামও মনে আসে না। ছিয়াত্তরের আকালের কথা শুনেছ? গাছে পাতা পর্যন্ত ছিল না। মানুষের গোস্ত মানুষ খেয়েছে। তেমনি বোধহয় তার চেয়েও বড় আকাল আসছে।[৯৬]

তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশ থেকে হিন্দু প্রজাদের বিতাড়িত করতে চেয়েছে—

ধর্ম। ...মোল্বী সাব নাকি কইচে পাকিস্তান দয়া দারুল ইস্ নাকি হইচে তাই এহানে হিন্দুগোরে থাহা চৈলবো না।

যতীন। ...এসব হৈলো শর্মা ঠাহুর টুইনক্যা মুক্তার, ইরানে মৌলবী আর কমরউদ্দিনের কাম। গুজব রটায়া দ্যাশ থ্যাইকা তাড়ায়া দিতে চায়।[৯৭]

দুর্ভিক্ষের সুযোগে সুদখোর মহাজনরা জমি, গহনা, গৃহের তৈজসপত্র বন্ধক রেখে চড়া সুদের কারবার শুরু করেছে—

নরহরি। বন্ধকী কারবার কিছু কিছু রেখেছি। তোমাদের মত গরীবের দুঃখ দেখলে প্রাণে মায়া হয়।[৯৮]

জমিদার আহসান আলী পুলিশ ইন্সপেক্টরের সহায়তায় সেহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে, গ্রামাঞ্চলের চাষীদের সে বাস্তুত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। ষড়যন্ত্র করে নিজের গুদামে আগুন লাগিয়ে সেহাবকে আসামি সাজিয়েছে—

আলী। ...আজকেই পুলিশে ডাইরী করেছি—সেহাব জোর করে বাস্তুত্যাগ করাচ্ছে। এরপর পুলিশকে বোঝাতে কষ্ট হবে না। সেইজন্যে সে ক্যাম্পটি পুড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ইন্সপেক্টর আমার হাতের মুঠোয়।[৯৯]

তরুকে অত্যাচার করার অপরাধে হাসিনা তার পিতা আলী আহসানকে খুন করেছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর সেহাবকে হাজতে নিয়ে যেতে এসেছে। সে গুদাম ঘরে আগুন ও আলী আহসানকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। হাজতে যাওয়ার আগে সে দেরাজের উপর সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করে অজানার পথে বাড়িয়েছে—

---

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

...তোমরা অনেক সহ্য করেছো—তোমাদের চোখে নতুন দিনের আলো এসেছে। আজকের এই পঙ্কিল ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরে পাল্টে ফেলে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে—সেখানে ধনী দরিদ্রের উপর অত্যাচার করার সুযোগ পাবে না। উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ; মানবতাই হবে মানুষের কাম্য।[১০০]

দুর্ভিক্ষের সময় পেটের তাগিদে যুবতী-কন্যা, স্ত্রীকে ভোগ লালসা চরিতার্থ করার জন্য অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে অসহায় পিতা-স্বামী। এভাবে বহু নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

দেশ বিভাগের পর সমাজ ব্যবস্থায় অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি যেমন বেড়েছে তেমনি এর বিরুদ্ধে জনগণও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 'ব্ল্যাক মার্কেট' নাটকের চরিত্রসমূহ বাস্তবানুগ, সংলাপ প্রাঞ্জল ও চরিত্রানুগ। আঞ্চলিক ভাষার সফল ব্যবহারে নাটকটি সুখপাঠ্য হয়েছে। কাহিনী-নির্মাণে, বৃত্তগঠনে, সফল চরিত্রায়নে, সংলাপের সরসতায় ব্ল্যাক মার্কেট একটি মঞ্চসফল রসোত্তীর্ণ সমাজ সচেতন নাটক।[১০১]

৮

আসকার ইবনে শাইখের 'প্রতীক্ষা' নাটিকাটি গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত। চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ চরম দুরাবস্থার শিকার হয়েছে। দরিদ্র স্কুল শিক্ষক হাসান মাস্টার শিক্ষকতা করে কোনো রকমে সংসার চালায়। গ্রামে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় যে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে তাকে প্রায়ই অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়। অন্যদিকে সুযোগ সন্ধানী দুর্নীতিপরায়ণ গ্রামের প্রেসিডেন্ট তার গুদামে চাউল সংরক্ষণ করে অন্যত্র পাচার করে। হাসান মাস্টারের অসহায় অবস্থার সুযোগে সে হাসান মাস্টারের কাছে এসেছে তার স্বার্থ চরিতার্থ করার কু-মতলব নিয়ে—

প্রেসিডেন্ট : সবারই এই অবস্থা ভাই। আর এ সময় একটু বুদ্ধি করে না চললে আর রক্ষা নেই। হ্যাঁ, আপনারও চালের খুব টানাটানি নাকি ?

হাসান : নইলে আর জীবনটাকে নিয়ে টানাটানি করছি কেন ? চল্লিশ টাকা মণের চালের দিনে প্রাইমারী স্কুলের গরীব মাষ্টারের বাঁচার অধিকার আছে কি না, তাই আজ সন্দেহ জাগছে প্রেসিডেন্ট সায়েব।[১০২]

....

হাসান : কি করতে হবে আমার প্রেসিডেন্ট সায়েব ?

---

১০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০-১১১
১০১. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ১৭১
১০২. আবিদ আজাদ ও মাহবুব হাসান সম্পাদিত—আসকার রচনাবলী (২য় খণ্ড), প্রতীক্ষা, প্রকাশকাল ১৯৫৪, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট : আমার ধানের গোলা ওরা থানাতল্লাশী করবে। তাই ভাবছিলাম, যদি কিছু ধান আপনার কাছে রেখে যাই—আপনাকে কেউ সন্দেহ করবে না। আর করলেও বলতে পারবেন—এগুলি আপনার। আর কেউ কেউ এমনি সাহায্য করলে আমার ধানটা মানে সমস্ত গাঁয়ের জন্যই থেকে যায়। আর ব্যাপারও দুই তিন দিনের। থানাতল্লাশীটা হয়ে গেলেই আমি আবার নিয়ে যেতে পারব। অবিশ্যি আপনার খাওয়ার জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না। আমার থাকলে আপনারও থাকবে। আপনাদের এই খাদেম যদি খায়, জেনে রাখবেন, মঞ্জু আর মাকে নিয়ে আপনিও অভুক্ত থাকবেন না।[১০৩]

এই চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও হাসান মাস্টার তার কু-প্রস্তাবে রাজি হয়নি। তার স্ত্রী রহিমাও তাকে সমর্থন করেছে—

...আমরা ওর প্রস্তাবে রাজী নই, এই উত্তরই ওকে দাও গে।[১০৪]

অকস্মাৎ দেশপ্রেমিক বন্ধু মরহুম আনসার উদ্দিন মিয়ার পুত্র উমরের আবির্ভাব ঘটেছে। তাকে অবলম্বন করে গরিব মাস্টার সুখের স্বপ্ন দেখেছে, সমাজ থেকে এই অন্যায়, অবিচারের অবসানের জন্য সে প্রতীক্ষা করেছে—

হাসান : ...তবু উমর এসেছে। পারবে না বাবা, বড় হয়ে অন্যায়ের প্রতিকার করতে? দুঃখীর ঘরে গিয়ে পারবেনা তাদের দুঃখ ঘুচাতে? পারবে। আমার কথাই সত্য হলো রহিমা। উমর এসেছে। না এসে কি পারে? রাত যখন হয়েছে, প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি কি ঘরে ঘরে পৌছুবে না? হ্যাঁ, আমি আসছি।[১০৫]

প্রতীক্ষা নাটিকার মধ্য দিয়ে নাট্যকার দুর্দিনের অবসানে সুখের স্বপ্ন দেখেছেন। এদেশবাসীর জীবন থেকে একদিন দুর্যোগের অন্ধকার কেটে যাবে, তারা আলোর মুখ দেখবে সেই প্রতীক্ষা নিয়েই নাট্যকার লিখেছেন—'প্রতীক্ষা'।

৯

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিতুমীরের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আত্ম-চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, সেই বীর শহীদদের কর্মধারা ও সংগ্রামী চেতনার নাট্যরূপ 'তিতুমীর'। মোসলেম উদ্দিনের তিতুমীর নাটকটি ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে রচিত হলেও এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনের সেই ভয়াবহ অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নাট্যকারের ভাষ্য—

---

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

> তিতুমীরের জীবন কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত নয়, কারণ সাম্রাজ্যবাদীর কঠোর অনুশাসনে তাঁর সত্যিকারের দেশাত্মবোধ জনসমাজে প্রকাশ করাও ভয়ানক অপরাধ ছিল, তাই তাঁকে বিদেশীর ইতিহাসের পাতায় ও দেশী মোসাহেবদের লেখায় স্বেচ্ছাচারী দুঃশ্চরিত্র ও লম্পটরূপেই দেশবাসীরা পূর্ব্বে পেয়েছে। আজ স্বাধীনতার প্রথম সোপানে দাঁড়িয়ে, সেই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক শহীদ বীরের মহান আত্মার প্রতি দেশবাসীরা যদি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়, তবেই তিতুমীরের জীবন-কাহিনীকে নাট্যরূপ দেবার উদ্দেশ্য ও শ্রম সার্থক হবে।[১০৬]

তিন অঙ্কবিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাটক 'তিতুমীর'। ব্রিটিশ শাসনামলে সৃষ্ট জমিদারি প্রথা এদেশের নিরীহ প্রজা সাধারণের জীবনে চরম দুর্দশা বয়ে আনে। প্রজারা জমিদারের খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে জমিদারের অত্যাচার চরমে পৌঁছাতো, এমনকি কুলনারীদের উপর অত্যাচার করতেও দ্বিধাবোধ করতো না—

> মাসুম। ...কিন্তু সমাজের শত সহস্র কুলনারীকে জমিদারের কামাগ্নি থেকে রক্ষা করবার পথ কোথায়? দুর্নীতি ও দুরভিসন্ধিতে মানুষের আত্মা আজ কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে। মানুষের এই অবনতি জমিদারের উৎপীড়নে নয়, প্রচ্ছন্নভাবে যারা এর ইন্ধন যোগাচ্ছে, তারা এই নেমোখারাম বণিকের দল। তাদের মূলোচ্ছেদের প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, নইলে ধর্ম্ম টিকবে না, সংসারে সমাজে শান্তি ফিরবে না।[১০৭]

ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারে সাহায্য সহযোগিতা করেছে এদেশের উচ্চবিত্ত জমিদার শ্রেণী, যারা ইংরেজ সরকারের দেয়া বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসী নির্ভিক যোদ্ধা তিতুমীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন, দেশবাসী তাঁর এই সংগ্রামে সাড়া দিয়েছে—

> তিতুমীর। ...ফিরিঙ্গি শাসনের প্রারম্ভে যে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে, আর যাতে আমাদের জমিদার ও রাজন্যবর্গ ইন্ধন যোগাচ্ছে, সত্বর তার নির্ব্বাণের প্রয়োজন, নতুবা দাবানলের রূপ ধরে সোনার বাঙলাকে ভস্মীভূত করে ফেলবে। তখন শত চেষ্টা করেও সে আগুন নিভবে না। তোমাদের সকলের কাছে আমার মিনতি, পলাশীর প্রান্তরে যে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছে, এসো ভাই সব—আমাদের মিলিত প্রচেষ্টায় ফিরিয়ে নিয়ে আসি আমাদের সেই জাতীয় গৌরব।[১০৮]

তিতুমীরের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের মানুষ ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে ইংরেজ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। তার এই স্বাধীনতার সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান সবাই একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে—

---

১০৬. মোসলেম উদ্দিন, তিতুমীর, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১, দ্রষ্টব্য, কয়েকটি কথা
১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

তিতুমীর। ...আপনি হিন্দু আর আমি মুসলমান কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য, আপনি বাঙালি আমিও বাঙালি, আমরা দুই ভাই, একই জন্মভূমির সন্তান হিন্দু-মুসলমান। আসুন আমরা উভয়ে শক্তি দিয়ে, সামর্থ দিয়ে, প্রয়োজনে জীবন দিয়েও এ অপমৃত্যুর করাল গ্রাস হতে বাংলাকে রক্ষা করি। বাংলার প্রতিটি নিঃস্ব কুটিরে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উত্তোলন করি।[১০৯]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরের মতো সংগ্রাম করে তিতুমীর শহীদ হয়েছেন, তার সংগ্রামী প্রেরণা বাঙালিদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত করে এদেশকে স্বাধীন করেছিল। তিতুমীর সংগ্রামের প্রতীক, জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, এই সমস্ত বীর শহীদরা যুগে যুগে বাঙালির সুপ্ত চেতনাকে জাগত করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে একের পর এক সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছে। এদেশের তরুণ কর্মবীরদের সংগ্রামী চেতনাকে জাগ্রত করার প্রয়াসে নাট্যকার তিতুমীরের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে তিতুমীর সার্থক, চরিত্র চিত্রণ ও সংলাপ রচনায় নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

১০

'পোড়োবাড়ী' আলি মনসুরের প্রথম নাটক।[১১০] এটি তিন অঙ্কে বিভক্ত একটি সামাজিক নাটক। প্রথম অঙ্কে চারটি, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি এবং তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য বর্তমান। নাটকটি প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকায় বলা হয়েছে—

> Porobari a highly interesting Drama...the author of the drama has quite skilfully depicted a picture of misunderstanding between husband and his wife.[১১১]

শাহীপুরের জমিদার রত্নেশ্বর চৌধুরী প্রায় পনর বছর পূর্বে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এক অন্ধকার রাত্রে স্ত্রী, পুত্র-কন্যাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। অন্যদিকে তার স্ত্রী সুরমা পুত্র-কন্যাকে নিয়ে রতনপুর গ্রামে আশ্রয় নেয়। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। রহিম নামের একজন সহৃদয় মুসলমান ব্যক্তি তাদের দুর্দিনে সাহায্য সহযোগিতা করেন। প্রতিবেশী রহিম ও প্রভাতীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্বামী স্ত্রীর মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে।

---

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

১১০. আলি মনসুর, পোড়োবাড়ী, ঢাকা থেকে শেখ মনিরুদ্দিন এণ্ড কোং ১৯৫৫ সালে নাটকটি প্রথম প্রকাশ করে। কলকাতার রঙমহলে ১৯৪৩ সালে প্রথম নাটকটি অভিনীত হয়। ঢাকার ব্রিটেনিয়া হলে ১৯৫৩ সালে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়।

১১১. দ্র. মতামত পোড়োবাড়ী

Dhaka University Institutional Repository

পোড়োবাড়ী নাটকের কাহিনীর অন্তরালে জমিদার নায়েব হরেন্দ্রের নিরীহ প্রজাদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সে খাজনা আদায়ের জন্য দরিদ্র প্রজাদের দৈহিক নির্যাতন করেছে, খাজনা পরিশোধের নামে বিপিনের কন্যা অপ্সরীর দেহ ভোগ করেছে, গ্রামবাসীদের ঘর-বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে—

তিনু বৌ। ...এই দেখনা সব পুইড়েই ছাই ছাই হয়ে গেছে, তোর ছিপটা আমি বেঁইচেছি। আর দাঁড়াসনি—ওরে জলদি--জলদি চল—চল্ পেইলে যাই—দেরী করিসনে। ঘর জেইলেছে এরপর পেরানে মেরে ফেলবে, ইজ্জত নেবে। ওরে—ইজ্জত নেবে।[১১২]

পোড়োবাড়ী নাটকে নাট্যকার সামাজিক গোঁড়ামি, ধর্মীয় বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেননি। সমাজের বিচারে অমর বাবুকে একঘরে করা হয়েছে—

অরুণ। ...সমাজের এক কুসংস্কারের চাপে পড়ে তাদের আজ এ অবস্থা। গ্রামের এই নোংরা সমাজ ওদের করেছে একঘরে। কিন্তু কি তাদের দোষ? এত বড়ো এক গুণী লোককে যারা আজ জোর করে মারছে—তাদের কি বিচার হবে না মা? তারা একঘরে, তারা সমাজচ্যুত বলে—একটি ডাক্তার পর্যন্ত আসতে পারেনি অসীমের শাসানিতে।[১১৩]

গ্রামের যুবকেরা 'মানব সেবা সমিতি' নামে এক সমিতি গড়ে তুলেছে, অসীম এই সমিতির সেক্রেটারী। মানব সেবার নামে এই সমিতির সদস্যরা অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, সামাজিক বৈষম্য ও কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়েছে। নাট্যকারের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে তারা অব্যাহতি পায়নি—

অসীম। তোমরা বোধহয় একথাও জান যে অরুণের নিজের পরিচয়ও নেই। ঐ মুসলমানটার মাথার উপর বসে বসে খায়। সুতরাং আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। তার জন্মের উপর মিথ্যে কলঙ্ক চাপিয়ে দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা সহজই হবে।[১১৪]

হৃদয়বান রহিম, আদর্শবাদী যুবক অরুণ নতুন চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক। অরুণের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—

অরুণ।। ...ওরা ধর্ম্মের নামে করে ভণ্ডামি।...রহিম কাকা, আপদে বিপদে আমাদের এখানে ছুটে এসেছে। গ্রামের জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাঁর কাছ থেকে পায় উপকার... মাটির পুতুল ভেঙ্গে ফেলে জীবন্ত এই দেবতাগুলোকে যদি পূজা করতাম তো অনেক পেতাম মা—আর এই জঘন্য মানুষগুলো তাঁর উদারতায় পর্যন্ত উপহাস করে উড়িয়ে দিতে চায়।[১১৫]

---

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কারমুক্ত উদার যুবক অরুণের কাছে ধর্মের ব্যাখ্যা ভিন্ন। সে ধর্মকে ব্যাখ্যা করে উদারতা আর মুক্ত-বুদ্ধির আলোকে—

অরুণ। স্বেচ্ছাচারিতা আর ধর্ম এক জিনিস নয় মা? এই যদি ধর্ম হয়—আমাদের তাতে দরকার নেই। আর সে যে কোন ধর্মই হোক না কেন। ইসলামই হোক, হিন্দুই হোক আর খ্রিস্টানই হোক—তাতে আমার কিছুমাত্র আসে যায় না—আমি সে ধর্মকে ঘৃণা করি।[১১৬]

পোড়োবাড়ী মঞ্চসফল নাটক, সমকালীন সময়ে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি জেলায় মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি প্রসঙ্গে করাচী ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক ও ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ভূতপূর্ব শিল্পী ও পরিচালক মুজিবর রহমান লিখেছেন—

> সার্থক চরিত্র সৃষ্টি, উচ্চাঙ্গের রস নিবেদন এবং সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণে নাট্যকারের দক্ষতা আছে এ কথা নিঃসংকোচেই বলা যেতে পারে। রত্নেশ্বর, রহিম ও তিনু এই তিনটি চরিত্র পাঠক ও দর্শকের মনে সহজেই রেখাপাত করে।[১১৭]

১১

ইব্রাহিম খাঁর সামাজিক একাঙ্কিকা 'ঋণ পরিশোধ' ছটি দৃশ্যে বিধৃত। সমসাময়িক গ্রামীণ মুসলিম সমাজকে কেন্দ্র করে নাটিকার কাহিনী বিন্যাস। মিথ্যা আভিজাত্যের অহমিকাবোধে অন্ধ সাব-ডেপুটি ফয়জুর রহমান তার সমস্ত অতীত, গ্রামের জনসাধারণ এমনকি এক সময়ের সহপাঠী শিক্ষক মনীর মিঞাকে পর্যন্ত অপমান করেছে। সরকারি ক্ষমতার দাপটে অন্ধ ফয়জুর রহমান গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত মনীর মিঞাকে কটাক্ষ করে বলেছে—

ডিঃ সা – এই ধর তোমারই কথা। এক সময় তোমার সাথে এক শ্রেণীতে পড়েছিলাম ; নইলে তোমার চেয়ে বড় বড়টা পঞ্চাশ হাত দূর হতে ছালাম দিয়ে জড়সড় হয়ে ভেগে যায়।

মনীর – আমিও তাই কতরাম ভাই। কিন্তু কেমন করে যেন দুনিয়ায় তোমার দু'বছর আগে এসে পড়েছিলাম কি–না। আর তাছাড়া রক্তের একটা সম্বন্ধও যেন কি করে জড়িয়ে গিয়েছিল।

ডিঃ সা – হা–হা–হা। আরে সে তো কথাই আছে ঃ

মামার ক্ষেতে বিয়াইল গাই

---

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
১১৭. মুজিবর রহমান, মতামত, পোড়োবাড়ী

Dhaka University Institutional Repository

সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই।[১১৮]

গ্রামের পর্বত আলী মোড়লের ছেলে ফজরালী সাব-ডেপুটির চাকুরি পেয়ে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে অবজ্ঞা আর অবহেলার চোখে দেখেছে। গ্রামের কসিম ব্যাপারীর ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল, টাকার অভাবে লেখাপড়া করতে পারছে না। ছেলেটিকে কিছু অর্থনৈতিক সাহায্য করার প্রস্তাব নিয়ে মনীর মিঞা তার কাছে এসেছে—

মনীর - ...বেতন দিতে না পেরে ছেলেটি আজ দুই মাস যাবত ঘরে বসা।

ডিঃ সা - ঐ কাজটুকু আমাকে দিয়ে হবার নয়। চাষার ছেলে নাম লিখতে শিখেছে, এই-ই গণিমত। এখন বাবাজী চাষাবাস করে খাক গিয়ে।[১১৯]

এই গ্রামেই তার শেকড়, এখানকার স্কুলে বিনা বেতনে পড়ে, গ্রামবাসীদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আজ সেই গ্রামের লোকদের শিক্ষার ঘোর বিরোধী—

ডিঃ সা - আর এই যে ব্যাঙ্গের ছাতার মতো দেশের যেখানে সেখানে ইস্কুল কলেজ গজিয়ে উঠেছে, আমি এর ঘোর বিরোধী।

মনীর - তাই তো।

ডিঃ সা - তুমি জান এতে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত বেড়ে যাবে? আর তারা চাকরি বাকরি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নির্ঘাত ভদ্রলোক ডাকাত সাজবে?

মনীর - আর নিজ অবস্থায় তুষ্ট না থেকে আন্দোলনে আন্দোলনে গবর্নমেন্টকে উত্যক্ত করে তুলবে।

ডিঃ সা - আরে সে তো আসল কথা আছেই। আর তাছাড়া, ইংরেজিতে একটা কথা আছে : অজ্ঞতায় যেখানে সুখ, বিজ্ঞতায় সেখানে বোকামি।[১২০]

সাব-ডেপুটি ফয়জুর রহমান তার গ্রামের লোকদের ভাগ্যোন্নয়নে এগিয়ে আসতে চায়নি। পাঠশালা পণ্ডিত মনির তার চোখ খুলে দিয়েছে—

...এই যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পল্লীবাসী, দিনান্তের কঠোর শ্রমের পর কখনো এক বেলা খায়, কখনো খেতে পায়না ; এই চির অর্ধ আহারীদের শ্রমে অর্জিত ধন কুড়িয়ে নিয়েই গবর্নমেন্ট তোমার পড়ার

---

১১৮. নাট্যকার টাঙ্গাইলের করটিয়ায় ১৯৫৩ সালের ১৭ জুন নাটিকাটির রচনা শেষ করেন। রচনার সাত মাস পর মাসিক মোহাম্মদীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঢাকা ওয়াসী বুক সেন্টার ১৯৫৫ সালে (১৩৬২) প্রথম নাটিকাটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে। 'ঋণ-পরিশোধ' আরজ অংশ দ্রষ্টব্য, ঋণ পরিশোধ, পৃ. ২৪

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

খরচ জুগিয়েছিল। আজ সেই দরিদ্রদের একটি জ্ঞান পিপাসু সন্তান তাদেরই পাওনা টাকা হতে পড়ার খরচ বাবদ তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইতে এলে যখন তুমি তাকে সোজা হাল ক্ষেত দেখিয়ে দাও, তখন তোমার লজ্জা হয় না ? গর্বিত বিচারক মহাশয়?[১২১]

শেষ পর্যন্ত সাব-ডেপুটি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, গ্রামোন্নয়নে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নাটকের কাহিনী সুবিন্যস্ত নয়। গ্রামীণ জীবন ও মুসলিম সমাজের খণ্ড চিত্র উপস্থাপনই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। মিথ্যা খান্দান গর্ব, আভিজাত্যের অহংবোধ মুসলিম সমাজকে তিলে তিলে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে নাটকের মধ্য দিয়ে সেটিও তুলে ধরা হয়েছে।

ঠকবাজ গয়া ডেপুটি সাহেবের নাম ভাঙ্গিয়ে গ্রামের লোকজনদের কাছ থেকে বাড়তি সুযোগ সুবিধা আদায় করেছে। তাদের ফাঁকি দিয়ে দুধ, মাছ নিয়েছে কিন্তু দাম পরিশোধ করেনি। তার সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজচিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে—

গয়া। ...বাংলায় যারা ভদ্র, বুদ্ধিজীবী তাদের বারো আনা লোক এই কারবার করেই তো বেঁচে আছে। আমরা ইংরেজি বিদ্যা শিখি নাই যে বড় বড় চাকরিতে ঢুকে ফাও কামাই করব। আরবী, সংস্কৃত শিখি নাই যে পীর পুরুহিত হয়ে মুরীদের ঘাড় ভাঙব। আগে থেকে জমিদারী সেরেস্তায় ঢুকি নাই যে আবোয়ার, সেলামী, গাই-বিয়ানী নজর আদায় করব, বুকে এমন হিম্মত নাই যে অন্ধকার রাতে হাল হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। এমন দেশপ্রেম নাই যে কংগ্রেস খিলাফতের নামে চাঁদা আদায় করে পকেট ভর্তি করব। এমন মুখের জোর নাই যে মানুষেরে ভোল দিয়ে আইন সভায় গিয়ে রোজগার শুরু করে দিব। অগত্যা বর্তমান পেশাই চালিয়ে যেতে হবে।[১২২]

অর্থনৈতিক সমস্যা সামাজিক জীবনে যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি, অনাচার সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল, বর্তমান সমাজ জীবনেও এর কুপ্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। নাটকীয় সংজ্ঞার মানদণ্ডে ঋণ পরিশোধ উত্তীর্ণ না হলেও সমাজ দর্শন হিসেবে নাটিকাটির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই।[১২৩]

---

১২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

১২৩. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

১২

আসকার ইবনে শাইখের 'বিল বাওড়ের ঢেউ' নাটকটি গ্রাম বাঙলার জেলে সমাজের সুখ-দুঃখের পটভূমিকায় রচিত। দীন দরিদ্র জেলে সমাজ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভ্রূক্ষেপ না করে মৃত্যুর আশঙ্কা ত্যাগ করে নদী-নালা বিল হাওরে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু এখানেও কুচক্রী মহাজনের শত বাধা—তারা চড়া দামে হাওর-বাওর বিল ডেকে নেয় এবং তাতে জেলেদের মজুরি খাটতে হয়। তাছাড়া মাছ ধরার ভাল জাল অনেকেরই থাকে না, সময়মত সূতা কিনতে পারে না, পারে না বেড়াজালের কবচ ক্রয় করতে। ঘর-সংসার ফেলে মাছ ধরার সময় দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকতে হয় সেও এক সমস্যা। তাদের মহাজন নিতাই দাস মৌসুমে মৌসুমে চড়াসুদে কর্জ দিয়ে তাদের জাল সূতা কেনার জন্য সামান্য উপকার করে আর তার ইজারা নেওয়া বাওড়ের মাছ ধরে কায়ক্লেশে কিছু রোজগারও হয়, কিন্তু কর্জের সুদ আর বাওড়ের লাভে নিতাই অগাধ ধনের মালিক হয়েছে আর জেলেরা দিনদিনই হয়েছে গরিব।

জেলে সম্প্রদায়ের নিবারণ তার পুত্র সহদেবকে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়েছে, সে জেলে সম্প্রদায়ের ভাগ্যোন্নয়ন করতে চায়, দুর্জন নিতাই দাসের শোষণের কবল থেকে মালো সমাজকে মুক্ত করতে চায়, মহিম সরকার এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহ আর প্রেরণা যুগিয়েছে—

> ...তোমাদের মত আরো হাজার হাজার মালোর শত শত সমিতি গড়ে উঠেছে। একার শক্তিতে কুলায় না বলে দেশের সবাই সমবেতভাবে গড়ে তুলেছে দেশজোড়া এক বড় সমিতি। তোমাদের সমিতি হবে তারই একটা অংশ, সেই বড় কাজের এক অংশীদার। তোমাদের যখন টাকা কর্জ চাই, সকলের মিলিত সেই বড় সমিতি কর্জ দেবে টাকা। সেই বড় সমিতির নামই সমবায় দপ্তর।[১২৪]

সূতা কিনতে, কাঠি কিনতে, কবচ কিনতে, জাল, নৌকা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি কিনতে টাকার দরকার পড়লে সমিতি কর্জ দেবে। কিন্তু নিতাই দাসকে নিয়ে তাদের সমস্যার সৃষ্টি হয়। সহদেব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। মহিম তাকে আশ্বাস দেয়—

> মহিম। আরে জোয়ান, গোলমাল আর কিসের? তুমি না জেলের ছেলে? হাওরের বুকে ঢেউ ওঠে—সে ঢেউ-এর মাঝে তোমরা ডিঙ্গি চালাও। হাওরের সঙ্গে তোমাদের নিত্যকার সম্পর্ক। যে সম্পর্ক সংগ্রামের, রুজি-রোজগারের। হাওরে তোমাদের কত নাও ডুবে যায়, কত জেলে প্রাণ হারায়। তাই বলে জেলেরা হাওর ছেড়ে দেয়? ভয় নাই সহদেব। যতই ঢেউ উঠবে, তোমাদের হাল ধরা হাতের পেশী ততই ফুলে উঠবে। এবার আমি আসি।[১২৫]

---

১২৪. বিল বাওড়ের ঢেউ, ১৯৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত। আবিদ আজাদ ও মাহবুব হাসান সম্পাদিত আসকার রচনাবলী (১ম খণ্ড) বিল বাওড়ের ঢেউ, ,. ২৭৩

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

নিতাই দাসের বাধাকে উপেক্ষা করে জেলে সমাজ সমবায় সমিতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। মহিম সরকার এদের অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়—

> মহিম। এদ্দিন জল মহালের ডাক হত প্রকাশ্যে। যে বেশি টাকায় ডাকত, মহাল ইজারা রাখত সে-ই। কিন্তু এবার থেকে সেই রকম আর হবে না। এখন বিলবিলান্তি হাওর নদী এসব জল মহালের খাজনা ঠিক হবে। আর সেই খাজনার বদলে সরকার মালোদের সমবায় সমিতিগুলোকে এইসব মহাল ইজারা দেবে। সমিতির ইজারা নেওয়া মানে সব মালোরই ইজারা নেওয়া। ফলে, মাছের ব্যবসায় যে লাভ হবে, তা থাকবে সব মালোদেরই। নিতাই দাস একা একা সেই লাভ আর লুটতে পারবে না।[১২৬]

নিতাই দাসের কন্যা গৌরী সহদেবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নিতাই দাস অন্যত্র কন্যার বিয়ে ঠিক করে কিন্তু সহদেবের বুদ্ধির কৌশলে লগ্নমত বর না আসায় গৌরীর সঙ্গে সহদেবের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে যায়। বিয়ের আগে মহদেব গৌরীর দাদা নুরুর কাছে যৌতুক দাবী করল—'সমবায় সমিতিটা যাতে হয়'... ।[১২৭]

গ্রামীণ পরিবেশে মালো সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার আলেখ্য 'বিল বাওড়ের ঢেউ'। মহাজনী শোষণ থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা, জেলে জীবন, জীবন সংগ্রাম, জীবিকার খুঁটিনাটি সমস্যার বাস্তব উপস্থাপনে নাটকটি উপভোগ্য হয়েছে। জেলে বউদের নদীতে জল আনতে যাওয়া, চটুল হাসি ঠাট্টা, অন্য পুরুষের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ, জেলেপাড়ার গানের আসর সবই নাট্যকারের সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ফসল। অতি সাধারণ, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় জেলে জীবনের নিরাভরণ দৃশ্যের উপস্থাপনা নাট্য-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কাহিনীর বৃত্ত গঠন, বাস্তবানুগ চরিত্র চিত্রণ ও মৃদু দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টিতে 'বিল বাওড়ের ঢেউ' সার্থক সৃষ্টি।

১৩

আলি মনসুরের 'বোবা মানুষ' সামাজিক নাটক। নাটকটি চারটি অঙ্কে বিভক্ত ও এগারটি দৃশ্য সম্বলিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুর্ভিক্ষের চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি সমকালীন দুর্নীতিপরায়ণ জোতদার মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের রূপটিও চিত্রায়িত করেছেন। নাটকটি সম্পর্কে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন--

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭
১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

আমি এ নাটকে আমাদের কথাই বলতে চেয়েছি। জানিনা তা বলতে কতটা সক্ষম হয়েছি। আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অনটন নিয়েই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে।[১২৮]

সহজ, সরল গ্রামবাসীদের জীবনে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আয়েনের সংলাপের মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে—

আয়েন। ... পৌষ-পার্বণের সময় ঘরে ঘরে হাসির রোল উঠ্‌তো। মন খুশীতে ভরে উঠ্‌তো। আজও তাই হচ্ছে। যে পাড়ায় গেছি, যে ঘরে গেছি, সেখানেই দেখেছি একটা হৈ-চৈ। তবে কি জান বু—আজকের এ হৈ-চৈ সেই আনন্দের নয়—পাঁজর ভাঙ্গা অভাগা মানুষের চাপা কান্নার গোঙানি। বুক ফুলে উঠেছে ঠিকই, তবে সে দুঃখের জ্বালায়। ওরে বু এই পোড়া জঠরের জ্বালায়।[১২৯]

গ্রামের নিরীহ প্রজা গফুর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তার সুখের সংসার। কত আশা বুকে নিয়ে ক্ষেত খামার গড়ে তুলেছিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়িয়ে তার দিন কেটে যেত। প্রভাবশালী বিত্তবান রহিম জোতদারের নির্যাতনের শিকার হয়ে গফুরের সুখের সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। একমাত্র পুত্র কায়সারকে ষড়যন্ত্র করে খুনের আসামি সাজায়, পিতা গফুর হলো গৃহছাড়া, পথবাসী। রহিম জোতদার সরকারি রিলিফের চাল বিতরণের নামে কালোবাজারী শুরু করে—

অফিসার। ...গভরমেন্টের দর হ'ল দশ টাকা করে। ব্ল্যাকের দরও হ'ল দশ টাকা করে। ব্ল্যাকের দরও আঠারো উনিশ টাকার কম নয়। দু'শো মণ চাল, ও এক রকম বুঝে সুঝে দিলেই হবে।

রহীম। সে তো কেনা-বেচার দর। আর এত মুফতের চাল, ফ্রিতে দেওয়া হয়েছে। দাও নৈমুদ্দি এক টাকা করে ধরে দাও। দুশো মণ চালের দুশো টাকা ধরে দাও।

অফিসার। কিন্তু কিছু চাল তো বিক্রি করতে হবে।

রহীম। কেন শুনি? ওই সব চোর ছ্যাচড়া চাষা ভূষোদের বাঁচিয়ে কি হবে শুনি?

অফিসার। কিন্তু--

রহীম। ...তেতাল্লিশে—মানে, বাংলা পঞ্চাশের মন্বন্তরে কত হাজার হাজার মণ চাল হজম করে দিলুম। আর এ তো মাত্র দুশো মণ। দাও—দাও নৈমুদ্দি আরো এক টাকা বেশি করে দাও। আরে আপনি আমি ঠিক থাকলে হে...হে...হে...।[১৩০]

---

১২৮. আলি মনসুর, বোবা মানুষ, রাফিয়া মনসুর ঢাকার পড়াশুনা থেকে ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে নাটকটি প্রথম প্রকাশ করেন। রচনাকাল, এপ্রিল ১৯৫৬, বোবামানুষ, পরিচয় অংশ দ্রষ্টব্য

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ ভিটে-মাটি ছেড়ে অনিশ্চতার পথে পা বাড়িয়েছে—

গফুর। যে ভিটে নিজেদের নয়, যে জমির ধান নিজের হয় না, যে জমি খেতে দিতে পারেনা, সেখানে থেকে লাভ নেই—ওরে সেখানে থেকে লাভ নেই।[১৩১]

মন্বন্তর-ক্ষুধা, রোগ-শোক পীড়িত পরাধীন দেশের শোষিত নির্যাতিত মানুষ আজীবন সংগ্রাম করেছে, বুকের রক্ত দিয়ে বিত্তবানদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। অথচ তারা আজীবন দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। দুর্নীতি- পরায়ণ অসজ্জন ব্যক্তি বড় সাহেবের পুত্র আদর্শবাদী কামালের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সমকালীন চিন্তা-চেতনা তুলে ধরেছেন—

কামাল। ...তোমাদের গড়া ক্ষেত তোমাদের নিজেদের হয়না। ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে তোমরা পরের সুখের জন্য ঘর গেঁথে দাও, আর তোমরা থাক ভাঙ্গা ঘরে। বৃষ্টির পানি চুইয়ে সারা ঘরটা ভিজে ওঠে। দেশ স্বাধীন হলো তোমাদেরই রক্তে আর তোমরা রয়ে গেলে পরাধীন। হাজার হাজার গরীবের রক্ত ঢেলে যে পাকা রাস্তা তৈরি হবে সেই পথের পাশে তোমরা তোমাদের ছেলেপুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ভিক্ষেপাত্র হাতে করে যেন একদল কঙ্কাল...আর...।

গফুর। ছোট সাহেব—একথা তো আর কেউ বলে না...।

কামাল। লাখো ভুখার রক্তে যে ইমারত গড়ে উঠবে তার ফল তারা ভোগ করতে পারবে না। তাদের ছেলেপুলে পড়ে থাকবে গাছতলায়, না খেয়ে তিল তিল করে মরণের দিকে এগিয়ে যাবে—না না কিছুতেই হয় না—এ কিছুতে হতে পারে না। যে ক্ষেতের শস্যে গরীবের পেট ভরে না—তা পুড়ে ছাই হয়ে যাক। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেদের খুন ঢেলে দেশের সুখ শান্তি নিয়ে এলো তারা তাদের ছেলেপুলে তাদের বংশধর তা ভোগ করতে পারবে না। অনাহারে অর্দ্ধাহারে মরবে, শুধু চোখের পানি ফেলে যাবে। না, না, আমি চাই না সে সুখ, চাই না সে শান্তি—ধ্বংস হয়ে যাক, ধ্বংস হয়ে যাক। পৃথিবীর বুকে থেকে বিলীন হয়ে যাক সে দেশ—সে দেশের চিহ্ন।[১৩২]

নীলিমা ইব্রাহিম এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> মানস চিন্তায় ও জীবন দর্শনে সম্ভবতঃ নাট্যকার বামপন্থী, সর্বহারা কিষাণ ও দারিদ্র্যপিষ্ট জনগণের জন্য তাঁর আত্মিক সহানুভূতি নাট্যকার রচিত অধিকাংশ নাটকের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।[১৩৩]

কাহিনী-নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ ও সংলাপের দক্ষতায় নাটকটি সফল সৃষ্টি।

---

১৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

১৩৩. নীলিমা ইব্রাহিম, বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৯, পৃ. ৫০৮

Dhaka University Institutional Repository

১৪

আবদুল হকের সামাজিক নাটক 'অদ্বিতীয়া' পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত, নাটকটিতে মোট ছ'টি দৃশ্য বর্তমান। মুসলমান সমাজের বহু বিবাহ ও তার ফলে সৃষ্ট সমস্যা নিয়ে নাটকটি রচিত।

নাটকের নায়ক আনোয়ার একজন চোরাকারবারী, ঔষধের ব্যবসায় অসদুপায় অবলম্বন করে তিনি এখন ফার্মেসীর মালিক। বিত্ত-বৈভব আর অর্থের প্রাচুর্য সমাজে তার খ্যাতি-যশ এনে দিয়েছে। উপরতলার লোকজনের সঙ্গে তার চলাফেরা, উঠাবসা, সমাজে সবাই তাকে সম্মান করে চলে। একমাত্র কন্যা লিলি সেও ভাল ছাত্রী, এস.এস.সি-তে ফোর্থ স্ট্যান্ড করেছে। স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে তার সুখের সংসার ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে আনোয়ার সাহেবও আধুনিক সভ্যতার কু-অভ্যাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। সুন্দরী আধুনিক ফরিদার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন। তার ধারণা স্ত্রীরা হচ্ছে পুরুষের উন্নতির সহায়ক—

> আনোয়ার ॥ ...পুরুষের কাজ চলে বাইরে, কিন্তু নারীর কাজ চলে নারী আর পুরুষ সকলের মধ্যেই। এই যেমন ধরো, ক্যানভাসিং হচ্ছে ব্যবসার প্রধান কথা। আমি যেখানে ব্যর্থ হব, তুমি সেখানে সফল হতে পারতে। লাইসেন্স নেওয়ার ব্যাপারে, হাসপাতালের অর্ডার, মিউনিসিপ্যালিটির অর্ডার, গভর্নমেন্টের অর্ডার যোগাড় করার ব্যাপারে তুমি সাহায্য করতে পারতে, কিন্তু তা তুমি পারবে না। আমি উন্নতি করেছি, কিন্তু মাত্র অর্ধেক উন্নতি করেছি।[১৩৪]

আনোয়ার সাহেবের প্রথমা স্ত্রী লিলির মা স্বামীর চোরাকারবারের কথা জানিয়ে পুলিশের কাছে চিঠি লিখে সাহায্য চেয়েছে । কিন্তু লাভ হয় নি, পুলিশ অফিসারকে ছ'হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে তিনি সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। মাঝখানে পড়ে লিলির মা অপরাধী হয়েছে, তার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। লিলির মাকে ঘর ছাড়া করেছেন, লিলিও মায়ের পথ অনুসরণ করেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে ফরিদাকে তিনি বিয়ে করে ঘরে তুলেছেন। অন্যদিকে তার একমাত্র বোন সেতারার স্বামীও দ্বিতীয়বার বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার সংসারেও অশান্তির ঝড় উঠেছে। সেতারাও স্বামীকে ছেড়ে আলাদা বাসা নিয়েছে। সেতারা লিলিকে তার পিতার কাছে রেখে এসেছে। কিন্তু সে তার নতুন মা ফরিদাকে মেনে নিতে পারেনি। পিতা-কন্যার সংঘাত শুরু হয়েছে, জীপের তলায় পড়ে লিলি এ্যাকসিডেন্ট করেছে। কন্যার এ্যাকসিডেন্টের সংবাদে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন, কন্যার চিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছেন, কন্যা সুস্থ হলে হাসপাতাল থেকে নিজের বাড়িতে এনেছেন।

---

১৩৪. আবদুল হক, অদ্বিতীয়া, ঢাকা থেকে নওরোজ কিতাবিস্তান ১৯৫৬ সালে নাটকটি প্রথম প্রকাশ করে। পৃ. ১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় স্ত্রী ফরিদার সঙ্গে বনিবনা হয়নি, সে আনোয়ারের স্ত্রী-কন্যাকে সহ্য করতে পারেনি। এক সঙ্গে একই বাড়িতে সে বসবাস করতে চায়নি। আনোয়ারকে ছেড়ে যাওয়ার আগে সে দৃঢ়ভাবেই বলেছে —

> ফরিদা॥ ...আমার প্রেমে পড়ে তুমি যদি লিলির মাকে তালাক দিতে, তবে আমি বুঝতাম তুমি প্রেমিক। এখন আর কারো প্রেমে পড়ে তুমি যদি আমাকে তালাক দিতে তাহলেও বুঝতাম যে তুমি প্রেমিক। কিন্তু তুমি যদি এক সঙ্গে দু'জনকে নিয়ে সংসার করতে চাও তাহলে আমি বলব, তুমি নারী-বিলাসী, তুমি রাজা-বাদশাহদের মতোই নারী-বিলাসী।...কিন্তু এই কাবিননামার বলে আমিই বরং তোমাকে গুষ্টিশুদ্ধ হয়রান করতে পারি। তুমি যাদের ভালবাস তাদের জন্যে নারী-বিলাস বর্জন করার গরজ এখন তোমারই বেশি। সেদিক দিয়ে আমি নিশ্চিত। আর আমি—আমার মন এত ছোট নয় যে, ঠাণ্ডা লাশের জন্য আমি লড়াই করতে যাব।[১৩৫]

চোরাচালানী ও চোরাকারবার গোটা সমাজব্যবস্থার উপর যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল রাবেয়ার সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেটি তুলে ধরেছেন—

> রাবেয়া॥ ...বিদেশ থেকে আমাদের ডিসপেন্সারীর নামে ৫০ হাজার টাকার ওষুধের চালান এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যে মোটে হাজার দশেক টাকার ওষুধ বিক্রি করা হবে, বাকী ওষুধ লিলির আব্বা এই বাড়ীতে এনে রেখেছে। এই ঔষধ বিক্রি হয়ে গেছে বলে ডিসপেন্সারীর হিসাবপত্রে লেখা হয়েছে। বাজার যখন খুব চড়া হবে, যখন ঔষুধপত্র পাওয়া যাবে না, তখন দু-গুণ তিন-গুণ দামে এসব ওষুধ বিক্রি করা হবে।[১৩৬]

নাট্য কাহিনীতে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। সামাজিক সমস্যার খণ্ড খণ্ড চিত্র রূপায়ণই নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য। নান্দনিক বিচারে নাটকটি সফল না হলেও সামাজিক দলিল হিসাবে সার্থক। সমালোচক যথার্থই উল্লেখ করেছেন—...নাট্যকার বক্তব্য ও ঘটনা উপস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারেন নি। ফলে চরিত্রগুলি মতাদর্শের বাহক হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়নি।[১৩৭]

১৫

আশরাফ-উজ-জামানের 'সয়লাব' একটি সমাজ-সচেতন সামাজিক নাটক।[১৩৮] সৈয়দ সাহেব জমিদার, মীর সাহেব গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী—একই গ্রামে পাশাপাশি দুটি পরিবারের অবস্থান। সৈয়দ সাহেবের জমিদারি জৌলুস বর্তমানে অবলুপ্ত প্রায়, কিন্তু মীর সাহেব ব্যবসা আর চাকরি করে দিন দিন উন্নতি করছেন।

---

১৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২-১২৩
১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯
১৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৮ এপ্রিল ১৯৬০, সংগ্রহ, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫
১৩৮. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ১৭৬

তার ছেলেরা শহরে গিয়ে লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে। অন্যদিকে সৈয়দ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র করিমকে শহরে গিয়ে লেখাপড়া করার জন্য পাঠিয়েছেন যে কোনো রকমে এন্ট্রান্স পাস করলেও তারপর দু'বছর ধরে আটকে আছে আই.এ-তে। শহরে গিয়ে সে সিগারেট ধরেছে, গার্ল ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, গ্রামে তার ভালো লাগে না।

মেঘনার বানে সৈয়দ সাহেবের জমি একের পর এক ভেঙ্গে যাচ্ছে। জমিদারি করে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। তিনি অনেক স্বপ্ন বুকে নিয়ে ছোট ছেলেটিকে শহরে পড়তে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সে স্বপ্নও তার পূর্ণ হলো না। সৈয়দ সাহেব দুঃখ করে বলেছেন—

> ...কোন সাধই জীবনে পুরো হলো না। ঘরের ছাদ এখনো রয়ে গেল টিনের ছাদ। দু'মেয়ের এখনো বিয়ের বাকী। জমিদারী করে জীবনে কিছু হলো না। মীরেরা ব্যবসা আর চাকরিতে আজ আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে।[১৩৯]

বংশ মর্যাদাবোধ আর খান্দানের গর্বে অন্ধ সৈয়দ সাহেব মীর পরিবারের বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। এতে সৈয়দ সাহেবের আভিজাত্যে আঘাত লেগেছে—

> সৈয়দ। জাতে উঠতে চায় না। জাত কিনতে চায় পয়সার জোরে। মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে আমার কাছে মীর বাড়ীর এই দুঃসাহস।[১৪০]

সৈয়দ সাহেব একজন আত্মকেন্দ্রিক, পরশ্রীকাতর ব্যক্তি, মীর সাহেবের উন্নতি তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না—

> ...মীর পরিবার চোখের সামনে সকলকে ছাড়িয়ে উঠছে এটা কোনো রকমেই সইতেই পারছি না, হরিবাবু।[১৪১]

তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় মেঘনার তীরে নতুন চর জেগেছে, এই চর নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। সৈয়দ পরিবার যেহেতু জমিদার সেহেতু মেঘনার চরের সব জমিই তাদের দখল করার ইচ্ছা। মেঘনার পাড়ে

---

১৩৯. আশরাফ-উজ-জামান, সয়লাব, ঢাকা থেকে ওদুদ পাবলিকেশন ১৯৫৬ সালে নাটকটি প্রথম প্রকাশ করে, পৃ. ৩৭
১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
১৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

মীর সাহেবরা যে জমির পত্তন করেছিল সেটিও জমিদাররা দিতে নারাজ। এদিকে জমিদার সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র করিম অত্যাধুনিকা শহুরে মেয়ে মীনাকে বধূ করে ঘরে এনেছে। গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। সে চায় তার মেয়েদের নাচ-গান শিখিয়ে আধুনিকা করে গড়ে তুলতে, করিম সেটা পছন্দ করেনি। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতবিরোধ, সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে।

চর নিয়ে দুই পরিবারের বিবাদ শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। জমিদার সাহেবের বড় ছেলে কবির, তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সবাই চায় এই মামলায় জয় লাভ করে তাদের জিদ আর ক্ষমতার দাপট বজায় রাখতে। উভয় পক্ষই চর দখল নিয়ে লাঠিয়াল বাহিনী ঠিক করেছে, উভয়েই আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে এমন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়েছে। বন্যায় গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ি সর্বস্ব ভেসে গেছে, তারা স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। সৈয়দ বাড়ির ঘরের মধ্যে পানি উঠেছে, জলমগ্ন অবস্থায় তারা দিন কাটাচ্ছে। মীর বাড়ির লোকজন এসে সৈয়দ বাড়ির সদস্যদের নৌকায় করে উঠিয়ে এনে মীর বাড়ির দোতলায় আশ্রয় দিয়েছে। মীর পরিবারের আতিথেয়তা, আচার-আচরণে তারা সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়, অথচ এদের সঙ্গেই তারা সারাজীন ধরে শত্রুতা করে এসেছে। শিক্ষার আলো তাদের আচার-ব্যবহারে পরিবর্তন এনেছে। কবির দীর্ঘদিন পরে সেটি উপলব্ধি করতে পেরেছে—

> কবির। তোমাদের বাড়ীতে এসে একটি জিনিস আমার পরিষ্কার হয়ে গেছে আসলাম যে, শিক্ষা আর সহবত মানুষের ব্যবহারকে কত ভাল করে। এখানে এসে দুঃখ হচ্ছে যে, আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া করলো না।[১৪২]

শেষ পর্যন্ত সৈয়দ পরিবারের বিলকিস ও মীর পরিবারের ফজলের বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই বিভেদ দূরীভূত হলো। অকস্মাৎ বন্যার আবির্ভাবে সৈয়দ ও মীর দুটি পরিবারের বিরোধ চিরদিনের জন্য কেটে গেল, সবকিছু ধুয়ে মুছে দিল। বন্যার পর আবার জেগে উঠলো নতুন মাটি, সামনে নতুন দিনের স্বপ্ন।

'সয়লাব' পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট সামাজিক নাটক। নাট্যকার কাহিনীকে পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করে এক একটি অঙ্কের কাহিনী সাজিয়েছেন নিম্নলিখিত শিরোনাম দিয়ে। প্রথম অঙ্ক—সময় ও ঘটনা—ত্রিশ বছর আগে, দ্বিতীয় অঙ্ক—পাঁচ বছর পর, তৃতীয় অঙ্ক—কাল-বর্তমান, চতুর্থ অঙ্ক—এক বছর পর গ্রামের পথ, পঞ্চম অঙ্ক—মীর বাড়ির কক্ষ। নাটকটির কাহিনী সগ্রন্থনে নতুনত্ব আছে। কাহিনী-নির্মাণ, বৃত্তগঠনে, চরিত্র-সৃজনে সংলাপের সার্থক প্রয়োগে জীবন চেতনাবাহী সয়লাব একটি সার্থক সৃষ্টি।[১৪৩]

---

১৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
১৪৩. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

১৬

জসীম উদ্‌দীনের 'মধুমালা' একটি লোকনাট্য। রূপকথা আশ্রয়ী গ্রাম-বাঙলার বহুল প্রচলিত মধুমালার কেচ্ছাকাহিনী এ নাটকের উপজীব্য হয়েছে। এ কাহিনীকে নাট্য রূপদানের প্রেরণা সম্পর্কে কবি তাঁর এক অন্ধ দাদার মুখে শোনা কাহিনীর ঋণ স্বীকার করে বলেছেন —

'আমার অন্ধ দাদার মুখে যেমনটি শুনিয়াছিলাম এই কাহিনীকে তেমনটিভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছি।[১৪৪]

মধুমালার কাহিনী তেরটি খণ্ড দৃশ্যে বিভক্ত, খণ্ড দৃশ্যগুলি সঙ্গীতের ব্যবহারে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছেন। গানের সংযোজন সংলাপের চাহিদা পূরণ করেছে। মধুমালা, মদনকুমারের কাহিনী রূপকথার কল্পকাহিনী হলেও এর মানবীয় আবেদন অনস্বীকার্য। এ নাটকে চরিত্রসমূহ কল্পিত কিন্তু বাস্তব জগৎ সংসারের মানবীয় চেতনা সমৃদ্ধ। আটকুড়ো রাজার দুঃখ-কষ্ট সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—

রাজা। দেখ রে মন্ত্রী আমি আটকুড়ো রাজা বলে ঝাড়ুদারেরা পর্যন্ত আমার মুখ দেখতে চায় না। আজ আমি বার-বাঙলার ঘরে গিয়ে কপাট দিয়ে রইব। আর আমি কপাট খুলব না। আটকুড়ো জনমের চেয়ে মরণ ভাল।[১৪৫]

মদনকুমারের জন্য রাণীর মাতৃহৃদয়ের হাহাকার বাস্তবতার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে—

রাণী। ...আমার মদনকুমার। কে নিল, কে নিল আমার বাছাধনকে? শত সহস্র তরঙ্গ বাহু মেলে সমুদ্রের উপর গর্জন করছে। তোরা—তোরা নিয়েছিস আমার বাছাধনকে, দে - দে। ফিরিয়ে দে আমার দুঃখের ধন নীলমণিকে। জ্বলে জ্বলে জ্বালা। পুত্র শোকের জ্বালা জ্বলে। দে, ফিরিয়ে দে আমার বাছাকে। নইলে এই বুকের জ্বালা ঢেলে দেব তোর বুকে—এক একখানা করে বুকের পাজড়া ভেঙ্গে ফেলে দিব তোর বুকে—পারবিনে সইতে। পারবিনে সইতে তুই এই মায়ের বুকের জ্বালা।[১৪৬]

মদনকুমার মধুমালার প্রেম ভালোবাসা যেন বাস্তব সংসারের দুটি নর-নারীর পার্থিব জগৎ সংসারের বাস্তব চিত্র। মদন কুমারের বিরহে অস্থিরচিত্ত মধুমালার ব্যাকুলতা—

মধুমালা। ...দিন যেয়ে মাস হল—মাস যেয়ে বৎসর শেষ হয়ে গেল। তবুও ত প্রাণনাথ এলো না। তবে কোন আশা নিয়ে আমরা গৃহে বসে থাকি?[১৪৭]

---

১৪৪. তথ্য সংগ্রহ, মুহম্মদ মজির উদ্দীন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, পৃ. ৩২৮

১৪৫. জসীমউদ্‌দীন, মধুমালা (প্রথম সংস্করণ), ঢাকা থেকে শেখ মনিরুদ্দিন এন্ড কোং, ১৯৫৬ সালে নাটকটি প্রথম প্রকাশ করে, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৯৩, পৃ. ৭

১৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে এ ছবি মোহনীয়। রাজা, রাণী, গণক, মাঝি, রাখাল বালক এসব চরিত্র আমাদের চির পরিচিত। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন—

> মধুমালা রূপকথা হলেও এ কাহিনীর নর-নারীরা জসীম উদ্‌দীনের মানবিক কল্পনার গুণে মাঝে মাঝে রূপকথার সীমানা ডিঙ্গিয়ে আমাদের বাস্তব পৃথিবীতে এসে যেন জায়গা জুড়ে বসতে চেয়েছে। রূপকথার রাজারাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, মন্ত্রী, কোটাল, কেউ যেন পুরোপুরি রূপকথার রাজ্যের অধিবাসী হিসেবে মর্যাদা বজায় রাখতে পারেনি... ঝাড়ুদার, ঢুলি, মাঝি, দাসী, চাকর, রাখাল বালক এরা তো সরলপ্রাণ পল্লী মানুষেরই প্রতিচ্ছবি প্রায়। গরীব গণ্যকারের ছবিও বড়ই বাস্তবধর্মী। অপরের ভাগ্য গণনা করে দিন কাটায় অথচ নিজের ভাগ্যের খবর রাখে না।[১৪৮]

মধুমালায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। লোকসঙ্গীতের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে নাটকটি উপভোগ্য হয়েছে। লোকনাট্যের কাহিনী চিত্রণ, ভাষাভঙ্গি ও চরিত্র সৃষ্টির পাশাপাশি সুরের যাদুমন্ত্রে কোন এক বহুল পরিচিত লোককাহিনী উপস্থাপন ভঙ্গিমায় রূপকথার কল্পলোক ছেড়ে বাস্তবতার মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

১৭

জসীমউদ্‌দীনের 'পল্লীবধূ' নাটকে গ্রামীণ জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নাটকটি দুটি অঙ্কে বিভক্ত—প্রথম অঙ্কে চারটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য আছে। পল্লী অঞ্চলে বিয়ে নিয়ে যেসব জটিলতা রয়েছে এবং সহজ গ্রামীণ জীবনের উপর আধুনিক শিক্ষার যে সংঘাত তারই বিচিত্র রূপ চিত্রিত হয়েছে পল্লীবধূ নাটকে।

'পল্লীবধূ' নাটকের জন্ম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা চিহ্নিত। নাটকটির প্রকাশকাল ১৯৫৬ হলেও আসলে এর জন্ম হয়েছিল ১৯৩০-এ। এ সময় জসীমউদ্‌দীন কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মাঝে মাঝে ঠাকুরবারি যেতেন। এ সময় বিশ্বকবি নাটক লিখতে উৎসাহবোধ করেন। তিনি নটক সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে আলোচনা করতেন। একদা জসীমউদ্‌দীন পূর্ববঙ্গের পল্লী নাটক সম্পর্কে আলোকপাত করলে লোকজীবনের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ কবি তাকে একটা গ্রাম্য নাটক লেখার পরামর্শ দিলেন। তিনি কবির কাছে তার প্রস্তাবিত নাটকের প্লট চেয়ে বসলেন, তিনি তাকে নাটকের একটি প্লটও দিলেন। পল্লীবধূ নাটকে জসীমউদ্‌দীন এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন।[১৪৯]

---

১৪৮. সুনীল মুখোপাধ্যায়, জসীমউদ্‌দীন, ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৭, পৃ. ৬৬১-৬২
১৪৯. তথ্য সংগ্রহ, জসীমউদ্‌দীন, ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায়, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা-১৯৬৩, পৃ. ১০-১২

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের প্রভাবশালী অশিক্ষিত মোড়ল ছদন তার ছেলে আজীমকে কলকাতায় রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কলকাতা থেকে এম.এ. পাস করে সে গ্রামে ফিরবে। শিক্ষিত পুত্রকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানানো যায় তা ভেবে পিতা প্রথমে বিচলিত হলেও গ্রামের বছির পেয়াদার পরামর্শে মোড়ল বাঁশের চাটাইয়ের চেয়ার আর কঞ্চির টেবিলে নক্‌শী কাঁথা বিছিয়ে বদনায় করে চা এবং ধামায় করে বিস্কুট দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। পুত্র আজীম এতে খুশি না হয়ে ক্রোধ প্রকাশ করে বাবাকে বলে—

> Hold your tongue, old man! এইসব এনে লোকের সামনে আমাকে অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়লে। নিয়ে যাও তোমাদের চা-বিস্কুট। Dam fool কোথাকার। লাথি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে দিই তোমাদের এইসব চেয়ার টেবিল।[১৫০]

ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই ইংরেজি শিক্ষার কুফল এদেশের যুব-সমাজকে বিপথে পরিচালিত করেছিল। কলকাতায় লেখাপড়া করা গ্রাম্য যুবক আজীম দেশীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে কৃত্রিমতাকে আঁকড়ে ধরেছে। অশিক্ষিত পিতাকে পর্যন্ত অশালীন ভাষায় তিরস্কার করতে দ্বিধাবোধ করেনি। সহজ সরল পিতা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুত্রের প্রতি কোন অসন্তোষ প্রকাশ করেননি, বরং গভীর বিশ্বাসে মনে করেছেন বেশি লেখাপড়া শিখলে মানুষের এমনি জেদ হয়। আত্মপ্রশান্তি নিয়ে তিনি বছিরকে বলেন—

> দ্যাখলা। দ্যাখলা ত বছির। কেমুন ত্যাজ অয়া আইছে। ইংরেজি সিংরাজি কত কি পইড়া আইছে তা ত্যাজ অবি না?[১৫১]

আলিম মাতবর ছদন মোড়লের বাল্যবন্ধু। পুত্র আজীম কলকাতায় লেখাপড়া করার সময় দুই বন্ধুর মধ্যে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছিল। লেখাপড়া শেষে আলিমের মেয়ে হাসিনার সঙ্গে আজীমের বিয়ে হবে। আলিম মাতবর মেয়েকে শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য সেভাবে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তার উপযুক্ত করে তুলেছেন। কিন্তু আজীম হাসিনাকে বিয়ে করতে অসম্মতি জানায়, পিতা ছদন মোড়ল খুব বিপদে পড়ে যান, কোনভাবেই পুত্রকে রাজি করাতে পারেননি। সে শিক্ষিত, গ্রামের অশিক্ষিত লোককে শ্বশুর বলে মেনে নিতে পারবে না—

> আজীম। আলিম মাতবরের মেয়ে হাসিনা—এই এক রত্তি মেয়ে সেদিন তাকে পুতুল নিয়ে খেলা করতে দেখলাম। তাকে আমি বিয়ে করব? কক্ষণই হবে না। একটা চাষা লোককে আমি শ্বশুর বলে পরিচয় দেব? তা কোনদিন হতে পারবে না।[১৫২]

---

১৫০. জসীমউদ্‌দীন—পল্লীবধূ, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬, ৫ম সংস্করণ ১৯৯৩, পৃ. ১৩
১৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
১৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

... ...

আজীম। তোমরা যাই কর, একথা স্পষ্ট করে বলে দিলাম ওখানে আমাদের বিয়ে কিছুতেই হবে না।

ছদন। দেখ্ আজীম। তুই ত বলস কতা বদলাইতি। এই কতা কি আইজক্যার কতারে। কত দিনির খোশ গল্পে হাসি তামাসায় এই কতার লতা ঐছে, ডালপালা গজাইছে—কতার ফুল ফুইট্যা খোশ্‌বু ছড়াইছে, এই কতা আমি কেমুন কইর‍্যা অনড় করি? আজ যোল বছর তুই বিদ্যাশে। আমরা খালি গরে শুইয়া শুইয়া এই কতা লয়া কতার জাল বুনাইছি। আলিমের ম্যায়ারে গরের বৌ কইর‍্যা আনব। আমার সুনার স্বপন তুই আইজ বাইঙ্গা দিলি আজীম।[১৫৩]

আজীম আলিম মাতবরের বাড়িতে বেড়াতে যেয়ে হাসিনাকে দেখে মুগ্ধ হয়, পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলে, হাসিনাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐদিকে গৈজদ্দি ভূইঞার পুত্রের সঙ্গে হাসিনার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। আলিম মাতবর কিছুতেই ছদন মোড়লের ছেলের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিতে সম্মত হলেন না। ফলে উভয় পক্ষই নিজেদের জিদ বহাল রাখার জন্য এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই দুর্ঘটনার সময় হাজী গৈজদ্দি উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষকে মরণপণ কাইজা থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি হাসিনার সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন—

গৈজদ্দি। তয় আমি বিচার কইরা দিলাম। তোমার ছাওয়ালের সঙ্গেই আলিম মাতবরের ম্যায়ার বিয়া ঐব! আমার ছাওয়ালের সঙ্গে সেই ম্যায়ার বিয়ার কতা ঐছিল। আমার ছাওয়ালডারে আমি উঠায়া লয়া যামু।[১৫৪]

নিজের মেয়ে বড়ুর সঙ্গে গৈজদ্দি হাজীর ছেলের বিয়ে দিয়ে আর হাসিনাকে আজীমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দুকূল রক্ষা করলেন। মিলনান্তক পরিবেশের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। পল্লীবধূ নাটকে গ্রামীণ জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ নাট্যকাহিনীতে গ্রাম্য মুসলিম সমাজের সহজ সরল রূপ চিত্রায়ণের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে শহর কেন্দ্রিক উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত তুলে ধরা হয়েছে। শহুরে যুবক আজীম প্রথমে গ্রামে এসে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। পরবর্তীতে তার ভুল ভেঙ্গে গেছে, যে তার চির পরিচিত পরিবেশে ফিরে এসেছে। পল্লীবধূ নাটক প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্য গবেষক সুকুমার বিশ্বাস লিখেছেন—

---

১৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
১৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

'পল্লীবধূ' নাটকে পল্লীর নিজস্ব রূপটি স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কাহিনী-নির্মাণে, চরিত্র-চিত্রণে, সংলাপ-সৃজনে, সর্বোপরি নাটকীয় সংকট সৃষ্টিতে জসীম উদ্‌দীনের কুশলী হাতের পরশ বর্তমান। পল্লীবধূ জসীম উদ্‌দীনের একটি সার্থক সৃষ্টি।[১৫৫]

১৮

'বাদল বাঁশী' ছ'টি দৃশ্য সম্বলিত একাঙ্কিকা। এর মধ্য দিয়ে জসীমউদ্‌দীন গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ প্রেম পূর্ব রাগেই সমাপ্ত হয়েছে, পরিণয়ে পরিণত হয়নি। কোন এক নিভৃত পল্লীর একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম-ভালবাসা, আবেগ-অনুভূতি, বিরহ-বেদনার শৈল্পিক শব্দ-প্রতিমা বাদল বাঁশী।

আঠার-উনিশ বছরের যুবক বছির আগুন নেবার ছলে নায়িকা বড়ুর সঙ্গে দেখা করে। সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে জল আনার জন্য অনুরোধ জানায়। নদীর ঘাটে যাওয়ার সময় বড়ু কুড়িয়ে পায় ধানের ছড়ার মালা, মোসলতার হাসুলী আর দুধালী লতার বাঁকখাড়ু। বলাবাহুল্য, এসবই বছির তার জন্য রেখে গিয়েছিল, এসব লতাপাতার গহনা দিয়ে সখী সখিনা তাকে সাজিয়ে দেয়।

ঘাটের পথে বছিরের সঙ্গে আবার দেখা হয়, প্রকৃতির গহনায় সজ্জিতা বড়ুকে দেখে সে মুগ্ধ হয়। অস্থিরচিত্ত যুবক হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করতে পারে না, লজ্জায় আরষ্ট হয়ে যায়, অবশেষে অনেক কষ্টে অনুরাগসিক্ত কণ্ঠে বলে—

> বছির। ...তোমার মতন একটা বউ যদি আমার ঐত এমনি কইর‍্যা সাইজা গুইজ্যা আমার উঠানডা বইরা গুরত তহন তরলা বাঁশী বাজাইয়া আমি গান গাইতাই।[১৫৬]

এরপর বড়ু জিজ্ঞাসা করে : আর কি করতা?[১৫৭]

আর কি করতো বছির তা বলতে পারে না। গানের ভাষায় বলে—

> বছির : জলের ঘাটে হইল দেখা তোমার সনে আমার সনে,
> হলুদ বরণী মেয়ে তুমি হবে আমার বিয়ের কনে।
> কলমী ফুলের নোলক দিব হিজল ফুলের দিব মালা,
> মাঠের বাঁশী বজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব গাঁয়ের বালা।
> কাজল তলার হাটে যেয়ে আনব পাটের শাড়ী,
> ওগো বালা, গাঁয়ের বালা। যাবে তুমি আমার বাড়ী?

---

১৫৫. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ.১১৭
১৫৬. জসীমউদ্‌দীন, বাদল বাঁশী, পল্লীবধূ গ্রন্থের সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬, ৫ম সংস্করণ ১৯৯৩, পৃ.৬১
১৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

বড়ু : আমি ত অবলা নারীরে বন্ধু পরের অধীন ঘর,
অভাগীরে কেন দিলা বন্ধু তোমার অন্তর।[১৫৮]

গান গেয়েই উভয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করে। তারপর বড়ুর অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়ে যায়, সমাজের বিধানকে সে নিরবে মেনে নেয়। গভীর রাতে গ্রামের বটতলায় বসে, বছির বাঁশীতে করুণ রাগিনী তোলে, সেই সুর মূর্চ্ছনায় উন্মাদিনী প্রায় বড়ু বছিরের কাছে চলে আসে। এই করুণ রাগিনী সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, বছিরের কাছে সে বাঁশিটি চায়—

বড়ু : তোমার ওই হাতের বাঁশীডা আমারে দিবা? তোমার ওই বাঁশী যহন নিশাল রাত্রিতে কানতে থাহে, তহন আমি সইবার পারি না।

বছির : কিন্তু আমার বাঁশী তোরে দিলি আমি কি লয়া থাকব? গহন রাত্তিরে আমার একলার দুক্কু যহন পরাণে মানে না, তহন ওই বাঁশীর সঙ্গে আমার মনের কতা কই। ওই বাঁশী যদি তুই নিয়া যাবি তয় আমার মনের কতা আমি কার সঙ্গে কব? কার কাছে আমার দুক্‌খির কতা জানাব?[১৫৯]

দু'জনেই দু'জনকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, সমাজের নিষ্ঠুর বিধানে কেউ কারো মনের কথা প্রকাশ করতে পারেনি। ভালোবেসে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে তবুও মনোবেদনা কাউকে জানাতে পারেনি। বছিরকে ভালোবেসে অন্য একজনের ঘর করতে হবে—

বড়ু : ...একজনারে পরাণ দিয়া আরেক জনের সঙ্গে গর করতে ঐব। যে পরাণ তোমারে জনমের মত সইপ্যা দিচ্ছিলাম সেই পরাণ অন্যেরে দিতে ঐব। বুকের মদ্দি কান্না চাপায়া অন্যের সঙ্গে হাসি রঙ্গ করতি ঐব।[১৬০]

বড়ু সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে যাকে ভালোবেসেছে, তাকে এহকালে না পেলেও পরকালে পাবার আশায় বুক বেঁধে রইল। বছিরকে তার স্মৃতি ভুলে সংসারী হওয়ার জন্য মিনতি করে। তার স্মৃতিকে চিরদিন ধরে রাখার বাসনায় বছিরের বাঁশিটি সে দাবি করে। বছির ভালোবাসার টানে তার একান্ত আপন জনের এ দাবি রক্ষা করতে পারে না।

'বাদল বাঁশী' একাঙ্কিকাতে দুটি হৃদয়ের বেদনা বিধূর রূপ অঙ্কিত হয়েছে, এখানে কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। তবে সাধারণ লোককাহিনীর পটভূমিতে মানুষের হৃদয় বেদনা, প্রেম-ভালোবাসার চিত্র অঙ্কনে নাট্যকার দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। চরিত্র সংখ্যা সীমিত তবে গতিশীল। সংলাপ গ্রাম্যভাষায় রচিত। বড়ু-বছিরের প্রেম শ্রীকৃষ্ণ-রাধার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

---

১৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
১৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
১৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯

'করিম খাঁর বাড়ী' একাঙ্কিকাটি জীবন্তিকা ধরনের রচনা। এতে মাত্র ৩টি চরিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে—মাতবর, মৌলবী, করিম খাঁর মেয়ে, চরিত্রগুলোর কোন নামকরণ করা হয়নি। প্রতিটি চরিত্রই রূপকধর্মী—মাতবর সাহেব কল্যাণ ও মানবধর্মের ধারক ও বাহক, করিম খাঁর পরিবার আর্ত-মানবতার প্রতীক, মৌলবী সাহেব কুসংস্কারগ্রস্ত অবাস্তব চিন্তা চেতনার প্রতীক।

মাতবর সাহেব গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার ব্যবস্থা নিচ্ছেন এমন সময় মৌলবী সাহেব তার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে একটি দুম্বা কোরবাণী দেবার জন্য আবেদন জানালেন এবং তার স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলেন। আকস্মিকভাবে করিম খাঁর মেয়ে এসে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয় এবং আগুনে পুড়ে তাদের সর্বস্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে সেটি জানায়। তার পিতা করিম খাঁও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। মৌলবী সাহেব মাতবরকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। মাতবর সাহেব তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে করিম খাঁর মেয়েটিকে বললেন—

> মাতবর : ...আমি হজের নামাজ পড়ব এবার এই করিম খাঁর বাড়ি। আমার হজে যাওয়ার প্রত্যেকটি টাকা দিয়ে আমি আবার নতুন করে করিম খাঁর বাড়ি গড়ে দিব। খুকি। শোন ! তোর আব্বা মরে গেছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কিন্তু তোর আব্বার কাছে তুই যে আদর-যত্ন পেতিস আমি তোকে সেই আদর-যত্ন দেব, তোর মাকে বলিস, আল্লা তোদের কথা শুনেছেন, আর তোদের কোন দুঃখ থাকবে না। হজের টাকা দিয়ে এবার আল্লা তোদের ঘর বেঁধে দেবেন।[১৬১]

একাঙ্কিকাটির মধ্য দিয়ে মানবীয় আদর্শের প্রচার করা হয়েছে, মানবতার ধর্মই পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম।

২০

'অগ্নিগিরি' নাটকে আসকার ইবনে শাইখ দেশের জনগণকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিদেশী শক্তির অত্যাচার মোকাবেলা করতে কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ঘটে এবং তারা ইংরেজ শাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বিদ্রোহী বাহিনী গড়ে তোলেন। উত্তরবঙ্গের এমনি একটি বিদ্রোহী মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফকির মজনু শাহ। এ পর্যায়ে আসকার ইবনে শাইখের অগ্নিগিরি আমাদের মুক্তি সংগ্রামের এক অধ্যায় অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুসরণ করেছেন।[১৬২]

---

১৬১. **জসীমউদ্‌দীন—করিম খাঁর বাড়ী, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬, ৫ম সংস্করণ ১৯৯৩, পৃ. ৭৭**

১৬২. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৫১

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ শাসক হেস্টিংস-এর শাসনামলে কোম্পানি প্রতিনিধি দেবীসিংহ খাজনা আদায়ের নামে রংপুর-দিনাজপুরের কৃষককুলের উপর চালিয়েছে বর্বরোচিত নৃশংস অত্যাচার। দেবীসিংহের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফকির মজনু শাহ'র নেতৃত্বে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। মজনু শাহ'র সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন—দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক ও রাণী ভবানী। এরা সমবেতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। নাট্যকার পাকিস্তানি শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে দূর অতীতের গৌরব গাঁথাকে স্মরণ করেছেন—'অগ্নিগিরি' নাটকে।

১১৭৬-এর ভয়াবহ মন্বন্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাট্যকাহিনীর পট-উন্মোচিত হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষে প্রজাগণ সবকিছু খুইয়ে সর্বশ্রান্ত হয়, এই সময় দেবীসিংহ খাজনার জন্য মানুষের উপর চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রজাদের মধ্যেও জাগে বিদ্রোহের আগুন—

> রহমান : লোকের হাতে টাকা নেই। কোন রকমে বেঁচে আছে। খাজনার টাকা কি করে জোগাড় করবে?
>
> আখন : খাজনা? কার খাজনা কে নেয়? বাদশাহ শা' আলমের সনদ বলে বাংলার সুবাদার মজনু শাহ্। তিনি খাজনা নিচ্ছেন না, নিচ্ছে কোথাকার দেবী সিংহ? কিসের খাজনা? তোমরা সবাই বল, খাজনা আমরা দেব না। ব্যাস।[১৬৩]

দেওয়ান দেবীসিংহ আসে লোকজন পাইক বরকন্দাজ নিয়ে খাজনা আদায় করতে। প্রজার উপর অমানুষিক নির্যাতন করে সে খাজনা আদায় করে আর সুখের ঘর ভেঙ্গে বাঙালির স্ত্রী কন্যা ধরে এনে সাহেবদের লালসায় আহুতি দেয় টাকার লোভে। সে অর্থগৃধ্নু, যে কোন মূল্যে সে টাকা চায়। সে প্রজা সমক্ষে ঘোষণা করে—

> যারা খাজনা দিতে না পারবে, তাদের প্রতি দুজনকে শিকলে বেঁধে পা'গুলো উর্ধ্বমুখে আর মস্তক অধোমুখে স্থাপন করে গাছের সঙ্গে বন্ধন করবে। তারপর করবে বেত্রাঘাত। মুখমণ্ডল থেকে রক্ত নির্গত না হওয়া পর্যন্ত ছেড়ো না। খাজনা দেওয়ার স্বীকৃতি তাতেও না পেলে বেতের পরিবর্তে কন্টকপূর্ণ বিল্ব শাখা ব্যবহার করবে। তারপর প্রয়োজন হলে ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গে বিছুটির আঘাত করবে। হ্যাঁ, এ শাস্তি প্রকাশ্যেই হওয়া উচিৎ।[১৬৪]

নাট্যকারের এই উক্তি ঐতিহাসিকের উক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র—

> নৃশংস দেবীসিংহের অত্যাচারে সমগ্র উত্তরবঙ্গ হাহাকার ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি প্রদেশ মহাশ্মশানে পরিণত হয়। কোম্পানীর রাজত্বারম্ভে বাংলাদেশে যে মূর্তিমতী অরাজকতা দেখা দেয়,

---

১৬৩. ঢাকা থেকে সাতরং প্রকাশনী ১৯৫৯ (১৩৬৬) সালে নাটকটি প্রকাশ করে। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নাটকটি প্রথম প্রচারিত হয়। বিশ্ববিদ্যলয় ইকবাল হল ছাত্র সংসদ ১৯৫৭ সালের ১৫ই নভেম্বর কার্জন হলে প্রথম অগ্নিগিরি মঞ্চায়িত করে। আবিদ আজাদ ও মাহবুব হাসান সম্পাদিত, আসকার রচনাবলীতে (৩য় খণ্ড) 'অগ্নিগিরি' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ১৭৫

১৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

দেবীসিংহের অত্যাচার তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। হেস্টিংসের যতগুলি প্রিয়পাত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ এমন পিশাচ প্রকৃতির পরিচয় দান করেন নাই। ...এই সময় রঙ্গপুর অঞ্চলে কতকগুলি রাক্ষস প্রকৃতির কুসীদজীবী বাস করিতেছিল... সেই সমস্ত কুসীদজীবী বিপন্ন কৃষকদের নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ছয়শত টাকা সুদ আদায় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল।[১৬৫]

দেবী সিংহের পাইকবর্গ নিরীহ প্রজাগণের অঙ্গুলিতে রজ্জু বন্ধন করিয়া ক্রমাগত পাক দিতে দিতে অঙ্গুলিগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত এবং তাহারা যখন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত সেই সময় হাতুড়ির দ্বারা তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া একেবারে অকর্মণ্য করিয়া দিত। গ্রামের মন্ডল, পঞ্চায়েৎ ও অন্যান্য প্রধানবর্গের দুই দুইজনকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া পদদ্বয় ঊর্ধ্বমুখে ও মস্তক অধোমুখে লম্বমান করিয়া পদতলে বেত্রাঘাত করিতে করিতে, অঙ্গুলি হইতে নখগুলি বিচ্যুত করিয়া দিত। অবশেষে মস্তকে আঘাত করিয়া মুখ, চক্ষু ও নাসিকা হইতে রুধির বহির্গত না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। বেত বা লাঠির দ্বারা যদি পদে অধিক কষ্টবোধ না করে, এই ভাবিয়া সেই কৃতান্তের অনুচরেরা কণ্টকপূর্ণ বিল্বশাখা দ্বারা তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আরও ক্ষত-বিক্ষত করিত, তাহার উপর বিছুটির আঘাত করিয়া অপরিসীম যন্ত্রণায় তাহাদিগকে মৃতকল্প করিয়া তুলিত।[১৬৬]...

মজনু শাহ দেশের হিন্দু-মুসলমানকে দেশের দুশমনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ নিতে আহ্বান জানান। অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণকে প্রতিবাদী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন—

মজনু॥ প্রয়োজনে জালিমকে মেরে ফেলতে হবে। ...তোমাদের ইজ্জত, মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে আজ তোমরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। ... এদেশ আমার, এদেশ তোমার। তোমার আমার পূর্ণ অধিকার এ দেশের মাটিতে। সে অধিকার হারিয়ে আমরা আজ মরতে বসেছি। মরবার আগে তাই চেষ্টা করে দেখি, দেবীর উন্নত শির মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি কিনা।[১৬৭]

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সিপাহীর অনুসারীদের হাতে কোম্পানির সেনাপতি ক্যাপ্টেন ব্রেনান নিহত হন। এই সংঘর্ষে মজনু শাহ-ও নিহত হন শত্রুদের গুলিতে, কিন্তু বিপ্লবের বীজ বুনে যান তিনি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মজনু উচ্চারণ করলেন—

মজনু॥ পরাস্ত আমরা কোনদিন হব না। গড় থেকে গড়ে, গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গড়ে উঠবে আমাদের এমনি প্রতিরোধ ব্যবস্থা। জন্মভূমিকে আমরা বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করব, এই আমাদের পণ। কাসেম

---

১৬৫. মূল তথ্য, নিখিল নাথ, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, সংগ্রহ , আসকার রচনাবলী (আমার বক্তব্য), পৃ. ১৬৩-৬৪
১৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩-৬৪
১৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

Dhaka University Institutional Repository

রহমান দেবু! বিপ্লবের অগ্নিবীণা ছড়িয়ে দাও প্রতিটি ঘরে। এ মহান কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিতে প্রতিটি মানুষকে আহ্বান জানাও।

....

রুদ্ধ আক্রোশে ওদের ওপর ছড়িয়ে পড়বে। ওরা এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এদেশ আবার মুক্ত হবে। সেদিন বেশি দূরে নয়। আজ না হোক, কাল... সেই স্বর্ণ প্রভাতে আমার দেশ আবার হেসে উঠবে।[১৬৮]

মজনু শাহ'র সংগ্রাম ছিল নিপীড়িত জনতার সংগ্রাম, লাঞ্ছিত মানবতাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই নাটকের সবচেয়ে উজ্জ্বল সৃষ্টি দিলারা। সে একজন প্রেমিকা, স্ত্রী, সর্বোপরি—চিরন্তন শাশ্বত এক নারী। প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হয়ে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে চুরে চুরমার হয়ে গেছে, তবু বিদ্রোহী দিলারার অবচেতন মাতৃত্ব বারবার জেগে উঠেছে, তার স্বপ্ন ছিল একটি ছোট্ট ঘর, বাগান, এক চিলতে উঠোন--উঠোনে খেলবে ছোট্ট একটি শিশু—ডাকবে 'মা' বলে। দেবী সিংহের মা ডাক শুনে দিলারার সুপ্ত মাতৃত্ব জেগে ওঠে—

দিলারা॥ শিশুকণ্ঠের ...ডাক নারীর মনকে বেহেশ্‌তের সুষমায় ভরে দেয়, ...ঘুমন্ত রাক্ষসীর ঘুম...এতে ভেঙ্গে যায়। ...ছোট শিশু, সাজানো ঘর, ফুল ফুটানো ঘরের আঙিনা। সন্ধ্যা-সকালে দু'বেলা ধুয়ে মুছে রাখব আঙিনা। দিনমান ভরে খেলা করবে সেই ছোট্ট শিশু। আধকণ্ঠে ডেকে উঠবে 'মা'। ...আপনি কেন মা ডাকবেন আমাকে।[১৬৯]

নাট্যকার উপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য দেশের মানুষকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। অতীত বাঙলার গণ অভ্যুত্থানের কাহিনী রোমন্থন করে তৎকালীন পূর্ব বাঙলার জনসাধারণকে সংঘবদ্ধভাবে পাক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবরোধ গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছেন। দয়ালের সংলাপ নাট্যকারের সেই চেতনারই পরিচায়ক—

দয়াল॥ পলাশী-প্রান্তরে সেদিন আমরা সে সুখ শান্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছি। পলাশীর সেই নিমকহারামীর পাপে বাংলা ছারখার হয়ে গেল।[১৭০]

---

১৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭
১৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫
১৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

'অগ্নিগিরি' ঐতিহাসিক নাটক হলেও নাট্যকারের ইতিহাস-চেতনা এখানে ক্রিয়াশীল নয়, ইতিহাসকে সামনে রেখে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। আসকার ইবনে শাইখের অগ্নিগিরি আঙ্গিকে না হলেও চেতনাগত দিক থেকে নতুনত্বের দাবিদার। নাটকটি সম্পর্কে পত্রিকায় লেখা হয় :

> ...নাটক শেষ হয়েছে এক চরম আশাবাদের মধ্যে। জীর্ণ ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে এগিয়ে গিয়ে নাট্যকার আমিনার মালঞ্চে ফুল ফোটাবার দায়িত্বে আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা : It is not the hero, not the personality but the people, who are the moving force of history.[১৭১]

আসকার ইবনে শাইখের 'অগ্নিগিরি' সার্থক নাটক।

২১

আসকার ইবনে শাইখের 'অনুবর্তন' নাটকে অঙ্কিত হয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনালেখ্য। এই পরিবারের প্রধান আজমত আলী একজন দরিদ্র কেরাণী, তিনটি ছেলে মেয়েসহ অনেকগুলো পোষ্য বিশিষ্ট সংসার, খুব অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে তাদের দিন অতিবাহিত হয়। বড় ছেলে শাহরিয়ার কলেজে পড়ে, মেয়েটি বিবাহযোগ্য, তার লেখাপড়া অষ্টম শ্রেণীর বেশি এগোনো সম্ভব হয়নি, ছোট ছেলে ফেদু স্কুলে যায়, তার উপর জুটেছে ভবঘুরে শ্যালক তারা। আজমত আলীর কাশিটা বেড়েছে—লোকে কানাঘুষা করে যক্ষ্মা বলে—ছোট ছেলে ফেদু তা' শুনে মাকে জানায়।

বড় মেয়ে নাহারের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে অথচ বিয়ে দিতে পারছেন না, 'দু'তিন বছর ধরে সমানে চেষ্টা করেছি, কিন্তু হোপলেস।'[১৭২] নাহারের বিয়ের একটি সম্বন্ধ এসেছে, সালেহার মামাতো ভাইয়ের সম্বন্ধী হামিদ সাহেব তার আই.এ. পাস ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে এসেছিলেন পাশের কোন মহল্লায়, সেখানে মেয়ে পছন্দ না হওয়ায় মালেকার চাপে আজমত আলী তাকে দাওয়াত করে এসেছেন তাদের মেয়ে দেখার জন্য, যদি পছন্দ হয় এই আশায়। তারা এসে নাহারের চুল, আঙ্গুল, দাঁত সব দেখে শুনে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে গেলেন, কিন্তু বিয়ে হলো না। পাশের বাড়ির জামান তাকে ভালোবাসে, তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, তবে বিয়ের কথায় সে পিছিয়ে আসে—

400473

> জামাল॥ অস্পষ্টভাবে হলেও আমার মনের কথা তোমার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু তোমার মনের কথা রয়ে গেল অজানার অন্ধকারে। আজ জানতে চাই, তুমি আমাকে ভালবাস কিনা।

---

১৭১. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ২২ নভেম্বর ১৯৫৭, সংগ্রহ , সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ১৫১

১৭২. আসকার ইবনে শাইখ, অনুবর্তন, ঈসা ব্রাদার্স, ঢাকা থেকে নাটকটি প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করে, ১৯৫৯ (১৩৬৬) সালে। ইকবাল হল ছাত্র সংসদ ১৯৫৮ সালের ১২ ডিসেম্বর কার্জন হল মঞ্চে প্রথম অনুবর্তন মঞ্চায়িত করে। নাটকটি আসকার রচনাবলীতে (২য় খণ্ড) সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অনুবর্তন, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

নাহার॥ অবশ্যই জানাব। কিন্তু তার আগে যদি প্রশ্ন করি যে, উভয়ের ভালবাসার পরও প্রয়োজন বিয়ের, কি উত্তর দেবেন আপনি?

জামাল॥ নিশ্চয়ই হবে আমাদের বিয়ে। স্বপ্নের মিলন বাসর রচনা করব আমরা।

নাহার॥ কিন্তু কখন, কি ভাবে?

জামাল॥ এটা আমার দ্বিতীয় বর্ষ। আরও কয়েক বছর আমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এখন যে আমার বিয়ে করা সম্ভব নয়, তা কি বোঝ না তুমি?

....

নাহার॥ আপনার আব্বাকে দিয়ে আমার আব্বার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন।

জামাল॥ প্রেমের পথ এত নিষ্কন্টক হয় না নাহার। ইচ্ছা থাকলেও মানুষের অনেক সময় উপায় থাকে না। আমি যে নিরুপায় নাহার। আব্বা কিছুতেই রাজী হবে না। লেখাপড়া শেষ হয়নি...[১৭৩]

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শাহরিয়ার ধনীর দুলালী রীনার মনোজয় করলেও বিয়ের প্রস্তাবে সে পিছিয়ে যায়—

শাহ॥ আমাদের বিয়ের কথা?

রীনা॥ এখন সে কথা উঠতেই পারে না। তুমি আগে বড় হও, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। তারপর ভাববার অবসর পাবে।

শাহ॥ যে কথা জানতে এসেছিলাম, তা জানা হয়েছে গেছে। আচ্ছা, আসি।

রীনা॥ কিন্তু গান? পাঠাবে তো?

শাহ॥ দেখ রীনা, প্রেম-প্রেম খেলার জন্য সেখানেও বহু লোক পাবে। আমি এক গরীব কেরানীর ছেলে, আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?[১৭৪]

শাহরিয়ারের মোহ কেটে গেছে, রোগজীর্ণ পিতা, দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসার, বিবাহযোগ্য বোন--যা সে এতদিন উপেক্ষা করেছিল সেই সংসারের দায়িত্বভার সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

'অনুবর্তন' পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট সামাজিক নাটক—এর অঙ্কগুলোতে কোন দৃশ্যভাগ পরিলক্ষিত হয়নি। কেবলমাত্র তৃতীয় অঙ্কে 'আর একদিন', 'আর এক রাত্রি' এবং 'ভোর' বলে দৃশ্য বিভাগ করা হয়েছে। এই নাটকটির সেট বা

---

১৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪
১৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্য পরিকল্পনা এত সহজ যে অঙ্কান্তরে কোন বিরতির প্রয়োজন হয় না—ছায়াচিত্রের মত চলতে থাকবে অঙ্ক থেকে অঙ্কে।[১৭৫]

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাজের সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা। এই অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে সমাজে শ্রেণীবিন্যাস প্রথা। একদল ধনী বা বুর্জোয়া শ্রেণী, অন্যদল নিঃস্ব বা পলিটারিয়েট। এই দুয়ের মাঝখানে যে শ্রেণীটি অবস্থান করছে সেটিই সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীও তিনটি পর্যায়ভুক্ত—উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। অনুবর্তন নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে । নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের বাসিন্দা স্বল্প বেতনের চাকুরিজীবী আজমত আলী ও তার সংসারের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনচিত্র বাস্তব সমাজ সংসারের প্রতিচ্ছবি। কন্যাদায়গ্রস্ত জননীর করুণাবস্থাও নাট্যকার সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন।

'অনুবর্তন' নাটকে শাহরিয়ারকে দিয়ে নাট্যকার সুকৌশলে কমিউনিজমের আদর্শ প্রচার করেছেন। তরুণ সমাজ পাকিস্তানের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বিরাজমান প্রকৃত পরিস্থিতি মেনে নিতে চায়নি। অনুবর্তনের শাহরিয়ার বৃদ্ধ পিতা আজমত আলীর কেরানীর চাকুরির বদলে সে প্রাইভেট টিউশনি করে অভাবগ্রস্ত পরিবারটি রক্ষা করতে যাচ্ছে। পিতার ব্যবহৃত পুরোনো ছাতাটিও সে রোদ নিবারণে ব্যবহার করতে রাজি হয়নি। পিতার জীবনপ্রবাহ তার জীবনে অনুবর্তিত হোক সেটা সে চায় না। এটাই ছিল সেদিনকার সেই শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্তদের প্রকৃত অবস্থার প্রেক্ষাপটে নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনার উত্তোরণের ক্রান্তিকাল।

কাহিনী গ্রন্থনা, চরিত্র চিত্রণ, নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি ও সংলাপ রচনার দক্ষতায় অনুবর্তন আধুনিক মানসিকতার দ্বন্দ্বমুখর নাটক। নাটকটি ট্রাজেডি বা কমেডি কোনটির পর্যায়েই পড়ে না। আজমত আলীর সংসার, নাহার জামাল সম্পর্ক ও রীনা-শাহরিয়ারের প্রেম—এই তিনটি বিষয় নিয়ে নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। কাহিনী বিন্যাসে অভিনবত্ব না থাকলেও মধ্যবিত্ত জীবনের করুণ রেখাচিত্র অঙ্কনে নাট্যকার সার্থকতা অর্জন করেছেন।

২২

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। আধুনিকতার নামে উৎকট কৃত্রিমতা ভোগ সর্বস্বতা সমাজকে অবিলতায় ভরে দিয়েছিল--উচ্চ শিক্ষিত নর-নারীদের নৈতিকতাহীন কার্যকলাপ, ভোগলিপ্সা সমাজ ও জীবনকে ক্রমাগত অসুখী করে তুলেছিল—নামিয়ে দিয়েছিল অধঃপতনের

১৭৫. মোহাম্মদ মজির উদ্দীন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, পৃ. ৫০৬

Dhaka University Institutional Repository

পঙ্কে। সহজ জীবনের সার্থক, সুন্দর ও কল্যাণের অভিসারী নাট্যকারদের পীড়িত করেছিল তথাকথিত আধুনিকতা। মদ্যপান, উৎকট সাজ-সজ্জা, শালীনতাবোধহীন চালচলন, আভিজাত্যের কৃত্রিমতা এবং বস্তুভারে আধুনিক সমাজপীড়িত। এই তথাকথিত আধুনিকতা এবং অহমিকাপূর্ণ বিলাসী জীবনের স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াসে নাট্যকার আ.ন.ম. বজলুর রশীদ লিখেছেন 'ঝড়ের পাখি'।

আধুনিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছৃঙ্খলতা, উৎকট বস্তুবাদ, কৃত্রিমতা ও বিলাস-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'ঝড়ের পাখি' নাটকে। রুবি তার একমাত্র ভাই আদর্শবাদী হার্টস্পেশালিস্ট ও বিলাত ফেরত ডাক্তার শরীফের বিয়ে দিয়েছে তথাকথিত সোসাইটি গার্ল মীনার সঙ্গে। বাসররাতেই দুই ব্যক্তিত্বের প্রবল সংঘাতে বাসর-স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে গেল। মীনার কৃত্রিম বেশবাস তার অপছন্দ, তার মতে—

মীনা - সুন্দরকে সুন্দর করায় কি কোন সার্থকতা নেই?

শরীফ - আছে, কিন্তু এমন কৃত্রিম উপায়ে নয়। বিশেষ করে, তোমাদের অতি আধুনিকাদের সুন্দর হবার এই প্রাণপণ নির্লজ্জ চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যকার, রুচিতে বাধে।

মীনা - আপনার রুচিই যে একমাত্র সুন্দর ও সত্য তাই কে বলবে?

শরীফ - সে গর্ব আমার নেই। আমি মনে করি, রুজ-পাউডার লিপ্স্টিক মেয়েদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাভাবিক প্রকাশকে নীরস ও প্রাণহীন করে তোলে।[১৭৬]

মীনাও নিজের স্বাধীনসত্তা এবং রুচিবোধের অনুকূলে তার পছন্দনীয় পুরুষের পরিচয় তুলে ধরলো—

মীনা - তোমার এই উদ্ভট রুচিবোধকে আমিও মানিনে।

শরীফ - উদ্ভট? আমার রুচিবোধ উদ্ভট?

মীনা - বই কি? যে পুরুষ সিগারেট খায় না, ক্লাবে যায় না, ব্রিজ খেলে না, লিপ্স্টিকের মর্ম বোঝে না, আধুনিক রুচি ও এটিকেটের মাপকাঠিতে সে পুরুষ পুরুষই নয়।[১৭৭]

আধুনিক রুচি ও এটিকেট সম্পন্ন কালচার্ড মেয়ে মীনা বাসররাতেই স্বামীর ঘর ত্যাগ করে চলে যায়, পান আর ভোগসর্বস্ব বন্ধু রউফের কাছে। তাকে বলে—

> ...আই পিন মাই ফেইথ অন ইওর ওয়ার্ড তোমার ভরসাতেই শেকল ছিঁড়ে চলে এসেছি। তুমি কথা দিয়েছ, ভুলে যাবে না বলে।[১৭৮]

---

১৭৬. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, ঝড়ের পাখি, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯, পৃ. ৩৮
১৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
১৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

নারী সৌন্দর্য পিপাসু রউফ শুধু মিনাকেই নয়, এভাবে অনেক মেয়েকেই সে কথা দিয়েছে, তাদের সর্বনাশ করেছে। আধুনিক উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগসর্বস্ব জীবনধারার মূর্ত প্রতীক সে। 'মীনা' বিদায় নিয়ে চলে যেতেই মিসেস লিলি এসেছে। কুরুচিপূর্ণ ও উৎকট সজ্জায় সজ্জিতা লিলি শরীফের কাছে বললো—

লিলি - ...আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। আই ওয়ান্ট ইউ, অ্যান্ড আই মাস্ট হ্যাভ ইউ।

রউফ - হাউ ডিয়ারিং। কিন্তু সাহেব কি রাজী হবেন? গোয়ার মানুষ।

লিলি - আমি ভয় করিনে। আমাকে ইলপ করে নিয়ে চলো।[১৭৯]

মীনার ফেলে যাওয়া ব্যাগের সন্ধানে ফিরে আসতেই আড়াল থেকে রউফ লিলির কুরুচিপূর্ণ অসংযত সংলাপে তার বিবেক জাগ্রত হয়। এই সময় লিলির স্বামী রিভলবার হাতে ছুটে এসেছে, মীনাও লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে শরীফের কাছে ফিরে গেল—শরীফ তাকে ক্ষমা আর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছে।

নাটকটিতে কোন অঙ্ক বিভাগ নেই, পাঁচটি দৃশ্য সংযোজনের মধ্য দিয়ে নাটকের বৃত্তগঠন হয়েছে। আলোচ্য নাটকটি সমাজ-জীবন সম্পর্কে নাট্যকারের সুতীক্ষ্ণ চিন্তা-চেতনারই ফসল। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিকে লেখক চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—

মীনা - যে কালচারের গর্ব করেছি, তার বীভৎস রূপ চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

রউফ - ...জেনেশুনেই এ পথে পা বাড়িয়েছ। এ জীবনে তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই—আছে শুধু বাইরের চাকচিক্য, চাঞ্চল্য আর জোর করে চলার নেশা।[১৮০]

আধুনিক সভ্যতার অন্ধকার দিনগুলোর প্রতি কটাক্ষপাত করে 'ঝড়ের পাখি' নাটকটি রচিত এবং সুন্দর সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে। নাটকটিতে সামাজিক সমস্যার চিত্র অঙ্কিত হলেও শিল্পকুশলী উপস্থাপনা সম্ভব হয়নি। বিষয়বস্তু নির্বাচনে অসামঞ্জস্য, চরিত্র সৃষ্টির অনৈক্য চক্ষুকে পীড়া দেয়। তবে নাটকে উৎকট বস্তুবাদ, আধুনিকতার নামে উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণ ও বাস্তব সমস্যার সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে নাট্যকারের কৃতিত্ব বর্তমান।[১৮১]

---

১৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১
১৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
১৮১. সৈয়দা খালেদা জাহান, পূর্ববাঙলার নাটক ও বাঙালি সমাজ, এম.এ. শেষ বর্ষ (থিসিস) পাণ্ডুলিপি ১৯৭৮, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

২৩

মরক্কোর জাদুকর'[১৮২] আলাদ্দিন আল আজাদের একটি রূপক নাটক। মূলত ছোটদের জন্য লিখলেও নাটকে বড়দের আনন্দ ও চিন্তার খোরাক বর্তমান।[১৮৩] 'মরক্কোর জাদুকর' প্রস্তাবনা, প্রথম অঙ্কে তিনটি, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি এবং চতুর্থ অঙ্কে চারটি দৃশ্য সমন্বয়ে রচিত। নাট্যকাহিনীর বৃত্তগঠন প্রসঙ্গ নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্য—

> আরব্য উপন্যাসের বিশ্ববিশ্রুত কাহিনী আলাদ্দিন ও তার আশ্চর্য প্রদীপেই মরক্কোর জাদুকরের বিচরণ। কিন্তু এ সেই পরিচিত কাহিনীর বিবৃত্তি মাত্র নয় ; এখানে পুরাতন উপাখ্যান একটি অতি আধুনিক রূপকে মণ্ডিত এবং আখ্যায়িকার যে সকল সন্ধিতে পুরাতনকে অতিক্রমের চেষ্টা আছে, সেখানেই এই নাটকের অভিনবত্ব।[১৮৪]

'মরক্কোর জাদুকর' নাটকে লেখক প্রাচীন লোক-কাহিনীর পটভূমিতে সমকালীন সমাজব্যবস্থার রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। এই কাহিনীর অবয়ব নির্মাণে তিনি প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলাদ্দিন সত্য, সুন্দর আর কল্যাণের প্রতীক এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব, জাদুকর অসৎ, স্বার্থপর আর জড়বাদী চরিত্র হিসাবে কল্পিত। যে বাতিটি, যাকে ঘিরে এই নাটকের বৃত্তায়ণ সে সম্পর্কে জাদুকরের নিজস্ব বক্তব্য—

> ...এই বাতি সকল শক্তির উৎস। অনন্ত সৃষ্টির সকল রহস্য রূপকথায় সোনার কাঠির মত ছোঁয়ায় সে উন্মোচন করে দিতে পারে। এই বাতি যার হাতে থাকবে সে শুধু পৃথিবীর নয়, সমস্ত জগতের অধীশ্বর।[১৮৫]

'মরক্কোর জাদুকর' জাদুবিদ্যার কৌশলে জানতে পারে যে মুস্তফা দর্জির পুত্র আলাদ্দিন এই অলৌকিক শক্তিধর বাতির মালিক হবে। সে সুকৌশলে আলাদ্দিনকে ফাঁকি দিয়ে বাতিটি হস্তগত করতে চায়। কিন্তু তার সমস্ত কলাকৌশল ব্যর্থ হয়, আলাদ্দিন বাতির মালিক হয়ে যায়। বাতির কল্যাণে তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। সৎ, দেশপ্রেমিক আদর্শ আলাদ্দিনকে দেশের জনসাধারণ তাদের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সুলতান তার বংশগরিমা, খান্দানের অহংবোধ ত্যাগ করে মুস্তফা দর্জির পুত্র আলাদ্দিনের সঙ্গে একমাত্র কন্যার বিবাহ দেন এবং রাজ্য শাসনভার তার হাতে তুলে দেন—

> সুলতান : ...মানুষ নামই মানুষের মর্যাদা এবং যেখানে একের সঙ্গে অন্যের বিশেষ প্রভেদ নেই। মানুষের মধ্যে নানারকম বৈষম্যের সৃষ্টি করে আমরা যে অপরাধ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করার দিন এসেছে, স্বেচ্ছায় করলে

---

১৮২. আলাউদ্দিন আল আজাদ, মরক্কোর জাদুকর, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ, জয়নাল আবেদীন প্যানটোমাইম সাহিত্য ভবন ঢাকা থেকে নাটকটি প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে শ্রেষ্ঠ নাটক নাম দিয়ে নাটকগুলি একত্রিত করে প্রকাশ করা হয়।

১৮৩. ভূমিকা, দ্রষ্টব্য, শ্রেষ্ঠ নাটক

১৮৪. নিবেদন, মরক্কোর জাদুকর

১৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

> ভালো, না করলে আমাদেরই ক্ষতি। কারণ পতিত যারা তারা এখন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবেই।... পরবর্তী শাসন পরিচালক হওয়ার জন্য এই রাজ্যের যে কেউ প্রার্থী হতে পারে। সার্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে রাষ্ট্র নেতা ও তার পরিষদ নির্বাচিত হবে।[১৮৬]

সুলতানের এই সংলাপের মধ্য দিয়ে মূলত নাট্যকারের চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। সমকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি তার মতামত প্রকাশ করেছেন। অবরুদ্ধ সময়, পরিবেশে অবস্থান করেও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিরুদ্ধ পরিবেশে অবস্থান করে আলাদ্দিনের মত সুযোগ্য, দেশপ্রেমিক নাষ্ট্রনায়ক তার অন্তর্লোকে কাম্য ছিল। আলাদ্দিনের মুখেই তার প্রতিধ্বনি শোনায় যায়—

> ...আজকের এই দিনটি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবার যোগ্য এবং তা থাকবেও কারণ এইদিনে আমরা পৃথিবীতে এক নবযুগ সৃষ্টির পথে পা দিয়েছি। সে যুগ স্বাধীনতার যুগ, সাম্যের যুগ, শান্তির যুগ। সৃষ্টি, প্রাচুর্য আর আনন্দই হবে এর মূলমন্ত্র।...সাম্য, সংঘ ও স্বাধীনতা এই তিন আমাদের নব রাষ্ট্রের তিন প্রধান স্তম্ভ। এবং সেজন্যই, রাষ্ট্র কখনো সুস্থ ব্যক্তি-সত্তাকে বিপর্যস্ত করবে না। বরং উল্টোভাবে ব্যক্তি-প্রতিভা স্ফূরণের সকল সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত করে দেবে। এর মধ্য দিয়ে জন্ম নেবে যে মানুষ, তার নামই আলোক-মানব, আগামী বিশ্বের কর্ণধার।[১৮৭]

প্রতিহিংসা পরায়ণ জাদুকর কৌশলে আলাদ্দিনের স্ত্রীর নিকট থেকে বাতিটি হস্তগত করে। প্রদীপের সাহায্যে জাদুকর রাজকুমারীকে রাজ প্রাসাদসহ অপহরণ করে। সুলতান আলাদ্দিনের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করার আদেশ দেন, সে প্রাণভিক্ষা নিয়ে কৌশলে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে এবং জাদুকরকে বন্দি করে। সত্য-সুন্দরের প্রতীক আলাদ্দিন জাদুকরকে ফাঁসির হুকুম দেয়—

> আলাদ্দিন : একে ফাঁসী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই হিংসা দ্বেষ, অত্যাচার অনাচারপূর্ণ পৃথিবীতে হবে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও শান্তির মহাযুগের শুভ অভ্যুদয়।
>
> জাদুকর : ...আমাকে ফাঁসি দেবে। আমাকে ফাঁসি দেবে। আমাকে মারবে। তোমার মগজ আছে, আলাদ্দিন, হৃদয়ও আছে ; কিন্তু তবু তুমি এত বোকা, জানতাম না, আমাকে মারবে। সভ্যতার শুরু থেকে আমি আছি, আর আমাকে দেবে ফাঁসি ! তোমরা জাননা, আমি রক্তবীজ ! একবার মরলে শতবার জন্মাই আমি অমর, অবিনশ্বর। সর্বকালে সর্বদেশে নানাবেশে নানারূপে আমি বেঁচে থাকি। আমাকে ফাঁসি দেবে। আমাকে মারবে।[১৮৮]

---

১৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
১৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১-৭২
১৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

জাদুকরকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হয়নি। সে জিঞ্জির খুলে পালাতে সক্ষম হয়। আলাদ্দিন জনতাকে হতাশ না হয়ে এদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছে—

আলাদ্দিন।। বন্ধুগণ ! ভয় পাবেন না, নিরাশ হবেন না, চিন্তার কোন কারণ নেই। জাদুকর বেঁচে থাকছে, তার মানে হল আমরা হব আরও সতর্ক। হবো নির্ভীক সৈনিক। যে ছদ্মবেশেই থাকুক না, আমাদের চোখে ওর কারচুপি ধরা পড়বেই। আমাদের সৃষ্টি ও অগ্রগতিকে সে কিছুতেই রোধ করতে পারবে না, দরকার হলে আমরা আমাদের শান্তি ও স্বাধীনতার বৃক্ষকে নিজেদের রক্ত ঢেলেও সঞ্জীবিত রাখব। আজ থেকে আমরা তার বিরুদ্ধে এক অবিচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রাম ঘোষণা করলাম।[১৮৯]

জাদুকরের রূপকে জড় স্বার্থবাদী স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। সমাজের স্বার্থপর কুচক্রীদল সর্বকালে সর্বদেশেই সত্যসুন্দর কল্যাণকামী মানুষের বিরুদ্ধে শক্তি হিসাবে কাজ করে যায়। কিন্তু ন্যায় আর আদর্শের সত্য সৈনিকেরা এর বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে টিকে থাকে। জাদুকররূপী সমাজের একদল অশুভ শক্তি সাধারণ মানুষের সুন্দর, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করে আসছে। শান্তি আর স্বাধীনতার বাহক আলাদ্দিনের প্রদীপ সমাজের সেই অন্ধকার দূর করে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে। নাটকের শেষে সমবেত সঙ্গীতে নাট্যকারের সেই বাসনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

ঝড় ঝঞ্ঝায় ধর পাঞ্জার জড় স্বার্থের ছিঁড় জিঞ্জির
গাঢ়-রাত্রির ওহে যাত্রিক গাহ-সঙ্গীত দিন পঞ্জীর।।
জরা মৃত্যুর ভাঙো অর্গল
চল সৈনিক চল চঞ্চল
কর পৃথ্বির খরা অঞ্চল
ভরা উদ্যান কল-মঞ্জীর।।[১৯০]

আলাদ্দিন চরিত্রটি লেখকের একান্ত ব্যক্তিক ভাবনার শিল্পরূপ। সমাজ সচেতন, সংবেদন শিল্পী হিসাবে আলাউদ্দিন আল আজাদ সত্য-সুন্দরের স্বপ্ন দেখেছেন। তবে তা প্রাচীন লোককাহিনীর রূপকীয় আবরণে, সরাসরি প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নয়। তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের রুদ্ধ প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেননি, তবে রূপকের আশ্রয়ে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজসত্যকে তুলে ধরেছেন। কাহিনী বিন্যাসের পারিপাট্যে, সংলাপ রচনার দক্ষতায় ও সফল চরিত্র নির্মাণে তিনি সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

---

১৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
১৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

২৪

ফররুখ শিয়র 'সামনের পৃথিবী' নাটকে আবহমান গ্রাম বাঙলার জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। 'ব্ল্যাক মার্কেট' নাটকের মত এ নাটকেও তার সমাজ সচেতনতা বিদ্যমান। নাটকটিতে তিনটি অঙ্ক, পনেরটি দৃশ্য বর্তমান। নাটকের শুরুতেই একটি দৃশ্য সংযোজন করে দশ হাজার বছর পরবর্তী সময়ের পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে— যার সঙ্গে আলোচ্য নাটকের সাযুজ্য অনুপস্থিত।[১৯১]

তন্তুবায় মনির এবং তার দুই পুত্র মানিক ও দুলাল, গ্রামের অসৎ মাতবর হাজী দবির উদ্দিন, নসু পণ্ডিত ও তার মেয়ে বাতাসী প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে এ নাটকের কাহিনী আবর্তিত। গ্রামের কুচক্রী দবির উদ্দিন এতিম দরবেশের বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করে সৈয়দ দবির উদ্দিন নাম নিয়ে পাতপুকুর গ্রামের সমাজপতি সেজে বসেছে। নিজের নামানুসারে গ্রামের নাম রেখেছে দবিরগঞ্জ। তার লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে মনিরের হিজলতলার জমির উপর। মামলাবাজ ধুরন্ধর হারানকে সে এ কাজে নিয়োগ করেছে—

হারান॥ মনির জমিটা নাকি বিক্রি করবে, আর সৈয়দ দবির উদ্দিন সাহেব কিনে নেবেন। তাই ডাকতে এসেছিলাম।[১৯২]

দবির উদ্দিন নিজেকে অভিজাত শ্রেণীর লোক বলে দাবি করে। অসৎ পয়সার দাপটে সে গ্রামের নিরীহ লোকজনদের উপর যথেচ্ছাচার করে। মনির তন্তুবায়ী বলে সে তাকে ঘৃণা করে—

মনির॥ ওর সঙ্গে তুই ঝগড়া করতে গেলি কেন? দবির কি একটা মানুষ?

দুলাল॥ ছোট জাত বলে গাল দিল কেন? আমরা ছোট কিসে?

মনির॥ ধর্ম্ম আমাদের এক হলেও কর্ম্ম আমাদের দুই। ওরা চষে জমি আমরা বুনি কাপড়—এইটুকুই ব্যবধান। ওরা সংখ্যায় বেশি তাই আমাদের ওপর এত অত্যাচার করে---ছোট জাত বলে গাল দেয়। আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না।[১৯৩]

মনিরের বড় ছেলে মানিক শহরে লেখাপড়া করে, জমিজমা বিক্রি করে সে তার ছেলের লেখাপড়ার খরচ চালায়, ছেলেকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। ছেলে মানুষ হয়ে গ্রামে ফিরলে তার দুঃখ ঘুচে যাবে। ছোট ছেলে দুলাল

---

১৯১. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ১৮৩

১৯২. ফররুখ শিয়র, সামনের পৃথিবী, বেগম খালিদা খাতুন, সিরাজগঞ্জ, পাবনা থেকে ১৯৮০ সালে নাটকটি প্রথম প্রকাশ করেন, পৃ. ৯

১৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

লেখাপড়া শেখেনি, গ্রামেই থাকে, নিজেদের জাত ব্যবসা বাদ দিয়ে কৃষিকাজ শুরু করেছে। তাদের হিজলতলার জমি যেটা দবির উদ্দিনের লোক ফেলুদের মধ্যে বর্গা দেওয়া ছিল সেখানে সে ধানের চারা লাগিয়েছে, তার স্বপ্ন এই ধান গাছ বড় হবে, ধান পাকবে, ধান কেটে ঘরে আনা হবে, সেই ধান দিয়ে পিঠা তৈরি করে খাওয়া হবে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি মানিক ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। মিছিলের হাঙ্গামায় সে লাঠির আঘাতে আহত হয় স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে। হতভাগ্য মনিরের জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে, চিরতরে তার স্বপ্নের অবসান ঘটে। এদিকে দবির উদ্দিনের অত্যাচার ক্রমশ বেড়ে যায়। নসু পণ্ডিতের কিশোরী কন্যা বাতাসীর দিকে তার নজর পড়ে। বাতাসী-দুলালের মধ্যে গড়ে উঠা প্রেমের পথে সে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নসু পণ্ডিতকে শায়েস্তা করার জন্য সে গ্রাম থেকে স্কুল তুলে দিয়ে মাদ্রাসা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—

> দবির।। যে শিক্ষা শরিয়তে নিষেধ, সেই কুফরী এলেম আমি বেঁচে থাকতে শিখতে দেবো না। আমার পীর সাহেব কেবলা এখানে একটি খানকা শরীফ করবেন। তার সঙ্গে থাকবে একটি খারেজী মাদ্রাসা। তাই তোমার স্কুলটা তুলে দিলে, এখানে অন্ততপক্ষে লোকে ইসলামী এলেম শিখতে পারবে।[১৯৪]

মিথ্যা খান্দানের অহমিকায় দুলালের সঙ্গে নসুর মেয়ে বাতাসীর বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে নিজে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে—

> দবির।। ঐ কারিকরদের ঘরে যাবে আমাদের ঘরের মেয়ে—তাও আমারই চোখের উপর। শোনো পণ্ডিত। এ চাল তোমার টিকবে না। আমাদের কওমকে ছোট করতে আমি দেবো না। দরবেশ যা বলেছে তোমাকে ঠিক তাই করতে হবে। নইলে,...
>
> নসু।। নইলে অত্যাচার করে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবেন। এর বেশি আপনি আর কি করতে পারেন?
>
> দবির।। তোমার এই কওম বিরোধী কাজ আমি কিছুতেই করতে দেবো না। আমার সাথেই তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—দিতে হবে—দিতে হবে।[১৯৫]

নসু পণ্ডিত অল্প শিক্ষিত হলেও শিক্ষার আলো তার অন্তরের সমস্ত কালিমাকে দূরীভূত করেছে। আধুনিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন নসুর সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাঁর বাসনাকে পূর্ণ করতে চেয়েছেন—

---

১৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
১৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

নসু।। কয়েক লক্ষ বছর আগে মানুষ যেদিন থেকে যাত্রা শুরু করেছে, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত আসতে কত সমাজ, কত গোত্রকে যে কত পরিবর্তনের মধ্যে আসতে হয়েছে তার শেষ নেই। মানুষের এই মিথ্যা জাতের অহমিকা মনুষ্যত্বের কাছে বড় হীন অপরাধ।[১৯৬]

দবির তার লোকজন দিয়ে দুলালের জমির ধান কাটতে পাঠিয়েছে, মিথ্যা মামলার আসামি করে তার পিতা মনিরউদ্দিনকে হাজতে পাঠিয়েছে, দরবেশের সহায়তায় ষড়যন্ত্র করে নসুকে চোর সাব্যস্ত করে তার কিশোরী কন্যা বাতাসীকে বিয়ে করেছে। দুলাল তার স্বপ্নের হিজলতলীর জমির ধান বাঁচাতে গিয়ে দবির হাজীর সড়কীর আঘাতে প্রাণ হারায়। হাজত থেকে পালিয়ে এসে মনির দবিরকে খুন করেছে।

পাকিস্তানি শাসনের সেই দুর্দিনগুলোতে দবির হাজীর মত দুর্বৃত্তরা গ্রামের নিরীহ লোকজনদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যহত করে তুলেছিল। সুযোগ সন্ধানী স্বার্থপর লোকেরা নানা কলাকৌশল খাটিয়ে তাদের সম্পত্তি গ্রাস করেছে। গ্রামের নিঃস্ব অসহায় বিত্তহীন মানুষরাও চুপ করে বসে থাকেনি। তারাও প্রতিবাদ করেছে—

দুলাল।। দবির হাজী কোথায় নেই। প্রতি দেশে, প্রতি গ্রামে, প্রতি সমাজে দবির হাজী আছে। এই গ্রামেই আমরা থাকবো—এই গ্রামেই আমরা বাঁচবো—এই গ্রামেই আমরা দবিরের হাত থেকে মুক্তি পাবো।[১৯৭]

এই নাটকের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জীবন, সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকে ব্যবহৃত ছড়া ও গানে গ্রামীণ আবহাওয়া সুপরিস্ফুট। এ নাটকে অঙ্কিত দুলাল ও নসু পণ্ডিত চরিত্রে নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট। নান্দনতাত্ত্বিক নিরীখে 'সামনের পৃথিবী' সার্থক সৃষ্টি না হলেও লেখকের সমাজসচেতনতা ও মানবতাবোধের জয়যাত্রা প্রশংসনীয়।

বস্তুত নাট্যকার এ নাটকে কোলাহল হানাহানি বর্জিত বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত একটি সুন্দর পৃথিবীকে কামনা করেছেন।[১৯৮]

---

১৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

১৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

১৯৮. ইসমাইল মোহাম্মদ, 'সামনের পৃথিবী, নাট্যসমালোচনা, মাসিক সমকাল, সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত, ষষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ঢাকা, চৈত্র ১৩৬৯, পৃ. ৫৫১

Dhaka University Institutional Repository

২৫

'মা' নাটকে আযীম উদ্দীন জেবুন্নিসার বাৎসল্য-প্রেম আদি-অকৃত্রিম মাতৃসত্তার পাশাপাশি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী এক অধ্যাপকের আদর্শ, ন্যায় নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের চিত্র তুলে ধরেছেন। চল্লিশের দশকে এদেশে শিক্ষার হার ছিল খুবই নগণ্য। দেশ বিভাগের পর বেশ কিছু মুসলিম পরিবারের সুশিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষার প্রসারে ব্রতী হয়ে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন—তেমনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মা নাটকের অধ্যক্ষ মিঃ আলম। মফস্বল শহর 'আলি নগরে' তিনি একটি কলেজ স্থাপন করেছেন। এই কলেজের উন্নয়নের জন্য দিবারাত্র একটানা পরিশ্রম করে চলেছেন। কলেজকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন—

মিঃ আলম - ...দেশ বিভাগের পর যখন এখানে এলুম, পেয়েছিলুম মাত্র আড়াইশো ছেলে। আর আজ? আজ প্রায় হাজার। কিন্তু কতোটুকুই বা কোরলুম? অনেক বাকী...অনেক...অনেক।

....

হাজার হাজার ছেলে এখানে পড়বে, হাজার হাজার ছেলে মানুষ হবে ...আমি তখন থাকবো না, কেউ আমার কথা মনেও করবে না...কিন্তু থাকবে আমার কীর্তি, থাকবে আমার সাধনার ফল। ঐ দ্যাখো, সেগুন, মহুয়া আর বকুলের চারা। যে আনন্দ নিয়ে এদের পুঁতেছিলাম, সে আনন্দ বেঁচে থাকবে এদের ফুল পাতার ভেতর দিয়ে। সেগুনগুলো যখন বড়ো হবে তখন আমার চিহ্নমাত্র এ পৃথিবীতে থাকবে না,...কিন্তু ওদের তক্তা দিয়ে হবে বেঞ্চি, চেয়ার গ্যালারী...হাজার হাজার শিক্ষিতের পরশ পেয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে আমার আনন্দ, বেঁচে থাকবো আমি।...মহুয়া, বকুলের ফুল যখন ফুটবে, গন্ধে যখন কলেজ-আঙ্গিনা পাগল হোয়ে যাবে, কে কোরবে তখন আমায় মনে? তবু আমার সাধনা, আমার আনন্দ, মিশে থাকবে ঐ ফুলের গন্ধে...আঁকড়ে থাকবে অনাগত কালের অসংখ্য কিশোর কিশোরীর গলা।[১৯৯]

কিন্তু তার সেই মহৎ উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল রজনীবাবু মধুবাবুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে অধ্যক্ষ মিঃ আলমের নামে কলেজ তহবিল থেকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনে। সুযোগ বুঝে মধুবাবুও কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছে। তাঁর কলেজের ছাত্ররা যাদের তিনি স্নেহ-মমতা দিয়ে বড় করে তুলেছেন তারাও শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে সর্বনাশা বিক্ষোভের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে—

---

১৯৯. আযীম উদ্দীন, মা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, পৃ. ৪-৫। ঢাকা থেকে ওরিয়েন্ট লংম্যান্স, ১৯৬০ সালে নাটকটি প্রকাশ করে। ১৯৫৫ সালে পি.ই,এন ক্লাব আয়োজিত আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে নাট্য প্রতিযোগিতায় আযীম উদ্দীনের 'মা', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর' ও রাজিয়া খানের 'আবর্ত' যথাক্রমে প্রথম (১০০০ টাকা), দ্বিতীয় (৭৫০ টাকা) এবং তৃতীয় (৫০০ টাকা) পুরস্কার লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

মিঃ আলম – তারা ডি–এম এর সঙ্গে দেখা কোরে দাবী জানিয়েছে, এখুনি আমাকে সাসপেন্ড কোরতে হবে। কাগজে কাগজে সংবাদ দিয়েছে, কলেজ তহবিলের পনের হাজার টাকা অমি চুরি কোরেছি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এর নকল গ্যাছে এডুকেশন মিনিস্টার, ভাইস চ্যান্সেলর, ডি,পি আই–র কাছে।[২০০]

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঘিরে পরিচালিত সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুর নিয়ম আর কুচক্রী মানুষদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়ে আদর্শ শিক্ষককে মান–সম্মান বিসর্জন দিতে হয়েছে—

মিঃ আলম – ...যে বাজারে চলছে টাকার খেলা, সে বাজারে শিক্ষক আর কুকুর সমান তার মূল্য নেই, মান নেই, ইজ্জত নেই। তাঁকে বাঁচতে হবে উচ্ছিষ্ট খেয়ে, পা চেটে আর তার সঙ্গে নিতে হবে জাতিকে গড়ে তোলার সমস্ত দায়িত্ব। এ নিমগাছ থেকে ফজলী আমের দুরাশা নয়কি, জীবন? আমাদের মতো লোকের আবার সম্মান? ...আমরা হলুম সমাজের চাকর, দেশের চাকর ...আমাদের পেটে ক্ষুধা থাকতে নেই, চোখে লোভ থাকতে নেই, পরনে কাপড় থাকতে নেই।[২০১]

অধ্যক্ষ সাহেবকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দীর্ঘদিন হতাশা নিরাশায় থেকে তার শরীর ভেঙ্গে যায়, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সরকারি পক্ষের সাক্ষী দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ও মামলাটি মিথ্যা ও হিংসামূলক। প্রাক্তন ভাইস প্রিন্সিপাল রজনী বাবু, 'এস–পি' ও 'ডি এম ডি' কে ছাত্র জনতা সমুচিত শাস্তি প্রদান করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও এই সমস্ত দুরাত্মাদের অত্যাচার অব্যাহত ছিল। জেবুন্নিসা সেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন—

—খোদার সে বিচারের আশায় রইলুম। আমাদের সোনার সংসারটা ভেঙ্গে তার কোন লাভ হল না, কিন্তু আমরা এ দুনিয়া থেকে মুছে গেলুম। পাকিস্তান থেকে এ রকম লোকের পদশক্তির জুলুম করে যাবে, কে জানে।[২০২]

স্বামীর মৃত্যুর পর কুসুমপুরে জেবুন্নিসার আশ্রয় হয়নি। বড়বোন রশীদার কাছেও তিনি ঠাঁই পাননি, শেষ পর্যন্ত পুত্র মামুনকে নিয়ে পিতৃগৃহ নন্দনপুরে আশ্রয় নিয়েছেন। সতীন কন্যা নাজমা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে সৎমাকে বুকে টেনে নিয়েছে।

---

২০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬–১৭
২০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
২০২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

রশীদা ও জেবুন্নিসা দুই বোনকে নাট্যকার দুটি ভিন্নধর্মী সত্তা হিসাবে অঙ্কন করেছেন। আদর্শ নারী জেবুন্নিসা সতীন পুত্রদের স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে যথার্থ মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন। অপরদিকে রশীদা নিজের একমাত্র পুত্র আলতাফকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। সে একজন মদ্যপ, জুয়ারী, পিতার গদী থেকে টাকা পয়সা চুরি করে। তার এই পরিণতির জন্য সে তার মাকেই দায়ী করেছে--

আলতাফ - কিন্তু কে শিখিয়েছিলো চুরি করা? ঐ কাজীর ঝিইতো? বাবার গদী থেকে টাকা চুরি কোরে এনে দিতে বোলতো। তাই দিতুম। এই কোরেই না আজ চোর। ...এখন চুরি না করলে হাত নিসপিস্ করে, ভাত হজম হয় না, ঘুম হয় না। আপনি যদি আমার মা হোতেন।[২০৩]

অধ্যক্ষ আলম চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে মুসলিম পরিবারের সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা ও নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া নাট্যকারের ব্যক্তিজীবনে আহরিত অভিজ্ঞতারই ফসল। জ্ঞান বিস্তারের সেই প্রোজ্জ্বলিত শিখা যা তিনি অন্তরে ধারণ করেছেন তারই প্রবাহ উত্তরসূরিদের মাঝে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।

সংলাপ রচনায় নাট্যকারের মননশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। ভাষা বেগবান, সুতীক্ষ্ণ-কাব্যময়। যথাযথ উপমা ব্যবহার নাটকের অপর বৈশিষ্ট্য। এতদসত্ত্বেও সামাজিক কমেডি 'মা'-তে আদর্শবাহী বক্তব্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এত স্পষ্টরূপ গ্রহণ করেছে যে, নাটকীয়তা সৃষ্টিতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। দোষত্রুটি সত্ত্বেও 'মা' বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে একটি সার্থক সংযোজন।[২০৪]

শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি নাট্যকার সৎমারূপী জেবুন্নিসা চরিত্রের চিরন্তন শাশ্বত মাতৃরূপ অঙ্কন করেছেন।

২৬

আযীম উদ্‌দীন আহ্‌মদের 'অহংকার' পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট সামাজিক নাটক। আভিজাত্য ও বংশমর্যাদাবোধের অহংবোধ সমাজ জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করে। পঞ্চাশ দশকে মুসলমানদের মধ্যে খান্দান ভিত্তিক জটিলতা যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তা এদেশের অনেক নাট্যকারদের নাট্যরচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নাট্যকার এই নাটকে কাজী-গাজী দুটি বংশের লোকজনদের উপস্থাপন করে তাদের বংশমর্যাদাপ্রসূত অহংকার, দ্বন্দ্ব-সংঘাত

২০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
২০৪. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ২৭১

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন করেছেন। কাজী-গাজীদের প্রতিবেশী কানু হাজারী উভয় পরিবারের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। সবুর সালমার সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেই অহংবোধের চিত্র তুলে ধরেছেন—

সবুর॥ ...সে মদের স্বাদ তুমিও পাওনি, আমিও না। সে মদের নাম অহংকার—আমি বড়ো। আমি উত্তম পুরুষ, তুমি নেহায়েৎ যখন সামনের ওপর দাঁড়িয়ে আছো, তখন মধ্যম পুরুষ, আর সব?—অধম পুরুষ। বুঝলে, সালমা, এই হোল রোগ। এই দুই বংশ জরাজীর্ণ হোলো, তবু ভুগছে। এ যেনো দুরারোগ্য ক্ষয়কাশ।

সালমা॥ এর কি কোন সুরাহা নেই? তুমি বলো। আমি যে আর ভাবতে পারি নে।

সবুর॥ সুরাহা? নিশ্চয়ই আছে। যে মরতে চায়, তাকে মরতে দেওয়া। অহংকারে মানুষ হয় উইপোকা; পাখা গজায়, মরতে চায়। তাকে কে বাঁচাতে পারে—তুমি, আমি বা অন্য কেউ? মরণের শিঙা যখন বাজে, মানুষ হয় তখন পাগল, দিক-বিদিক হারিয়ে ছুটে চলে উল্কার মতো। মরণ-শিঙার ডাকে এই দুই বংশ এখন পাগল; এদের বাঁচাবে কে? মরতে যখন এরা চায়, মরতে দাও—সব ল্যাঠা চুকে যাক।[২০৫]

সুচতুর কানু ব্যাপারীর পরামর্শে কাজী-গাজীর বংশ মর্যাদাবোধ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এক সময় চরম পর্যায়ে পৌছে, উভয়েই লাঠিয়াল বাহিনীর সাহায্য নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার এক জঘন্য খেলায় মেতে ওঠে। এই কলহ কোন্দল শেষ পর্যন্ত নিরীহ লোকদের আসামি বানিয়ে হাজতবাস করিয়ে ছাড়ে। গ্রামের সহজ সরল লোকজন এই সমস্ত কুচক্রীদের চক্রান্তের শিকার হয়। কাজী-গাজীদের লড়াই নিরীহ মতিনকে ঘরে আগুন লাগানোর দায়ে অভিযুক্ত করে আসামি বানিয়েছে—

মতিন॥ ...কিন্তু ব্যাপার যে এতোদূর গড়াবে —আমাকে যে শেষ পর্যন্ত আসামী কোরে ফেলবেন—

দীনু॥ এই জন্য তো বোললুম, এর নাম গ্রাম, ভায়া গ্রাম। এখানে ছেলে বাপের নামে মামলা কোরতে পারে, মা মেয়ের নামে কলঙ্ক রটাতে পারে। এখানে সত্তর বছরের বুড়োর নামে ওঠে বলাৎকারের কিচ্ছা, সতী নারীর নামে রটে জঘন্য কুৎসা, মুছল্লী-মোত্তাকিন হয় দিন-দুপুরে চোর।[২০৬]

কুটিল কুচক্রী কানু হাজারী চক্রান্ত করে মতিনকে আসামি করে নিজের মেয়ে সালেহার সঙ্গে মতিনের বিয়ে দিতে চেয়েছে। মতিন এ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হয়নি। হাজারীও ছাড়বার পাত্র নয়, মামলা সেশনে গেল। মতিনকে জব্দ করার জন্য মিথ্যা সাক্ষীও যোগাড় করে। সবুরের সংলাপের মধ্য দিয়ে গ্রামের দুষ্টলোক হাজারীর চরিত্রটি উদ্ভাসিত হয়েছে—

---

২০৫. আযীম উদ্‌দীন আহমদ, অহংকার, ঢাকা থেকে ইতিকথা বুক ডিপো ১৯৬০ সালে প্রকাশ করে। পৃ. ৩৭

২০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

...ব্রজের কানু, শুনেছি, বাজাতো মোহন বাঁশী, কিন্তু আমাদের নূরপুরের কানু যে বাজায় বিষের বাঁশী। সে বিষ এমন বিষ, পরম আত্মীয় হোয়েও, কাজী আর গাজী চিরশত্রুই থেকে গেল।[২০৭]

নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে সেশন কোর্টে বিচারকার্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কানু হাজারীর একমাত্র কন্যা সালেহা, নাজমার বাল্যকালের সখী, কানু হাজারীর ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছে, নাজমা কোর্টে জজের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়েছে—

নাজমা।। এই দাঙ্গার দু'দিন পরের কথা। আমার চাচা সালাম কাজী সাহেব লেঠেল রসুল খাঁকে নিয়ে কানু হাজারী সাহেবের বাড়ি যান। সেখানে হাজারী সাহেব আমার চাচা আর রসুল খাঁকে পরামর্শ দেন—আসামীকে খুন না কোরলে কাজীদের মাথা আর উঁচু হবে না।[২০৮]

নাজমা এই মামলার সমস্ত সত্যকে কোর্টে উপস্থাপন করে, পুলিশ কানু হাজারী ও সালাম কাজীকে এ্যারেস্ট করে। কানু হাজারী সালাম কাজীর সঙ্গে চক্রান্ত করে নাজমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে নাজমার পরিবর্তে সালাম কাজী সালেহাকে গুলি করে হত্যা করে। সালেহা খুন হওয়ার দুঃসংবাদে নাজমাও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রলাপ বকতে বকতে সেও মারা যায়। সালেহা ও নাজমার অকাল মৃত্যু কাজী-গাজী পরিবারের বিরোধের চিরতরে নিষ্পত্তি ঘটায়—

মতিন।। ...নাজমা বাসা বেঁধে থাকবে চিরকাল আমাদের অন্তরে তার মধুর স্মৃতি মুছে দেবে এই দুই বংশের কলঙ্ক-কালিমা, অহংকার, বিদ্বেষ।[২০৯]

নান্দনিক নিরীখে 'অহংকার' নাটক পুরোপুরি সফল না হলেও সামাজিক সমস্যার চিত্রায়ণে নাটকটি সার্থকতা লাভ করেছে।

২৭

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি গড়ে ওঠা বিত্তবান মধ্যবিত্ত সমাজের কুরুচিপূর্ণ উৎকট চালচলন ও অমানবিক আচার আচরণের শিল্পভাষ্য রাজিয়া খানের 'আবর্ত' নাটক। দেশ বিভাগের পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ায় মফস্বল শহরগুলোতে আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছিল। ফলে বাহ্যিক চাকচিক্য নির্ভর এক কৃত্রিম নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল—কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ছিল না। ফলে এ সমাজের

---

২০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২
২০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
২০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক চিন্তা-চেতনাসমৃদ্ধ রুচিবান মানুষের সঙ্গে তাদের শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব সংঘাত। এই দ্বন্দ্ব সংঘাত এক সময় সমাজে তাদের আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছে।

'আবর্ত' নাটকের মফস্বল শহরবাসী উঠতি বিত্তবান মধ্যবিত্ত নাসিরুদ্দিন অর্থের লোভে বিলাত ফেরত ভ্রাতুষ্পুত্র মাতাল সালামের সঙ্গে জেষ্ঠা কন্যা সুন্দরী পান্নার বিয়ে দিয়েছেন। মফস্বল শহরের অল্প শিক্ষিতা আদর্শবাদী পান্না নিজের স্বাধীন চিন্তাধারা বিসর্জন দিয়ে পিতার আদেশে মাতাল স্বামী সালামের সঙ্গে সংসার জীবন অতিবাহিত করছে।

চার বছর ধরে সালামের এই অত্যাচার সে নীরবে সহ্য করে এসেছে। কিন্তু তার ছোট বোন চুনীকে নিয়ে সালামের অশালীন কথাবার্তা, অশোভন আচার-আচরণ তাকে পীড়িত করেছে। চার বছরের সংসার জীবনে শুরু হয়েছে চরম সংঘাত, পান্না কিছুতেই সালামের সঙ্গে চুনীর এই অসংযত আচরণ মেনে নিতে পারেনি—

পান্না – ...এই নোংরামি থেকে কি আমার মুক্তি নেই? চুনী জানে যে এ বাড়ীতে আমি দাসী বাঁদীরও অধম, তাই অত বড় বড় কথা শুনিয়ে গেল। আমি যে শুধু ভাত কাপড়ে পোষা রক্ষিতা সে কথা চাকর বাকররাও টের পেয়ে গেছে। যাই হুজুরের আবার চায়ের সময় হল। (জানালা দিয়ে তাকিয়ে) গাড়ী থেকে নেমেই সোজা চুনীর ঘরে! সারা দিন-রাত সেখানে থাকলেই তো হয়, লোক-দেখাতে আর আমার পাঁজরগুলো ঝাঁজরা করতে দু'তিন মিনিটের জন্য এখানে আসা কেন? এই মনের অবস্থায় আবার সাজগোজ করতে হবে, তিনি এসে দু'দন্ড তাঁর মদ খেয়ে লাল হয়ে ওঠা চোখ দুটো আমার দেহের উপর রেখে আমায় ধন্য করবেন বলে। নিজের প্রতি আর কোন শ্রদ্ধা নেই আমার। আমি জানি আমার স্থান একটা গণিকারও নীচে।[২১০]

সালাম বিদেশে যেয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মানবিক গুনাবলী বিসর্জন দিয়ে একটি অমানুষে পরিণত হয়েছে, নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে ঘরে রেখে শ্যালিকার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে মেতে উঠেছে—

সালাম – ...চা সাজিয়ে বসে আছ কার জন্য? You old hag। যাও, কুকুরকে গেলাও গে তোমার সাধের খাবার। (কাছে এসে) বোনের কানে কি মন্ত্র দিয়েছ? চুনী আমার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বল্ল না, উপরন্ত আমাকে শাসাল যে কালই আব্বার কাছে চলে যাবে। তুমি কি বলেছ তাকে বল শীগগির। Otherwise I will wring the life out of you![২১১]

---

২১০. রাজিয়া খান, আবর্ত, রচনাকাল ১৯৫৫, ১৯৬০ সালে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন মা, বহিপীর, আবর্ত তিনটি নাটক একত্রে সম্পাদনা করেন। আবর্ত, পৃ. ৪৯

২১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

বিলেতে কাটানো বাঙালি যুবকের স্খলিত চরিত্র, চালচলন, মন মানসিকতাকে নাট্যকার তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্রূপ করেছেন—

> ...My wife, she is just a lifeless log. এক টুকরো পোড়া কাঠ। দেখলে বিশ্বাসই হয় না এই আমি চাই গ্লাসে বুদ্বুদ ওঠানো শ্যাম্পেনের মতো মেয়ে যে আমাকে দিবারাত্রি মত্ত ক'রে রাখতে পারবে। জীবনটা যে এত dull সে কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেবে। ...চুনী এই dry দেশে তুমি আমাকে কখনো দিয়েছ absinthe আর কখনো chianti-র স্বাদ ! ...উঃ তোমায় দেখলেই আমার মনে হয় নিজেকে সেঁকে নিতে চুনীর মত একটা গনগনে fire place-এর দরকার।[২১২]

ছেলেমেয়ে নিয়ে পান্না এক সময় সালামের সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। চুনীও শেষ পর্যন্ত সালামকে গ্রহণ করেনি, গওহরকে বিয়ে করে নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে। অর্থ-গৃধ্নু পিতা নাসিরুদ্দিনের মুখের উপর প্রতিবাদ করে বলেছে—

> চুনী – মদখোর না হলে কেউ সুপাত্র হয় না এ শিক্ষা তো আব্বা তোমারই দেয়া। তাছাড়া তোমার বড় জামাইর কল্যাণে আমার এমন অভিনব উন্নতি হয়েছে যে গওহর ছাড়া আর কেউই আমায় বিয়ে করতে রাজী হ'ল না। সেই চার বছর আগে (সালামকে দেখিয়ে) এই কুলাঙ্গারটার সঙ্গে যদি তুমি বুবু বিয়ে না দিতে আজ আমরা দুজনেই এভাবে দুদিকে ভেসে যেতাম না। টাকার লোভে, বিলেত ফেরত জামাইকে তুষ্ট রাখার লোভে তোমরা যে কতদূর নামতে পারো, সে অভিজ্ঞতা আমার ভাল করেই হয়েছে। নানা জায়গা থেকে আমার ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছে, ওই ওঁর পরামর্শে তোমরা সেগুলো ফিরিয়ে দিয়েছ। আজ ঢাকা শুদ্ধ লোক জানে আমার কলঙ্কের কথা।[২১৩]

সালাম চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টিতে নাট্যকার সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। দোষে গুণে সালাম তার সার্থক সৃষ্টি—

> সালাম – আলোগুলো নিভিয়ে দাও, বেয়ারা, আরও বোতল আনো। (বসে পড়ে) ফ্রিজ থেকে সবচেয়ে সেরা বোতলগুলো আনো। শ্যাম্পেন আনো, শ্যাম্পেন আনো। কারো সামনে কখনো চোখের জল ফেলিনি Today I will down my tears in the champagne glass.[২১৪]

---

২১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
২১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
২১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

সালামের পাশাপাশি ইউনুসকে তিনি আদর্শ চরিত্র হিসাবে গড়ে তুলেছেন। পান্নার নিরানন্দ জীবনে যে এক টুকরো আশার উজ্জ্বল মেঘ হয়ে এসেছে। 'ফুপু' চিরন্তন বাঙালি নারীর সার্থক প্রতিভূ, মাতৃত্বের মহিমায় ভাস্বর। অন্যদিকে পান্নার মা আমেনা স্বার্থপর ও অর্থলোভী। নাটকের মধ্য দিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি আদর্শ ও নীতি প্রচার করা হয়েছে। নাটকটি প্রসঙ্গে ড. সুকুমার বিশ্বাস লিখেছেন—

> নাটকীয় দ্বন্দ্ব অপ্রতুল হলেও কাব্যময় বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ নাটকটিকে সুখপাঠ্য করেছে। রাজিয়া খানের 'আবর্ত' সামাজিক নাটক হিসাবে সমালোচনার ঊর্ধ্বে না হলেও দোষেগুণে আংশিক সার্থক বলা যায়।[২১৫]

২৮

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। দেশের তরুণ সমাজ নব-জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের সেবায় এগিয়ে আসে। দেশের অজ্ঞতা, বুভুক্ষা দূরীকরণ ও নিরক্ষরতার সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে তারা এগিয়ে আসে। 'যদি এমন হোত' নাটকে নুরুল মোমেন তরুণদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

'যদি এমন হোত' পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট সামাজিক নাটক—তিন ঘণ্টা ব্যাপ্তির নাটক। এ নাটকের নায়ক ফয়েজ একজন সুশিক্ষিত, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, প্রগতিশীল যুবক—সে তার জীবনের সমস্ত ভোগ বাসনাকে জয় করে সুশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে গ্রামের স্কুলে প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিয়েছে। তার একমাত্র ব্রত—গ্রামের অশিক্ষিত, গরিব ছেলেদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, দেশের সৎ এবং আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলা। এ জন্য সে শহরের বিলাসবহুল জীবন পরিত্যাগ করে গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেছে। সমাজের নিম্নস্তর থেকে একটি সাধারণ মেয়েকে সে জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করতে চায়। পিতা জাফর সাহেব চেয়েছিলেন তাকে তার বন্ধু এরশাদ সাহেবের মেয়ে আধুনিকা ইয়াসমিনের সঙ্গে বিয়ে দিতে। ফয়েজের মামা তার সম্পত্তি এমনভাবে উইল করে রেখে গেছেন যে ফয়েজ—ইয়াসমিনের বিয়ে হলেই তারা এই সম্পত্তির মালিক হবে। ইয়াসমিনের বাবা সেই উইলের কথা তাকে জানালেন—

> এরশাদ – শোন মা। তোমার এক খালু এক উইল করে গেছেন। তাতে বলেছেন যে তার ভাগ্নে ফয়েজের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হয় তাহলে তোমরা অনেক সম্পত্তি তো পাবেই তার উপর প্রায় দু'লাখ টাকা পাবে। ছেলেও বড় ভাল, দ্বিতীয় হয়নি জীবনে। যে কোন চাকরি-পরীক্ষাতে সে কৃতকার্য হতে পারতো কিন্তু পরীক্ষা দিলো

---

২১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

> না। গ্রাম্য স্কুলে হেড মাস্টার হয়েছে। সমাজের নীচে যারা পড়ে আছে তাদেরকে না তুললে দেশ উঠতে পারে না, এই হলো তার ধারণা। সুতরাং, গরীবদের নিয়েই তার চিন্তা।[২১৬]

সমাজের উচ্চস্তর থেকে স্ত্রী গ্রহণেও তার অনীহা। সমাজের নিম্ন স্তরের অতি সাধারণ মেয়েকে সে জীবন সঙ্গিনীরূপে পেতে আগ্রহী। ইয়াসমিনের পিতার সংলাপের মধ্য দিয়ে ফয়েজের সেই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—

> সমাজের নিম্নস্তর থেকে স্ত্রী গ্রহণ করাই তার ইচ্ছে। সেই জন্য উইলের শর্ত মাফিক বিয়ে করায় তার মত নেই। সে মনে করে তুই একটা সাংঘাতিক আধুনিকা। গরীবের প্রতি তোর মমতা নেই।[২১৭]

ইয়াসমিনও রাবেয়ার ছদ্মবেশে সিদ্ধেশ্বরীর এক বস্তিতে এসে বসবাস শুরু করলো। রাবেয়া নামে এক ঝি'র ছদ্মবেশে জনসেবামূলক কার্যে আত্মোৎসর্গ করল। বস্তিবাসী ময়না, ফেকু, ফুৎকীর মা, জলিলের মা, ফাহিমের মা ও কুলসুমের সাহায্য সহযোগিতায় বস্তিবাসীদের ভাগ্য পরিবর্তনে সে এগিয়ে এসেছে। মরিয়ম চকলেট তৈরি করে, জলিলের মা কাসুন্দি বানায়, কুলসুম পেয়ারার জেলি, ফুৎকীর মা কাবাব, ফাহিমের মা চিতু পিঠা, ময়না বারভাজা তৈরি করে। ফেকু সুন্দরভাবে ছড়া কেটে বারভাজা বিক্রি করে—

> ডাইনে চিবোন বাঁয়ে মজা।
> বাঁয়ে চিবোন ডাইনে মজা।
> দুদিক চিবোন মধ্যে মজা
> লাখ্ মজার এ বারভাজা।[২১৮]

রাবেয়ার ছদ্মবেশে ইয়াসমিন অবশেষে হেডমাস্টার ফয়েজের মনোজয় করেছে। ফয়েজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে, ইয়াসমিনকে সে চিনতে পেরেছে। দত্তবাবু ইয়াসমিনের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> মা আমার রাণীও যেমন চাকরাণীও তেমন। চাকরাণীর মধ্যে রাণীর যে রূপ সেটা দেয় ওকে ব্যক্তিত্ব। আর রাণীর মধ্যে চাকরাণীর যে রূপ সেটা দেয় ওকে কমনীয়তা।[২১৯]

ফয়েজ ও ইয়াসমিনের মিলনের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'যদি এমন হোত' নাটকে নাট্যকার কয়েকটি বিষয়ের গুরুত্ব দিয়েছেন—[২২০] সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তার—নায়ক ফয়েজের জীবনের আদর্শই

---

২১৬. নুরুল মোমেন, যদি এমন হোত, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, পৃ. ৩৬
২১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
২১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
২১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪
২২০. সৈয়দা খালেদা জাহান, নুরুল মোমেন ও তাঁর নাটক, এম. ফিল থিসিস, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রচার। তার সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, 'শিক্ষার সঙ্গে জীবনবোধ না থাকলে শিক্ষা আশ্রয়ই পাবে না যে মনে।'[২২১]

সমাজসেবা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে শিক্ষিত যুবক-যুবতীর এগিয়ে আসতে হবে। এ নাটকে ধনীর দুলালী ইয়াসমিন নাট্যকারের সেই মনোবাসনা পূরণের মানসে বস্তিবাসীদের ভাগ্যোন্নয়নে এগিয়ে এসেছে। এদের সাহচর্যে এসে তার মনের বদ্ধ দুয়ার খুলে গেছে, '...এটাই বস্তি থাকবে না। এখানে আমি ইমারত তুলবো। দেখবেন, এই চকলেট আর বারভাজা ইমারত তোলাবে এখানে কয়েক বছরের মধ্যে। মানুষের শক্তি কি এত কম করে খোদা দিয়েছেন যে ভাগ্যের হাতে পড়ে পড়ে মার খাবে শুধু?'[২২২]

আভিজাত্যবোধ বা খান্দানীত্ব সমস্যার প্রতিও নাট্যকার কটাক্ষপাত করেছেন। মাহবুব ও ফয়েজের কথোপকথনে সেটিই প্রকাশিত হয়েছে : '...আদমকে তোমরা বাতিল করে দিয়েছ। তারই বংশের ভূইফোড়দের কিছু লোক ধরে বংশ মর্যাদা দিয়ে তারই মাথার উপর স্থান করে দিচ্ছো।'[২২৩]

নীতি ও আদর্শ প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে চোরাকারবার ও তার পরিণামের দিকেও আলোকপাত করেছেন। আফসার রহমতকে বিদ্রূপ করেছে—'হ্যাঁ কালোবাজারের পয়সা, সবার হক মেরে এনে জোগাড় করেছ, সুতরাং হক্কের তো বটে। বলা যায়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা। তাই না?'[২২৪]

পরবর্তীতে রহমতের দুর্গতির চিত্রও তুলে ধরেছেন—'দুনীর্তির পয়সা সাহেব, কোথায় কিভাবে আটকায় কে জানে। যাক, অল্পের মধ্যে বেঁচে গেছেন ; ভাল করে আটকে গেলে, ওটাই আল্লার মরজীতে খাবিতে পরিণত হয়ে আপনাকে খতম করতে পারতো।'[২২৫]

ফয়েজ এ নাটকের নায়ক, সে একজন আদর্শবাদী যুবক, গ্রামকে ভালোবাসে, গ্রামের অশিক্ষিত গরিব মানুষদের শিক্ষিত করে তোলাই তার একমাত্র ব্রত—

> এরা প্রায়ই গরীব যদি ভবিষ্যতে এদের হাতে দেশের কর্তৃত্ব আসে তবে সমাজের পক্ষে তা হবে কল্যাণকর। এরা দেশের নিম্নস্তরের লোকদের সঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষায় যে রকম জড়িত হয়ে সত্যিকারভাবে মানুষ হচ্ছে তাতে আমার কল্পনা সফল হবে মনে হয়।[২২৬]

---

২২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
২২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
২২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
২২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
২২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
২২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

ভালো ছাত্র হয়েও উচ্চ পদমর্যাদা ও অর্থলালসা তাকে স্পর্শ করেনি। ইয়াসমিনও তার আদর্শকেই বরণ করে নিয়েছে। গরিবের অভিনয় করতে গিয়ে তাদেরকে ভালোবেসে দুঃখ-দুর্দশা মোচনে জীবন উৎসর্গ করেছে। দেশের শিক্ষিত যুবক-যুবতী যদি গরিবদের ভাগ্যোন্নয়নে এগিয়ে আসতো তবে দেশে কোন সমস্যা থাকতো না।

'যদি এমন হোত' উদ্দেশ্যমূলক রচনা, নাটকের উদ্দেশ্য নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান, শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজসেবা এবং মানুষের সেবা। সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণী যদি দেশের গরিব মানুষদের সেবায় এগিয়ে আসতেন, নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করে দেশের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতেন তবে গোটা সমাজের চেহারা বদলে যেত। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ফয়েজ যে অভিনব পদ্ধতি কলিমের উপর প্রয়োগ করেছে তা আসলে নাট্যকারের নিজস্ব উদ্ভাবন। সমাজের অবহেলিত লাঞ্ছিতদের দুর্দশা মোচনের বাসনা, ফয়েজ-ইয়াসমিনের জীবন-স্বপ্ন, তাদের মিলনের মাধ্যমে সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য।

২৯

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তাঁর চারপাশের সমাজ থেকে। গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ভণ্ডামী ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর 'বহিপীর' এক মূর্ত প্রতিবাদ। এ নাটকে সামন্তযুগীয় মূল্যবোধের সঙ্গে নবজাগ্রত প্রাগ্রসর মধ্যবিত্ত মানসের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব সংঘাত চিত্রিত হয়েছে। 'বহিপীর' নাটকের আখ্যানভাগ পল্লীসমাজ কেন্দ্রিক হলেও আধুনিক ধ্যান-ধারণা সমৃদ্ধ নর-নারীর আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি সমসাময়িক সমাজব্যবস্থায় যে প্রভাব বিস্তার করেছিল নাটকে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। 'পীর মুর্শিদে' ভক্তি আমাদের মজ্জাগত সংস্কার। কিন্তু মানবিক অধিকারের দাবিতে যে সংস্কারে শৈথিল্য এসেছে তারই কিছুটা ছাপ আমরা এ নাটকে পাচ্ছি। শুধু মুরিদের অন্তরে নয় পীরও যে আজ জীবন ধর্মে বিচলিত তারও প্রথাগত জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে তারও ইঙ্গিত পাই এখানে।[২২৭]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'বহিপীর' নাটকে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছে—

১. জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে।

২. পীর-ফকিরের উপর মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে।

---

২২৭. নীলিমা ইব্রাহিম, বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, প্রথম সংস্করণ ১৩৭৯, পৃ. ৪৮১

Dhaka University Institutional Repository

৩. হৃদয়বৃত্তি ও নতুন জীবনের স্বীকৃতি রয়েছে। যদিও জমিদার কিংবা পীর সাহেব মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন।[২২৮]

'বহিপীর' নাটকটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক ড. সাজ্জাদ হোসেন লিখেছেন—

> The drama is really a tussle between youth and age on both sides, between the priest and his bride. It is youth that eventually triumphs.[২২৯]

গ্রাম-বাঙলায় এক বিশেষ শ্রেণীর পীর, মুর্শিদ দেখা যেত। বিভিন্ন অঞ্চলব্যাপী এদের মুরিদান ছিল। নিরীহ মুরিদদের ধর্ম-বিশ্বাসের সুযোগে এরা যথেচ্ছাচার করতেন। কখনও কখনও এদের অত্যাচার চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছাতো, নিরীহ মানুষ এদের অন্যায় অবিচারের শিকার হতো। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র 'বহিপীর' নাটক। 'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'বহিপীর' যিনি বইয়ের ভাষায় কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে তার নিজস্ব বক্তব্য—

> দেশের নানাস্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একেক ঢঙ্গের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কি করি। আমাকে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়, আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতে আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা করিয়া থাকি।[২৩০]

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে তার মুরিদান। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, চৌদ্দ বছর পূর্বে তার স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে, এমন একজন ব্যক্তির পক্ষে কিশোরী তাহেরাকে বিয়ে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সৎমার সংসারে অযত্নে লালিত কিশোরী তাহেরাকে পেয়ারা মুরিদ বৃদ্ধ পীর সাহেবের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু এ বিয়ে তাহেরা মেনে নিতে পারেনি। তাই বিয়ের রাতেই সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় পেয়েছে এক জমিদারের বজরায়। স্ত্রীর সন্ধানে বের হয়ে ঘটনাচক্রে পীর সাহেবকেও আশ্রয় নিতে হয়েছে একই বজরায়। তাহেরাকে ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য পীর সাহেব বহু কলাকৌশল প্রয়োগ করেন কিন্তু তাহেরা সবকিছু উপেক্ষা করে হাশেমের সঙ্গে নতুন জীবনের পথে পাড়ি জমিয়েছে।

'বহিপীর' নাটকে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পীর মুর্শীদে ভক্তি মুসলমানদের মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুযোগ-সন্ধানী পীর সাহেব যুবতী মেয়ে তাহেরার অমতে তাকে বিয়ে

---

২২৮. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ৪৩-৪৪

২২৯. Dr. S. Sajjad Husain 'writers of E. Pakistan, Syed Waliullah' Pakistan Times, Lohore, March 19, 1967. সংগ্রহ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক, পৃ. ৮৮

২৩০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, নাটক সমগ্র, হায়াত মাহমুদ সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, বহিপীর, পৃ.. ৬

করেন। বিয়ের রাতে ঘর ছেড়ে পালিয়েও সে রেহাই পায়নি, পীর সাহেব তার পিছু নিয়েছেন। অবশেষে জমিদার পুত্র হাশেম তার সমস্যাকে উপলব্ধি করে তাকে ভালোবেসে শেষ পর্যন্ত পুরোনো সংস্কারবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন জীবনের পথে টেনে নিয়ে গেছে। সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের রূপকল্প--'বহিপীর'। ষাটের দশকের প্রথম পাদেই বাঙালি সমাজে মূল্যবোধের পরিবর্তন এসেছে। পীর ফকিরের প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে, মানুষ আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে—

হাশেম - আপনি (খোদেজা) বলছেন তিনি (তাহেরা) পীর সাহেবের বউ কিন্তু দুজন সাক্ষীর সামনে একটা কাগজে কী লেখাপড়া হয়েছে তার কোনোই দাম নাই? সামনে থাকলে আমি এখনই সেটা কুটি কুটি করে ছিড়ে ফেলতাম। আমি পীর সাহেবকে গিয়ে বলছি সে কথা। আমার আর ভয়-ডর-নাই। আর আমি কাউকে ভয় করি না।[২৩১]

ধর্মীয় কুসংস্কারের বেদীতে নবজাগ্রত মানবতার উদ্বোধন করেছেন নাট্যকার। সামন্তবাদ ও ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের ভিতে আঘাত পড়েছে, নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে। হাতেম আলী জমিদার--সামন্ত প্রতিনিধি তিনি। সামন্ত-যুগীয় চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধে তিনি লালিত, প্রাচীন জীবনবোধকে আঁকড়ে ধরে থাকতেই অভ্যস্ত। জমিদারি নিলামে উঠতে যাচ্ছে শুনে বৌ-ছেলে কষ্ট পাবে, তাই অসুখের ভান করে হাতেম আলী শহরে এসেছেন—যদি বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে জমিদারি রক্ষা করা যায়, এই আশায়। কিন্তু টাকার ব্যবস্থা না করতে পেরে তিনি হা হুতাশ করেছেন—

হাতেম আলী - পীর সাহেব, আপনি আছেন আপনার খেয়ালে। এক বিবি গেলে আপনি আরেক বিবি আনতে পারেন। কিন্তু আমার জমিদারি একবার গেলে আর ফিরে আসবে না, একবার সর্বশান্ত হলে আমি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। এখন আমি সর্বশান্ত হতে বসেছি। বুকে আর এতটুকু সাহস নাই। বিবিকে আর ছেলেকে যে কথাটা খুলে বলব, সে সাহস পর্যন্ত পাচ্ছি না।[২৩২]

...জমিদারী বাঁচাবার আর কোনো পথ নাই। মধ্যে কেবলমাত্র একটি রাত, তারপর বুদ্বুদের মতো জমিদারি শূন্যে মিলিয়ে যাবে, আর সজ্ঞানে সুস্থ দেহে আমাকে তাই চেয়ে দেখতে হবে, করার কিছুই থাকবে না।[২৩৩]

---

২৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
২৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
২৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

হাশেম আলী ও তাহেরা নতুন গঠনশীল সমাজব্যবস্থার এবং মূল্যবোধের প্রতিভূ। পিতার মত সে জমিদারিতে নির্ভরশীল নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সে আগ্রহী। এই মানসিকতার সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে। নাটকের শেষ পর্যায়ে সে বলেছে—

> জমিদারী! জমিদারী কি? কত জমিদারী এসেছে—গিয়েছে। আজ মাটি খুড়লেও কত কত বিশাল জমিদারীর কোনো নাম নিশানা পাওয়া যাবে না। তার তুলনায় আমাদের কী-ই বা ছিল। তাও না হয় আজ যাবে, কী আসে যায় তাতে।[২৩৪]

সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাসের চেয়ে হৃদয়ের মূল্য তার কাছে অনেক বড়। তাহেরার সমস্যাকে সে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে—তাকে ভালোবেসে তাকে নিয়ে ভিন্ন সমাজে ভিন্ন সংসারে প্রবেশ করেছে। মধ্যযুগীয় সংস্কার, প্রাচীন প্রথার বেড়াজাল ভেঙ্গে নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে।

তাহেরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভূমিকা পালন করেছে। সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর—

> যে বুড়ো পীরের সঙ্গে বাপজান আমাকে বিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মুরিদ। অবশ্য আমি না, আমার বাপজান ও সৎমা তাঁর মুরিদ। বছরে দু'বছরে পীর সাহেব একবার এলেই তারা তার খাতির খেদমত করবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। (থেমে হঠাৎ রেগে) আমি কি বকরী ঈদের গরু-ছাগল নাকি?[২৩৫]

পীর সাহেব কেবল বুড়ো বলেই তাঁকে সে ত্যাগ করেনি, যে কোনো যুবককে ভালোভাবে না জেনে শুনে বিয়ে করতে নারাজ। এখানে তার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। তাই হাশেম আলী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে তাকে বলেছে—

তাহেরা – আমার মত থাকবে সে কথা আপনাকে কে বলল?

হাশেম- ...তবে আপনার কাছে সে কথা আমি বলি নাই।

তাহেরা – না-বললেও আপনি তাই ধরে নিয়েছেন।

খোদেজা – ...আমার ছেলে বিয়ে করতে চাইলে তুমি তাতে মত দেবে না।

তাহেরা – সে কথাও আমি বলি নাই। তবে একজন ঝোঁকের মাথায় কেবল বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যই যদি কাউকে বিয়ে করতে চায়, তবে সে অত সহজেই মত দেবে কেন? ঝোঁক কেটে গেলে আপনার ছেলের মনে হতে পারে তিনি ভুল করেছেন।[২৩৬]

---

২৩৪. পূর্বোক্ত. পৃ. ৪

২৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

তাহেরা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নির্ভীক রমণী, প্রচলিত নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সোচ্চার—

তাহেরা – আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিই নাই। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

বহিপীর – ...আপনি মত না দিলেও আপনার বাপজান দিয়াছেন। তাহা ছাড়া সাক্ষী সাবুদ সমেত কাবিননামাও হইয়া গিয়াছে। এখন সে কথা বলিলে চলিবে কেন।...দেখুন, মন দিয়া আমার কথা শুনুন।

তাহেরা – ...আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার উপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাবো না।[২৩৭]

এই দৃঢ়চেতা নারীও শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে পড়ে বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে—

কী আর করবো (একটু হেসে) যে লোক বৃদ্ধ হয়েও এত বুদ্ধিমান তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।[২৩৮]

কিন্তু হাশেম তা হতে দেয়নি—

...আপনাকে বাঁচাব। আপনাকে বাঁচাবার সময় আমার হয়েছে। এখন আপনাকে আর ছেড়ে দিতে পারি না।[২৩৯]

পীর সাহেবের ভণ্ডামি, যৌন-পিপাসা, স্বার্থবাদী মনোভাব শেষ পর্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের চাপে পরিবর্তিত হয়েছে। নাটকের শেষে পরাজিত নায়কের মত ব্যথা ও উত্তেজনা মিশ্রিত কণ্ঠে বলেছেন—

আমাকে আপনারা কী ভাবিয়েছেন, আমি পীর হইয়াছি বলিয়া কী মনুষ্য নই। ভাবিতেছেন, আপনারা সবাই একেকজন দয়ার সাগর আর আমি একটি হৃদয়হীন পশু, বেদরদ বেশরম জলহাদ? জমিদার সাহেব বিনা শর্তে আপনি টাকা পাইবেন। ইহা দান নয়, ইহা পীরিদান্যতাও নয়। আপনাকে ইহা লইতেই হইবে। আমার বিশেষ অনুরোধ।[২৪০]

....

আমার আর কোনো শর্ত নাই। সকলে মিলিয়া আমাকে অমানুষে পরিণত করিয়াছেন। জমিদার সাহেবের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল যে, তিনি আমার দলে থাকিবেনই, কিন্তু তিনিও আমাকে ঠকাইলেন। আর

---

২৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
২৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
২৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
২৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

> কিছু না থাকিলেও আমার জোব্বার সম্মান তো দিবেন? না, ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। মনে করিবেন, ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবী।[২৪১]

জমিদার হাতেম আলী পীর সাহেবের টাকা নিতে রাজি হননি, হাশেম তাহেরাকে নিয়ে পুরানো সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙ্গে নতুন জীবনের পথে পাড়ি জমিয়েছে। বহিপীর চরম পরাভব মুহূর্তেও নিজেকে ভিন্নভাবে নির্মাণ করেছেন। হাশেম-তাহেরা বজরা ছেড়ে চলে যাওয়ার মাধ্যমে যে পরিবর্তনের সূচনা, নবতর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার যে ইঙ্গিত আভাসিত হয়েছে তা উপলব্ধি করেই তিনি ভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সচেষ্ট হয়েছেন :

> এতক্ষণে ঝড় থামিল। তাহারা গিয়াছে, যাক। তাছাড়াতো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নোতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল যাইবেই।[২৪২]

সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এসেছে. নবীন-প্রবীণদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত শেষে নবীনের বিজয় ঘোষিত হয়েছে। নতুন জীবনবোধে উজ্জীবিত না হয়ে পুরোনো সংস্কারকে আঁকড়ে ধরেই বহিপীর তার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন—

> আমরা থাকিব ; আপনার জমিদারীও থাকিবে ; আমরা আমাদের পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে সুখে স্বচ্ছন্দে বাকী দিন কাটাইয়া দিব।...কোন বদ দোয়া পীরের গায়ে লাগে না। আসুন জমিদার সাহেব, আমরা আপনার জমিদারী রক্ষার ব্যবস্থা করি।[২৪৩]

প্রগতিশীল শক্তির যখন বিকাশ ঘটে তখন মৌলবাদ ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত মূলবোধ নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এভাবে হয় সংঘবদ্ধ। হাশেম আলী বহিপীরের মিলন তাই সমাজ সত্য, নাট্যকারের সময় ও সমাজ সচেতনতারই রূপক।[২৪৪]

খোদেজা সংস্কারে বিশ্বাসী, প্রচলিত ধর্মবোধে আস্থাশীল। তাঁর বিবেচনায় তাহেরার ঘর ছেড়ে পালানোটা সমীচীন নয়। পুত্র হাশেম আলী তাহেরার প্রতি আকৃষ্ট হলে সে বিচলিত হয়ে পড়েছে। সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে, আধুনিকতার স্পর্শে সমাজ-জীবনে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। সামন্তবাদী চিন্তা-চেতনার মূলে কুঠারাঘাত পড়েছে। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি সাধন হচ্ছে, কিন্তু সামন্ত মূল্যবোধাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত

---

২৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

২৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

২৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

২৪৪. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবন দর্শন ও সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসেনি। কুসংস্কার ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন এই মধ্যবিত্ত সমাজ প্রাচীন সংস্কারকে আঁকড়ে ধরেই জীবনের শেষ প্রান্ত অতিক্রম করতে চেয়েছে।

'বহিপীর' নাটকে প্রতীকী পরিচর্যা বা ইঙ্গিতময়তা লক্ষণীয়—

> ...পীরের বইয়ের ভাষায় কথা বলাটা পরজীবী ও ভণ্ড এই শ্রেণীটির স্বভাবের কৃত্রিমতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, দ্বিতীয়তঃ বজরা, যা জমিদারের চলমান-প্রাসাদ, পুরোনো মূল্যবোধের আশ্রয়ের প্রতীক যদি হয় তাহলে সেই বজরা থেকে বেরিয়ে নবীন-নবীনা নায়ক-নায়িকা চলে যেতে থাকে তা হয়ে ওঠে পুরনো থেকে পলায়ণ—প্রাচীনের সংকীর্ণতা থেকে জনতার বিশালতায় মিশে যাওয়া।[২৪৫]

মঞ্চ পরিকল্পনায়, চরিত্র-চিত্রণে, আঙ্গিকে, ঘটনা সংস্থাপনে, সংলাপ সৃষ্টিতে 'বহিপীর' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমাজ-সচেতন ও নিরীক্ষামূলক নাটক হিসাবে সার্থকতার দাবিদার।

৩০

আবদুল মতিন সরকার রচিত 'অভ্যুদয়' চার অঙ্কবিশিষ্ট এবং বারটি দৃশ্য সম্বলিত নাটক। বিভিন্ন দল ভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতা নিয়ে সংঘর্ষ এ নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। নাটকটিতে দুটি শ্রেণীর চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়--একদল, ক্ষমতালোভী দুর্নীতিপরায়ণ, অন্যদল নবীন ন্যায়-আদর্শের ধারক ও বাহক। নাটকটি প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়—

> সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, আদর্শ-প্রবুদ্ধ নবীন আর বিষয়চিন্তা-বিভোর প্রবীণ, এদের মধ্যে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব, তাই এ নাটকের মূল বিষয়বস্তু।[২৪৬]

প্রবীণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন বোরহানুদ্দিন খান, শেখ কলিমুল্লাহ, মির্জা সাহেব, খানবাহাদুর নওশের আলী, কুদরতুল্লাহ বেগ, চৌধুরী সাহেব, লতিফ সাহেব, শহীদ সাহেব প্রমুখ। নবীনদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তরুণ সাংবাদিক হায়দার, ওসমান ও রফিক তাকে সহযোগিতা করেছে। ভোটের সময় নির্বাচন প্রার্থীর দল আদর্শের রঙিন বুলি কপচাতে দ্বিধাবোধ করে না কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পরে আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়, বিস্মৃত হয় সমস্ত প্রতিশ্রুতির কথা—

---

২৪৫. সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মিনার্ভা বুকস্ ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃ. ২৯০

২৪৬. আবদুল মতিন সরকার, অভ্যুদয়, ৫৪, ইসলামপুর রোড, (বাবু বাজার) ঢাকা-১ থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত। অভ্যুদয় সম্পর্কে খোন্দকার আবদুর রহিমের মন্তব্য দ্রষ্টব্য

হায়দার। তাহলে যেসব ওয়াদা করে এত ভোট পেয়ে নির্বাচনে জয়ী হলেন, সেসব ওয়াদার কথা বিলকুল ভুলে যাওয়াই কি পলিটিক্স করার অর্থ শেখ সাহেব?

কলিম। হ্যা-হ্যা-হ্যা। ওয়াদা! পলিটিক্স করতে গেলে ওয়াদা সে তো করতেই হবে, নইলে লোকে ভোট দেবে কেন? কিন্তু তার মানেই তো লোকের কেনা গোলাম হয়ে থাকা নয়। নিজের সময়াসময় ভালোমন্দ বলে কি একটা জিনিস নেই।[২৪৭]

চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে হায়দারকে কেন্দ্র করে প্রগতি পার্টির বিরুদ্ধে রীতিমতো একটা দল পাকিয়ে উঠেছে। হায়দার আদর্শবাদী তরুণ, এই সমস্ত নোংরা রাজনীতি তার কাম্য নয়, সে প্রতিবাদ করেছে—

হায়দার। ...যে করে হোক, রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলাতে হবে। যেটা মিথ্যা, সেটা অন্যায়, সত্যিকার কল্যাণ তার মাঝে থাকতে পারে না। যেটা থাকে সেটা ভুল, সেটা—[২৪৮]

প্রধানমন্ত্রী বোরহানুদ্দিন খান সাহেবের কন্যা সুফিয়া দেশপ্রেমিক হায়দারের আদর্শকে শ্রদ্ধা করে। সে তার পিতার ধ্যান-ধারণায় আস্থাবান নয় বলে হায়দারকে তার পিতার অনুগামী না হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে—

সুফিয়া। ...তাহলে সত্যি করে বলো, সব ভুলে গিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমি সংগ্রাম করে যাবে। —মিথ্যে লজ্জায়, মিথ্যে হৃদয়াবেগে পিছ-পা হবে না, একথা বলতেই আজ আমি এসেছি। ...কেন জানিনে, দেশের কথা ভেবে আমার মনটাও বড় উতালা হয়ে উঠেছে। বলো—বাবা দুঃখ পাবেন, শুধু এই ভেবে তুমি পিছিয়ে যাবে না।[২৪৯]

ইলেকশনের সময় হায়দার বোরহানুদ্দিন খান, কলিমুল্লাহ, মির্জা সাহেব এদের পক্ষে কাজ করেছে, এদের সম্পর্কে তার খুব ভাল ধারণা ছিল, পরবর্তীতে এদের স্বার্থপরতা, নীতিবর্জিত কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে হায়দার প্রতিবাদ করেছে। তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে তবুও সে তার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে—

হায়। এখন কিছুতেই পিছিয়ে যাবার জো নেই আব্বা। আমাদের নতুন পার্টির প্রতি সেটা হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। তাছাড়া যে উদ্দেশ্যে এতদিন কাজ করেছি সে উদ্দেশ্যও মাটি হয়ে যাবে। এটি আপনাদেরই পছন্দ হয় আব্বা?

---

২৪৭ আবদুল [illegible] সরকার, অভ্যুদয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পৃ. ১৫

২৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

২৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

ইয়া। খুব পছন্দ হবে বাপু, খুব পছন্দ হবে। ওসমানের বাবা শুনতে পেলে কমসেকম পাঁচশো টাকা খরচ করে মসজিদে শিন্নি দেবে...গণতন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে দু'বছরে চারবার জেল খেটেছো, আর কেন?

....

মায়। দেশের কথাটা একবার ভেবে দেখুন তো দাদা। দেশ জুড়ে দুঃখের আগুনে কত জীবন যে তিলে তিলে পুড়ে মরছে। ওদের প্রতি কি আমাদের কোনো কর্তব্য নেই? আমরা মানুষ—না পিশাচ![২৫০]

নির্বাচন নিয়ে দুইদলের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যায়। রাজনৈতিক কর্মীদের কারো প্রাণ যায়, কেউ বা আহত হন। পরবর্তীতে বোরহানুদ্দিন খান নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে হায়দারের আদর্শ, চিন্তা-চেতনাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন—

বোর। ...আমাকে শুনিয়ো না হায়দার, আমাকে শুনিয়ো না। আর আমি চাইনে—আর আমি চাইনে আমার হাত ছুঁয়ে দেশের শাসন দণ্ড কলঙ্কিত করতে।

হায়। আপনার ভুল ভেঙেছে, আপনাদের কর্তব্যবোধ আজ জেগে উঠেছে—আজই তো আপনারা সে দণ্ড ছোঁবার যোগ্য।

....:

হায়। দেশের যারা ভালো চায়, মানুষের প্রতি নিজের কর্তব্যকে যারা বোঝে—বহু বছরের লাঞ্ছনা সয়েও দেশ তো আজ তাদের দিকেই চেয়ে আছে......।[২৫১]

সুফিয়া-হায়দারের দ্বন্দ্বমুখর প্রেমের সুখকর পরিণতির ইঙ্গিত দানে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে। বিভিন্ন দল ভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে 'অভ্যুদয়' নাটকটি রচিত হলেও নাট্যকার সমকালীন রাজনৈতিক সত্যকে উপস্থাপন করেছেন। 'নীরস বিষয়বস্তুর অবলম্বন, আর রসসৃষ্টির সাধনা, এ দুয়ের মধ্যে নাট্যকারকে দুস্তর পথে চালাতে হয়েছে অভিযান। লেখক যে অভিযানে ব্যর্থ হয়েছেন একথা বলার উপায় নেই।[২৫২]

বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য চর্চায় ভাষা আন্দোলন বিপুল প্রাণাবেগ ও গতি সঞ্চার করেছে। এ আন্দোলনকে ঘিরে এদেশের সাহিত্য চর্চায় একটি প্রতিবাদী ধারা সংযোজিত হয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ভাষা আন্দোলনের ক্রোধ, ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুন কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প ও গানে যেভাবে ধরা পড়েছে, নাটকে ততটা নয়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি, মুক্ত চিন্তার

---

২৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

২৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬

২৫২. পূর্বোক্ত, 'অভ্যুদয় সম্পর্কে' দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী নাট্যকারদের নাট্যচর্চার গতিপথ কিছুটা রুদ্ধ করেছিল। প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করে নাট্যশিল্পের মত একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম অধিক পরিমাণে সৃজন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ভাষা আন্দোলনের এ আবেগ শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সমাজজীবনেও সচেতনতা এনে দিয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেহনতি জনতার মধ্য থেকে সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটেছে, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটকের অধিকাংশেই গ্রামীণ জীবন ও সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রামের জোতদার ও প্রভাবশালীদের চক্রান্ত, ভণ্ডপীর ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের ধর্মীয় অনাচার, মৌলবীদের গোঁড়ামি, শোষণ ও ধর্মান্ধতা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত করে তুলেছিল। সেই সাথে চোরাকারবার, কালোবাজারী, বহুবিবাহ সমস্যা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর দূরাবস্থা ও বংশগরিমা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত নিম্নবিত্ত পরিবারের করুণ চিত্রও সমকালীন নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই, এই সময়ে রচিত নাটকের সংখ্যা সীমিত হলেও সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে এর গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি ঘটে যাওয়া ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ কাহিনী এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল জাতীয় জীবনেও এর তাৎপর্য ছিল ব্যাপক ও গভীর। ভাষা আন্দোলনই কালক্রমে ছাত্র-জনতার বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এদেশ থেকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটায়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ষাট দশকে ছাত্র জনতার আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটকে তার প্রভাব

ভাষা আন্দোলন এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন প্রভাব বিস্তার করে তেমনি বাঙালির জাতীয় জীবনে এক নতুন বোধের উন্মেষ ঘটায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার পাশাপাশি এদেশের প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের স্বাধীন চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করতে থাকে। ছাত্র আন্দোলন ক্রমশ বৃহত্তর জনতার আন্দোলনে পরিণত হয় এবং স্বাধীন জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এদেশের জনসাধারণকে পাক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একের পর এক অবরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পাক দমননীতি যত কঠোর হতে লাগলো, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং অধিকার আদায়ের আন্দোলনও তত তীব্র হতে লাগলো। ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ জনতার মধ্য থেকেও বেরিয়ে আসতে থাকে নেতৃত্ব দেবার মত কর্মী, প্রাণপুরুষ। ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও তারা সচেতন হয়ে ওঠেন। ক্রমে ক্রমে পুঁজিবাদী বেনিয়া স্বার্থান্বেষী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকে। ভাষাগত অধিকার একসময় স্বাধীনসত্তা হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি যোগায়। ধীরে ধীরে কৃষক, শ্রমজীবী, চাকুরিজীবী, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণীও এই আন্দোলনে শরিক হন। ছাত্র রাজনীতি বৃহত্তর জনসাধারণের অধিকার আদায়ের সোচ্চার কণ্ঠ হয়ে ষাটের দশকের শেষার্ধে গণঅভ্যুত্থানের রূপ লাভ করে এবং দৌর্দান্ত প্রতাপশালী আইয়ুব শাহীর পতন ঘটে। পাকিস্তানি শাসনের পুরো সময়টাই ছিল ছাত্র জনতার সংগ্রামের কাল। ভাষার দাবির পর এদেশের ছাত্র জনতা ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়, শাসক-শোষক ও উভয় অংশের সুবিধাবাদী, তোষামদকারী আমলা ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই রুখে দাঁড়ানো ছাত্র জনতার আন্দোলন ১৯৬৯ সালে এসে রুদ্ররোষে ফেটে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের পর ষাটের দশকের ছাত্র জনতার আন্দোলন এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়সীমার রাজনৈতিক বিবর্তনগুলো বাংলাদেশের সামাজিকতায় বেশ প্রভাব ফেলে এবং সমকালীন নাটকের মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এই পর্যায়ের নাটকগুলোকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়—

ক. রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ নাটক।

খ. সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নাটক।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ নাটক

আস্‌কার ইবনে শাইখের 'অনেক তারার হাতছানি' নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত। কোনো দৃশ্য পরিকল্পনা নেই। এ নাটকে নাট্যকার ১৮৫৭ সালে ঢাকায় সিপাহীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের সঙ্গে ১৯৬২সালে সংঘটিত এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন।[১]

এ নাটকে একশ' বছরের অগ্নিঝরা ইতিহাসকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবনের জন্য এদেশের তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নাটকটি প্রসঙ্গে সুকুমার বিশ্বাস লিখেছেন—

> ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল—বিদেশী নাগপাশ থেকে এদেশকে মুক্ত করার প্রয়াস। আর এজন্যে অসংখ্য দেশপ্রেমিক নাগরিককে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছিল সেদিন। অপরদিকে সাতচল্লিশ পরবর্তীকালে পাক-শাসিত বাংলাদেশে এদেশের মানুষকে মাতৃভাষার মর্যাদা দানের জন্যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে বার বার জীবন দিতে হয়েছে। এই ইতিহাস চেতনার পুনরুল্লেখের মধ্য দিয়ে নাট্যকার এদেশের তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন অন্যায় অবিচার নিপীড়ন আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে।[২]

১৯৬৪ সালের কোনো এক অমাবশ্যার অন্ধকার রাত্রে ভিক্টোরিয়া পার্কের শহীদ মিনারে মুক্তি সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একদল তরুণ পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে গেল। সেখানে থাকেন এক পাগলাটে ভদ্রলোক, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সন্তানহারা এক দুঃখিনী জননীর। সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় স্বৈরাচারী শক্তির করাল গ্রাসে নিহত যুবক রহিমের খোঁজে তার দাদু ও হতভাগিনী মা এসেছেন। এই পাগলাটে ভদ্রলোক—বর্তমান কালের মধ্য বয়সী এক অধ্যাপক। একশ' বছর গোলামির নির্মম ইতিহাস তার স্মৃতিতে আজও অম্লান—

> একশ' বছর আগেকার কাহিনী। দিনের পর দিন সেই কাহিনীতে ডুবে ছিলাম ক্রমে কাহিনীর লোকজন আকৃতি নিয়ে আমার চোখে ধরা দিল। আমাকেও আমি খুঁজে পেলাম সেখানে। কিন্তু আজ যেন তাদেরকেই দেখতে পাচ্ছি এখানে। এমনি এক মা, এমনি এক দাদু আর—[৩]

কানপুর-দিল্লীর বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতে। ঢাকায়ও লাগল তার ঢেউ। বিদেশী বেনিয়াদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এদেশের মুক্তিকামী তরুণ সিপাহীরাও সশস্ত্র বিদ্রোহ করলো। এই

---

১. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ২৬৫
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫
৩. আসকার ইবনে শাইখ, অনেক তারার হাতছানি, আবিদ আজাদ সম্পাদিত আস্‌কার রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড) পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহে দেশের মানুষের সঙ্গে শরিক হলো এক দুঃখিনী মায়ের একমাত্র সন্তান হাসান। হাসানের দাদু যিনি মজনু শাহের বিপ্লবী আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন—

দাদু : পঙ্গু হয়ে গেছি তখন থেকে। একেবারে পঙ্গু। তারপর তিতুমীর নিয়ে গেল তোর আব্বাকে। যাবার সময় যে আমাকে বলে গেল—আব্বা তুমি কেঁদোনা। খোকা রইল, আমি ফিরে না এলে ওকে তুমি বুকে নিয়ো।[৪]

হাসান বিপ্লবী তরুণ, তার চোখেও সেই সংগ্রামের বহ্নিশিখা জ্বলছে—

হাসান : ... এদেশের ঘরে ঘরে আজ এমনি শূন্য হাহাকার। তোমার চোখে আজও সেই আযাদ দেশের স্বপ্ন। কি করে বুঝাব তোমাকে, এই হাহাকারের বেদনাই আজ গোলামের দেশে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে।[৫]

দাদু হাসানকে তার অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন—

দাদু : হাসান। তোর দেহের শিরায় শিরায় বইছে এমন রক্ত, তোর খান্দানে এমন ঐতিহ্য, দুঃখের সাগরে পাড়ি জমাতে যা ভয় পায় না। জুলুমের প্রতিবাদে মৃত্যুর সঙ্গে যা পাঞ্জা ধরে, প্রিয়জনের চোখের পানি মুছে দিয়ে যা চলার পথকে এগিয়ে দেয়। সে রক্ত, সে ঐতিহ্য, তোমার হাসান, তোমার।[৬]

হাসানের মায়ের ইচ্ছা ছিল তার একমাত্র সন্তান বিয়ে করে সংসারী হবে কিন্তু সে তার পূর্ব পুরুষের পথ অনুসরণ করে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বেনিয়া গোলাম পীতাম্বর পত্নী মৌদামিনী সে হাসানের দলেরই একজন কর্মী তারই উদ্যোগে যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সে জেবুন্নেসাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে। নববধূকে ঘরে রেখে কর্তব্যের আহ্বানে সে পথে নেমে পড়েছে। রাতের অন্ধকারে প্রচণ্ড লড়াই করেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। দুঃখিনী জননী ছুটে এসেছিল রাস্তায়। 'কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না যে আম্মা ...ওদের শক্তি ছিল বেশি, আর আমরা ছিলাম শৃঙ্খল[৭], বলে মুদাররেসও হারিয়ে গেল।

নাটকের শেষ অঙ্কে পাগলাটে ভদ্রলোকের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার একশ' বছরের ব্যবধানে দুই প্রান্তে অবস্থিত দুই বীর শহীদকে একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন—

পা: লো: ... একশ' বছরের দুই প্রান্তে দুই মা, দুই ছেলে। তোমরা এক হয়ে কত ছেলে, কত ছেলের মনের কথা দিয়ে এক রোদনভরা কাহিনীকে আপন করে নিয়েছ—ঐ দেখ মা, আসমানে কত তারা ফুটেছে। সন তারার ফুল। কালো রাতে ওসব তারার ফুল ফোটে। ঐ দেখ ছায়াপথ। তারায় তারায় গড়া, তারার আলোয় ভরা এক পথ। ওদের হাতছানি এক সময়ের সাগর পেরিয়ে অন্য সময় পৌছয়।[৮]

---

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালের পরের এক মধ্যবয়সী অধ্যাপক, যাকে নাটকে পাগলাটে লোক বলা হয়েছে। তিনি একজন দেশপ্রেমিক, আদর্শের প্রতীক। নাট্যকার তার সংলাপের মধ্য দিয়ে দেশকাল ও সমকালীন সমাজ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন—

পা: লোক : একটা অজানা শক্তি। দুনিয়ার যত কান্না, যত ক্ষোভ, যত আক্রোশ, যুগের পর যুগ সব পুঞ্জীভূত হয়ে সে শক্তিকে আরো চঞ্চল করে তুলেছে। ভয় দেখাচ্ছে। এখনো যারা জুলুমের ইতিহাস রচনা করে চলেছে, তাদেরকে।

আমান : বাতাস যে খালি বাড়তির দিকে।

পা: লোক : নাড়া লাগে যে। কত যুগ ধরে জমা হচ্ছে। জমে জমে সবটা আক্রোশ এক হয়ে গেছে। তার মধ্যে পড়েছে কত চোখের পানি। আরও জমাট বেঁধেছে পানি পেয়ে কংক্রিট যেমন জমে শক্ত হয়ে যায়, তেমনি। কোথাও কোন কিছুর নাড়া লাগলেই সবটা এক সঙ্গে দুলে ওঠে। আজ তা-ই হচ্ছে। যতই দোলা লাগছে, যতই চাঞ্চল্য বাড়ছে, ততই বিগত দিনের হাহাকার জেগে উঠছে।[৯]

এ সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সাত চল্লিশ পরবর্তী বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগ্রাম মুখর উত্তাল দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ' নাটকে বর্ণিত প্রতিটি চরিত্রই সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। 'অনেক তারার হাতছানি' নাটকের এক প্রান্তে আছে স্বদেশের প্রতি তীব্র অনুরাগ, অন্য প্রান্তে আছে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। ১৮৫৭ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চিত্র তুলে ধরে নাট্যকার দেশের তরুণ সমাজকে জাগিয়ে তুলেছেন, পূর্ব পুরুষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

২

ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত মুনীর চৌধুরীর সর্বাপেক্ষা বাস্তব ও সার্থক সৃষ্টি 'চিঠি'। ১৯৬২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ নাটকের পটভূমি। নাটকের পাত্র-পাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, প্রক্টর, পুলিশ অফিসার প্রমুখ। সমগ্র নাটকটি কৌতুকাবরণে আবৃত।[১০] এই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের অসম্মতি ও পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি নিয়ে এক ধরনের ছাত্র-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ আন্দোলনের পার্শ্ব কাহিনী হিসাবে নাট্যকার তুলে ধরেছেন ছাত্র-

---

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
১০. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রীদের প্রণয়- ঘটিত অন্তর্দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ, প্রক্টরের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও ক্ষমতা প্রদর্শনের হাস্যকর প্রচেষ্টা।

নাট্যকাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তেজোদীপ্ত ডাকসাইটে ছাত্রী মিস মিনা মিনহাজ বিভাগীয় সেমিনারে বসে তারেকের কাছ থেকে সোহরাবের একটি টিউটোরিয়াল খাতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাই আসন্ন পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারের অন্যতম প্রতিযোগী সোহরাব তারেকের উপর ক্ষেপে উঠেছে—

> ... তোমরা মিস মীনা মিনহাজকে জানো না, পরীক্ষার ব্যাপারে একেবারে রাক্ষসী প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করতে ওর কুহকের অন্ত নেই। আমার খাতাটা ও চিবিয়ে খাবে, নিজেরগুলো তার সঙ্গে মিশিয়ে চিবোবে। তারপর পরীক্ষার খাতায় সে সব জিনিস এমনভাবে উগলে দেবে যে, সাধ্য কি পরীক্ষকরা তাকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলে রাখে।[১১]

এছাড়াও সোহরাবের ঐ খাতার মধ্যে ছিল খালেদের হাতে লিখিত তারেকের নামে হৃদয়ের উষ্ণ আবেগ মিশ্রিত একটি চিঠি। যা মীনাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজস্বী নায়ক সোহরাব দুশ্চিন্তায় ভুগছে যেহেতু পত্রটি তারই খাতায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সেহেতু মীনা নিশ্চয়ই তাকে ছদ্মনামধারী প্রেরক বলে সন্দেহ করছে। আবার তারেক ও খালেদ এরাও ভাবছে মিনা তাদেরকে সন্দেহ করছে। গভীর রাত পর্যন্ত তিন বন্ধুর এই সমস্যা নিয়ে বাকবিতণ্ডা চলেছে।

অন্যদিকে পরীক্ষা পিছানো আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী রমীজ তার সহচর আফতাব, খয়েরকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, মেধাবী ছাত্র সোহরাবের ঘরে ঢুকে তার সমর্থন কামনা করেছে। রমীজ তার আন্দোলনের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছে—

> রমীজ। ... আপনি বোধহয় খবর পেয়ে থাকবেন যে, আজকে আমতলায় এক বিরাট ছাত্র সভার আয়োজন করেছিলাম। তাতে আমরা সাধারণ ছাত্ররা, সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আমরা আমাদের আগামী যাবতীয় পরীক্ষাসমূহের তারিখ পেছোবার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবো। যদি কর্তৃপক্ষ তারিখ পিছিয়ে দিতে রাজী হন ভাল, না হলে আমরা পরীক্ষা বর্জন করতে বদ্ধপরিকর। আমরা ঘুরে ঘুরে সবার মতামত সংগ্রহ করেছি। আপনি কি পরীক্ষা দেওয়ার পক্ষে, না বিরুদ্ধে।[১২]

আন্দোলনকারীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা এর বিরোধিতা করবে তাদের জরুরি নোটপত্র চুরি করে লুকিয়ে ফেলবে—

---

১১. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত মুনীর চৌধুরীর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, পৃ. ১৩০
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

রমীজ। ... যারা আমাদের বিরোধিতা করবেন আমরা তাদের জরুরি বই-খাতা ইত্যাদি গায়েব করে দেবো।[১৩]

এই অভিযানের প্রথম শিকার হয়েছে মিস মিনা। এরা মিনার পাঁচখানা টিউটোরিয়াল খাতা চুরি করে এনে সব উত্তরেই 'এ' দেখে চটে গিয়েছে—

আফতাব। ...... সবগুলো টিউটোরিয়াল রিমার্কই AAA। একেই বলে মুখ দেখে নম্বর। আহা-হা-কী আমার অধ্যাপক রে। লম্বা চওড়া কথার ঠেলায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত, ওদিকে নিজেরা সব এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন, সুযোগ পেলেই বৃন্দাবনের বাঁশুরিয়া।[১৪]

ছাত্র আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য প্রক্টর বদরুল হাসান মিনার ভাই পুলিশ অফিসার আসাদুজ্জামানের স্মরণাপন্ন হন। নাট্যকার বদরুল হাসান ও আসাদুজ্জামানের কথোপথনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন ও প্রক্টর হাসানের চরিত্রের ব্যর্থতার প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন—

আসাদ। ... এখন না হয় প্রক্টর হয়েছো, কিন্তু তাই বলে তো তুমি আর পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব নাওনি! তুমি মূলত অধ্যাপক। দেশের সত্যিকারের কবি, নেতা, করিগর সব তোমাদের পায়ে মাথা রেখে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কী নোবেল প্রফেশন, আর তুমি কিনা আমাদের চাকরীর সঙ্গে তোমাদের মহান দায়িত্বের তুলনা করছো?

হাসান। নোবেল প্রফেশনের নিকুচি করি। চোর-ডাকাতের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নিজে সুখে আছো। দিন দিন স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে, মনের স্ফূর্তি বাড়ছে। আর আমার দশা লক্ষ্য করেছো?

আসাদ। সৎসঙ্গ তোমার সহ্য হচ্ছে না।

হাসান। রসিকতা ফেলে রাখো। তুমি জানো না এই উনিশ কুড়ি বছরের পড়ুয়া ছেলেমেয়েগুলো কী সাংঘাতিক জিনিস। সব ঘূর্ণমান আগুনের ভেলা। যাবতীয় উদ্ভট চিন্তার ডিপো। কোনো দু'জনের আচরণ এক রকম নয়। কোনো একজনের দুটো আচরণ এক রকম নয়। সাধ্য কি আগে থেকে তুমি কোনো কাণ্ড আঁচ করো। যে ছেলে বাড়িতে কাঁটা বেছে মাছ খেতে জানে না, রাস্তায় নেমে সে ছেলেই বেয়োনেটের সামনে বুক পেতে দেয়। ক্লাসে মাস্টারের সামনে বসে থাকে ভীরু শশকের মতো, বাইরে সহপাঠিনীর সামনে নিজের বীর্যবান পৌরুষ জাহির করতে গিয়ে কী যে বলে আর না বলে তার কোন মা-বাবা নেই। যেমন হয়েছে ছেলেগুলো, তেমনি হয়েছে মেয়েগুলো।[১৫]

রমীজের আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে আফতাব পুলিশ অফিসারকে কটাক্ষ করে বলেছে—

---

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

আফতাব। আমরা জানতাম তিনি এখানে আসবেন। কিন্তু এতে আমরা ভয় পাই না। আমরা জানি যে গোপনে গোপনে কর্তৃপক্ষ আমাদের শায়েস্তা করবার জন্য পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমরাও তার জন্য প্রস্তুত। লাঠি, গুলী, বেয়নেট সব আমরা বুক পেতে নেবো। আমাদের ঐক্য অটুট। আপনাদের টিয়ার গ্যাস আমাদের সামনে পড়লে ফেটে লাফিং গ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে।[১৬]

পরীক্ষা পিছানো আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের সংলাপের মধ্য দিয়ে তরুণ ছাত্রসমাজকে ঘিরে নাট্যকারের বৃহত্তর চিন্তা-চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—

আফতাব। আপনি আমাদের হুমকি দিচ্ছেন? দেশের গোটা ছাত্র শক্তি আমাদের পশ্চাতে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমরা তরুণরাই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমরাই হলাম আগামী দিনের পরিষদ সদস্য, জাতীয় মন্ত্রী, দেশের শাসনকর্তা।[১৭]

পরীক্ষা পিছানো আন্দোলনের নেপথ্যে খাতাচুরি, চিঠি প্রদান, লিফলেট সংগ্রহ ইত্যাদি ঘটনা সংযোজন করে কাহিনীর গতি সঞ্চার করেছেন। সেই সাথে সংলাপের মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজের প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপটিও তুলে ধরেছেন—

...এই যে শ' শ' লিফলেট এখানে দেখছ, এগুলো পরীক্ষা পেছাবার মহা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিল স্বরূপ। বছরের হিসেব ক্রমিক নম্বর দিয়ে সাজিয়ে রেখেছি। তোমরা পুলিশের লোক এর আসল মূল্য কোন দিন বুঝবে না। আত্মত্যাগের মহাকীর্তি ঘোষণা করে যুগ যুগ ধরে এই মহান আন্দোলনের ধারা প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে।[১৮]

পরীক্ষা পিছানো আন্দোলন চরম পর্যায়ে এসে পৌছুলে ছাত্রাবাসের সভাকক্ষে ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে এক সভার আয়োজন করে। এ সভায় হঠাৎ সোহরাব উঠে সভাপতি রমীজের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করে—

...আমি সভাপতিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এই আন্দোলনের সংঘবদ্ধতা সম্পর্কে ওঁর দাবীর প্রমাণ কি? (সোরগোল) আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা আন্দোলনের সাফল্যের জন্য মৃদু বল প্রয়োগ আরম্ভ করেছেন কি? সকল সাধারণ ছাত্রকে কি জানিয়েছেন যে হোস্টেলে ঘন ঘন বাতি নেবে কেন? নেভায় কারা? (গোলমাল) আপনারা কি মেয়েদের খাতা অপহরণ এবং ছেলেদের ঘরে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ করা আরম্ভ করেন নি। এটা কি বল প্রয়োগ নয়? ...[১৯]

---

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

মীনা সোহরাবের এ' বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে এবং পরীক্ষা পেছানোর পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জানায়। দুই দলের মধ্যে দাঙ্গা বাধলো, জখম হলো সোহরাব, খালেদ, তারেক। সোহরাবের বন্ধুরা 'ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেবার জন্য সোহরাবকে দায়ী করে এবং মীনার কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে আসার জন্য বলে। এদিকে সভায় বক্তৃতা করার অপরাধে বড় ভাই কর্তৃক তিরস্কৃত হলে মীনা আত্মহত্যার সংকল্প করে। শেষ পর্যন্ত সোহরাব ও মীনার আকস্মিক মিলনের মাঝেই নাট্যকাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

চিঠি নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছাত্র আন্দোলন। পরীক্ষা পেছানোর দাবি আজকের দিনে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনাপ্রবাহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ এই আন্দোলনে বিরোধিতা করে বসে, ফলে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। অপর ছাত্রদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় পচা ডিম, পচা টমেটো, গোবর ইত্যাদি মিশ্রিত দুর্গন্ধ বস্তু নিক্ষেপ করার প্রবণতা। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও ছাত্রদের মত ছাত্রীদের মনোরঞ্জনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে চিঠি নাটকের কাহিনী সাজিয়েছেন, চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের নির্ধারিত তারিখ পিছিয়ে দেবার দাবি যে রীতিমতো একটা আন্দোলনে পরিণত হতে পারে, এই অসঙ্গতিকে নাট্যকার শানিত বিদ্রূপে পরিণত করেছেন এ নাটকে। সে বিদ্রূপ নির্বিশেষে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে নয়। এই আন্দোলনের পটভূমিকায় ভিন্ন মত পোষণকারী ছাত্রদের প্রতি বল প্রয়োগ, ভাল ছাত্রদের খাতা হারানো, ছাত্রছাত্রীদের প্রণয় ঘটিত দ্বন্দ্ব, প্রক্টরের কর্তব্যপরায়ণতা এবং আকস্মিকভাবে পুলিশ অফিসারের উপস্থিতি নাটকে প্রহসনের মেলা বসিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখলের প্রতিযোগিতা, ছাত্রছাত্রীদের গোপন ঈর্ষা, প্রতিপক্ষ ছাত্রকে পুলিশ কবলিত করতে চাওয়ার হীনতা, শিক্ষককে নিয়ে কার্টুন আঁকার আমোদ এবং প্রচারপত্র সংগ্রহে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাস্যকর প্রচেষ্টা।[২০]

সমালোচকরা কেউ কেউ চিঠি নাটকের কোন কোন চরিত্র দৃশ্য এমনকি উক্তি পর্যন্ত সত্য বলে মনে করেছেন। এ নাটকের বহু দৃশ্য ও উক্তি নির্ভেজাল সত্য, নামোল্লেখ না করলেও এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যশ জড়িত তাঁরা অনেকেই অনেক চরিত্রকে সহজেই চিনে নিতে পারবেন।[২১] বিশেষ করে তিনি কোন এক চ্যান্সেলরের উক্তির সঙ্গে প্রক্টর হাসানের নিম্নলিখিত সংলাপের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন—

তারেক। আপনি কি টের পেয়েছেন?

হাসান। যে আসলে ওরা রত্ন, রত্ন। যাকে বলে জুয়েল। গবর্নরের বক্তৃতা শুনে তোমরা হয়তো হেসেছ। কিন্তু আমি ঠিকই উপলব্ধি করেছি যে তোমরা সবাই আসলে এক একটা রত্নখনি। মনি মুক্তার স্বভাবই ঝকমক করা। প্রাণবন্ত তরুণ চিল্লাচিল্লি করবেই।[২২]

---

২০. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, ভূমিকা, মুনীর চৌধুরীর নাটক (১ম খণ্ড)

২১. নীলিমা ইব্রাহিম, বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, পৃ. ৪৫১

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া টিউটোরিয়াল খাতার ভেতর দিয়ে মিস মীনা মিনহাজের কাছে ছাত্রদের প্রেমপত্র প্রেরণ, এর অনুসন্ধান কাজে প্রক্টরের ব্যস্ততা বিশেষ করে মীনাকে সাহায্য করার ব্যাপারে তার অতি তৎপরতা ইত্যাদি মুনীর চৌধুরী যেন সকৌতুকে প্রত্যক্ষ করেছেন।[২৩] বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের সরস বাকপটু প্রক্টরের কথা অনেকেরই স্মরণ আছে।[২৪] ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল একটি আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তুচ্ছ ঘটনার ওপরে চড়া রং চাপিয়ে 'চিঠি' নাটকে মুনীর চৌধুরী নির্মল হাস্যরসের অবতারণা করেছিলেন। সম্ভবত পটভৌমিক কাল সম্পর্কেও নাট্যকারের তির্যক কিছু সহাস্য কটাক্ষ এই নাটকের কোনো কোনো চরিত্রে অথবা সংলাপে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।'[২৫] সমালোচকের মন্তব্য অনুযায়ী যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই তৎকালীন কোনো চরিত্র, উক্তি কিংবা দৃশ্য তিনি এ নাটকে চিত্রিত করে থাকেন, তবে বলতে হয়, এ প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক হয়েও মুনীর চৌধুরীর মত নির্ভিক নাট্যকার সে সময় খুব কমই ছিলেন। চিঠি নাটকে আফতাবের বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের প্রতি তার ঘৃণা, ক্রোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

> ... বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জবরদস্তী করে নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা চালু করে দিতে চান। ... আমরা জানি না, এদেশের আইনের অর্থ কি? পরীক্ষার অর্থ কি? অন্যের দফারফা করার জন্য এদেশের আইনের নামে উত্তেজিত নয় কে? আবার প্রয়োজন পড়লে এক আইনেরই ঘাড় মটকায়নি কে? বারটা বাজায়নি কে? তাঁকে কাঁচকলা দেখায়নি কে? আইন কি কেবল আমাদের বেলাতেই অনড়? ...তবে আমরাও বলে রাখি আমরা কি আশা পোষণ করি। কর্তৃপক্ষের গোঁয়ার্তুমির গোড়া আমরা উপড়ে ফেলব। টিম্বাকটুর এই পরদেশী ভাইস চ্যান্সেলারকে আমরা মোম্বাসা চালান করে দেব। ... [২৬]

পুলিশ অফিসার আসাদ চরিত্রটি ভিন্ন প্রকৃতির। তার মধ্যে কোমল মানসিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তার ব্যঙ্গাত্মক উক্তির মাঝে ফুটে উঠেছে সমকালীন দেশের চালচিত্র।

> হাসান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে মেম্বাররা এ্যাসেম্বলী ফাটিয়ে দিয়েছেন।
>
> আসাদ। তোমরা ক্লাসে গর্জাও, ছাত্ররা আমতলায়, অফিসাররা অফিসে। বেচারা নেতাদের হুংকার ছাড়বার জন্য নাগরিকদের তরফ থেকে পরিষদ ভবন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমার আপত্তি থাকা উচিত নয়।[২৭]

'চিঠি' নাটকে মুনীর চৌধুরী শুধুমাত্র নির্মল হাস্যরসের অবতারণা করেন নি। নাটকটির মূল ঘটনাপ্রবাহও হালকা নয়, বরং সামাজিক জীবন-সত্যকেই অতিশায়িত করে প্রহসনের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ নাটকে আন্দোলনকারী ছাত্রদের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের ব্যক্তিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে—

---

২৩. জিয়াউল হাসান, মুনীর চৌধুরীর নাটক, ১৩৯৭, পৃ. ৬৪
২৪. নীলিমা ইব্রাহিম, নাট্যকার মুনীর চৌধুরী, থিয়েটার, ঢাকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৭২, পৃ. ৮৮
২৫. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, কথা ও কবিতা, পৃ. ১০৩
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

> চিঠি এসে গেছে সংগ্রামের। আপোষহীন সংগ্রামের। সর্বশেষ সংগ্রামের। চিঠি এসেছে প্রতি সংগ্রামী ছাত্রের হৃদয়ে। চিঠি এসেছে আগামী দিনের ছাত্র শক্তির বিজয়বার্তা বহন করে।[২৮]

চিঠি নাটকের সংলাপ সৃষ্টি ও চরিত্র রূপায়ণে নৈপুণ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। ক্রীড়া বিশারদ খালেদ, সোহরাব, উদ্দেশ্যহীন ছাত্রনেতা রমীজ, নায়িকা মীনা, রুমা, প্রক্টর হাসান, পুলিশ অফিসার--এরা প্রত্যেকেই স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

৩

সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে রচিত সিকানদার আবু জাফরের 'মাকড়সা'[২৯] বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। রূপকধর্মী এই একাঙ্কিকার চরিত্রসমূহ হলো--হাকিম, পুলিশ অফিসার, আসামি, পাঁচজন সাক্ষী, সরকারি উকিল, কনেস্টবল এবং জনতা। 'মাকড়সা' সম্বন্ধে নাট্যগবেষক ইসমাইল মোহাম্মদ লিখেছেন, 'পাকিস্তানি নিগড়ে আবদ্ধ লাঞ্ছিত লুণ্ঠিত বাঙালির অন্তরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফল্গুপ্রবাহের একটি মূল্যবান দলিল মাকড়সা।[৩০]

একটি আদালতের দৃশ্যে উপস্থাপিত ঘটনাবলীর আঙ্গিক নিরীক্ষা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রূপক একাঙ্কিকা মাকড়সার মঞ্চ নির্দেশনাও ভিন্ন রূপ—

> আদালতের কামরায় কৌতূহলী জনতা মামলার শুনানীর জন্যে উৎকণ্ঠিত এবং উত্তেজিত। একদিকে পুলিশের হেফাজতে দাঁড়িয়ে আছে আসামী। বিচিত্র বেশবাস। নরখাদকের ক্রুর দৃষ্টি তার চোখে। সারামুখে ছড়িয়ে আছে অশ্লীল উপেক্ষার হাসি। অন্যদিকে পাঁচজন সাক্ষী এক জায়গায় জড় হয়ে আছে—সবারই উন্মাদের মত চেহারা। আচরণও অসংযত। মাঝে মাঝে তাদের একজন হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছে 'আমার স্বপ্ন ফিরিয়ে দাও' 'চোর চোর আমার স্বপ্ন চুরি করে নিয়ে গেছে' ইত্যাদি। এদেরও খবরদারী করছে কয়েকজন পুলিশ কনেস্টবল। আদালতের কাজ শুরু হতেই সাক্ষী কাঠগড়া থেকে পুলিশ অফিসারটি মামলার বিবরণ পেশ করল।[৩১]

'মাকড়সা' একাঙ্কিকার প্রধান চরিত্র মোট ছয়টি, একজন আসামি, বাকি পাঁচজন ফরিয়াদীর (সাক্ষী) মধ্যে একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, একজন স্কুল শিক্ষক, একজন তরুণী, একজন দিন মজুর এবং একজন কারিগর। আসামির বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ এই যে আসামি তাদের স্বপ্নকে হত্যা করেছে, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। বস্তুত যে স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল কিছুদিন পরেই এদেশের জনসাধারণের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

---

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

২৯. 'মাকড়সা' একাঙ্কিকাটি প্রকাশিত হয় ১৩৬২ (সমকাল ৩ : ৮) সালে। পরবর্তীতে আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত সিকানদার আবু জাফর রচনাবলী গ্রন্থের ২য় খণ্ডে একাঙ্কিকাটি সংযোজন করা হয়

৩০. ইসমাইল মোহাম্মদ, নাট্যকার সিকানদার আবু জাফর, সমকাল, সিকানদার আবু জাফর স্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ৮৮

৩১. পূর্বোক্ত, সিকানদার আবু জাফর রচনাবলী, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন একদিকে যেমন তাদের হৃদয়ে রক্ততিলক এঁকে দেয়, অন্যদিকে ১৯৫৮ সালের সামরিক আইনের প্রবর্তন আরও হতাশায় অন্ধকারে ঠেলে দেয়। বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন, স্বাধীনতার চেতনা স্বৈরাশাসনের অবরুদ্ধ দেয়ালে হাহাকার করে উঠতে থাকে। বিভিন্ন ফরিয়াদীর কণ্ঠে তারই ঘোষণা, সেই হারানো স্বপ্নের কথা—

> ১ম সাক্ষী। ... হঠাৎ একটি চোরা কুঠুরী থেকে বেরিয়ে আসে ভিন্ন জাতের আর একটি শাবক। রূপা রঙের পালক ঢাকা এক টুকরো সকাল পালিয়ে আসে, অমাবশ্যার দরজা ভেঙ্গে। হাজার বছর ধরে একটি সোনালী দিন ছেনে তৈরী করা এক তাল মাখন সেই শাবকটি।[৩২]

বাঙলার মানুষের বুকের গভীরে লালন করা স্বপ্ন বার বার ভেঙ্গে গেছে স্বৈরাচারী শাসনের কঠিন আঘাতে। সেই হতাশাগ্রস্ত মানুষদের ব্যর্থ স্বপ্নের বিদ্রোহী প্রতীক মাকড়সা। ফরিয়াদী চারজনই এদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, যারা সকলেই লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতীক। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের নেপথ্যে জনগণের যে শোষণ, বঞ্চনার দৃশ্য–নাট্যকার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই শিল্পভাষ্য 'মাকড়সা'।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং আইয়ুবী আমলের গণ আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন নি, নিপীড়িত গণমানুষকে তিনি শুনিয়েছেন আশার বাণী। স্বপ্ন ভঙ্গকারী স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী জনতাকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন—

> সাক্ষী-২। ভাইসব, ঝাঁপিয়ে পড়ুন একসাথে। এ সকলেরই বাঁচার সংগ্রাম। স্বপ্ন চোর ওই খুনে লোকটাকে ধ্বংস না করলে কারও মুক্তি নেই। একে একে সকলের স্বপ্নই ও কিনে নেবে। নিঃস্বপ্ন হয়ে যাবে সমস্ত দেশ।[৩৩]

'মাকড়সা' একাঙ্কিককায় বর্ণিত পাঁচজন সাক্ষীই আসামির বিরুদ্ধে স্বপ্ন চুরির অভিযোগ এনেছে, এই স্বপ্নচোর আসামি আর কেউ নয়, তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খান। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনতাকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সমকালীন সমাজ, দেশ ও কাল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'মাকড়সা' সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের উক্তিটি স্মরণযোগ্য—

> দরিদ্র জনসাধারণের সমস্ত আশা–আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের পক্ষে প্রধান অন্তরায় প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা উৎপাদন এবং শত্রুকে নির্মূল করার জন্যে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করার আহ্বান।[৩৪]

বস্তুত বাঙালি জাতির দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রতীক হিসাবে মাকড়সায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের সুপারিশ বর্তমান। 'মাকড়সা' সিকানদার আবু জাফরের ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যপ্রয়াস।[৩৫]

---

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

৩৪. আবু জাফর শামসুদ্দিন 'আমাদের কবিতা', সমকাল, সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক–অগ্রহায়ণ, ১৩৭০, পৃ. ২১৯

৩৫. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয় ভিত্তিক নাটক

১

'রক্তপদ্ম'[৩৬] আসকার ইবনে শাইখের ইতিহাস আশ্রিত নাটক। নাটকটিতে কোনো অঙ্ক বিভাগ নেই, মোট আটটি দৃশ্যে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে। ১৮৫৭ সালে কানপুরে বেনিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে এদেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ-বিপ্লবের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীই এ নাটকে পটভূমিকা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এ বিদ্রোহে সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহ মুক্তি সংগ্রামের রূপান্তরিত হয়েছিল।[৩৭] এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য—

> আঠার শ' সাতান্ন'র মুক্তি সংগ্রাম আমাদের অতীতকে স্মরণীয় করেছে। সে সংগ্রামের আহ্বান ছিল এমনি বিস্তৃত, এমনি মন-মাতানো যে তাতে সাড়া দিয়েছিল আমীর-বণিক, সেপাই-শ্রমিক, ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোক। এমনকি আজিজনের মত সাধারণ নর্তকীও।
>
> শতাব্দীর আগে রাষ্ট্র রূপের যে ধারণা তখন সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, বর্তমানে চলতি ধারণার সঙ্গে তার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। হয়তো সময়ের প্রভাবকে তার থেকে আলাদা করে শতাব্দীর দুই প্রান্তের দুই সংগ্রামী মনের পরিচয় নিলে দেখা যাবে, দুই মনে একই স্বপ্ন, একই সংগ্রাম-চেতনা।[৩৮]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে সিপাহী জনতার দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং বীরত্বকে নাট্যকার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সিপাহীদের উদ্দেশ্যে শেরখান বলেছেন—

> শেরখান : নওজোয়ান। কোন ভয় নেই। এগিয়ে যাও। মনে রেখো তোমার দেশ, তোমার ভাইবোন, তোমার দিকে চেয়ে আছে। আজ তোমার সামনে এসেছে শুভ লগ্ন। তোমার দেশে ওই সাদা বানর, ওই কটা চোখের ব্যাপারীরা তোমার মালিক সেজে বসেছে। এ তোমার লজ্জা, তোমার অপমান। আজ সুযোগ এসেছে। প্রতিশোধ নেবার সুযোগ।[৩৯]

স্বদেশ প্রেমের নতুন উপলব্ধি এবং আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবনের প্রয়াসে অতীত কাহিনীর উপস্থাপন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষক, বেনিয়াকে এদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে দেশকে মুক্ত করার পবিত্র দায়িত্ব এবং মরণ-পণ শপথ গ্রহণ করেছিল এদেশের মানুষ, অসংখ্য জীবনের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের শিল্পভাষ্য 'রক্তপদ্ম।'

---

৩৬. ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী চৈত্র ১৩৬৮ সালে নাটকটি প্রথম প্রকাশ করে। পরবর্তী কালে 'আসকার রচনাবলী'তে (৪র্থ খণ্ড)সংযোজন করা হয়

৩৭. সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ২৬৩

৩৮. আসকার রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড), ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৩৯. পূর্বোক্ত, আসকার রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড), পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

অতীত ইতিহাস রোমন্থন করে সমকালীন প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে মুক্ত করার বাসনা নিয়েই নাটকটি রচিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের সেই দুর্যোগময় দিনগুলি স্মরণ করে দিয়ে নাট্যকার দেশবাসীকে নতুন করে মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন—

শেরখান : এই যে। পালিয়ে আসা কাপুরুষ। তোমরা রাখবে দেশের মান। এখানে কি। ওইখানে যুদ্ধ হচ্ছে। হাজার সেপাই লড়াই করছে। লড়াই করছে টিকা সিং, শামসুদ্দিন রাকীব। আর তোমরা পালিয়ে এসেছ? মরবে যদি ঘরের কোণায়, রাস্তার আড়ে মরবে কেন? ভাই ভাই একসাথে এক আশায় প্রাণ দাও। চলে এস (বাইরের কোলাহল, বন্দুকের আওয়াজ) চল ভাই। কত কাল তো পালিয়েছ। পলাশীতে পালিয়েছ, কাটোয়াতে পালিয়েছ, উদয়নালায় পালিয়েছ, মহীশুরে পালিয়েছ। আর কত? (কোলাহল) চল ভাই। তোমার জন্মভূমিকে আযাদ কর। তোমার মান–একি ! তবু তোমরা যাবে না? এ সংগ্রাম তোমাদের মুক্তি সংগ্রাম।[৪০]

দেশপ্রেমিক বীরাঙ্গনা নারী আজিজনও এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে—

আজিজন : ভাই সিপাহী। তোমরা পুরুষ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তোমাদের সংগ্রাম করতে হয়। দেশের মান রক্ষা করা, মা–বোনের ইজ্জত রক্ষা করা, তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্যে সাড়া দেবে বলেই তো তোমরা সিপাহী। আজ বিদেশী দুশমন তোমাদের উপর জুলুম করছে। দেশের বাদশা বাহাদুর শা'কে অমান্য করছে ঐ গোটা কয় বেনিয়া। গোলাম করে রাখছে সারা দেশকে। ভেবে দেখ, এ অবস্থায় তোমাদের কর্তব্য কি? তোমরা পালিয়ে এসেছ। তোমাদের মা–বোনের উপর চলবে পশুর জুলুম। সে জুলুম থেকে বাঁচতে হলে তোমাদের মা–বোনকেই আজ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।[৪১]

মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য একদিনে অর্জিত হয়নি। শত শত বছরের পরাজয়ের গ্লানি আর লক্ষ লক্ষ বীর শহীদদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই মুক্তি সংগ্রাম সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। 'রক্তপদ্ম' বিপ্লবের প্রতীক। আসকার ইবনে শাইখ দেশপ্রেমিক বীর সৈনিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন—রক্তপদ্ম। শামসুদ্দিন ও আজিজনের আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের নেশাই কাহিনীকে গতিদান করেছে।

'রক্তপদ্ম' নাটকের কাহিনী ইতিহাস নির্ভর হলেও ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য পরিবেশন নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য নয়, পরাধীন দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলাই নাট্যকারের লক্ষ্য। ষাট দশকে ছাত্র–জনতার সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে তিনি আঠার শ' সাতান্ন সালের মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে অবলোকন করেছেন।

---

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

২

মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর'[৪২] পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) অবলম্বনে রচিত।[৪৩] ইতিহাস থেকে কাহিনী নির্বাচন করে যুদ্ধ ও প্রেমের পটভূমিতে তিনি যুদ্ধবিরোধী, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনার শিল্পরূপ দিয়েছেন। এ নাটকে ইতিহাস মুখ্য নয়—উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। এ প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর নিজস্ব বক্তব্য--

> ...যুদ্ধের ইতিহাস আমার নাটকের উপকরণ মাত্র, অনুপ্রেরণা নয়। ইতিহাসের এক বিশেষ উপলব্ধি মানবভাগ্যকে আমার কল্পনায় যে বিশিষ্ট তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে তোলে নাটকে আমি তাকেই প্রাণ দান করতে চেষ্টা করেছি।[৪৪]

এ নাটকের পাত্র-পাত্রীরা মহাযুদ্ধের এক ভয়াবহ পরিণতির শিকার। নিজেদের পরিণামের জন্য তারা সকলে অংশত দায়ী হলেও তাদের অধিকাংশ চরিত্রের জীবনের রূঢ়তম আঘাত যুদ্ধ থেকেই এসেছে। এ নাটকের নায়ক-নায়িকা ইব্রাহিম কার্দি ও জোহরা বেগম দু'জনেই দু'জনকে খুব গভীরভাবে ভালবাসতেন। কিন্তু আদর্শগত বিরোধের কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। ইব্রাহিম কার্দির বেকারত্বের সময় মারাঠারা তাকে চাকরি দিয়েছে, এজন্য তিনি মারাঠাদের বিপদের দিনে তাদের ত্যাগ করতে পারেননি, কিন্তু অন্তরে স্ত্রীর প্রতি প্রেমের ফল্গুধারা সর্বদা প্রবহমান ছিল। একটি দৃষ্টান্ত–

কার্দি। তুমি এসেছো জোহরা? আমি জানতাম তুমি আসবে। আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না।

জোহরা। আমিও জানতাম, আমি আসবো।

কার্দি। কতোদিন তোমাকে দেখি নি। তৃষ্ণায় দু'চোখ আমার পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কতোদিন তোমার এইরূপ আমি দেখি নি। অশ্বপৃষ্ঠে নয়, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে তুমি। রক্তাক্ত তরবারি নয়, হাতে তোমার মেহেদী পাতার রং। ঐ আনত মুখ, ঐ নির্মিলিত চোখ—এত রূপ তোমার, একবার মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে।

জোহরা। তুমি এতো ভালোবাসো আমাকে?

কার্দি। আরো পরীক্ষা করে দেখতে চাও?

---

৪২. ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী মাঘ ১৩৬৮ সালে জাতীয় পূণর্গঠন সংস্কার সহযোগিতায় নাটকটি প্রথম প্রকাশ করে। ১৯৬২ সালে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করে। ১৯৬২ সালের ১৯ এবং ২০শে এপ্রিল ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে মুনীর চৌধুরীর নির্দেশনায় নাটকটি প্রথম সম্প্রায়িত হয়

৪৩. ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার্থে এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বি, এন আর (ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন)। প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের দিয়ে মুসলিম ঐতিহ্য, ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করিয়ে নেয়া এ সংস্থার অন্যতম দায়িত্ব ছিলো। মুনীর চৌধুরীকে দিয়ে লেখানো হয়েছিল 'রক্তাক্ত প্রান্তর'। বিস্তারিত, দ্র: সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ২০০-২০৩

৪৪. রক্তাক্ত প্রান্তর , ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

জোহরা। আমি পরীক্ষা করতে আসি নি, গ্রহণ করতে এসেছি।

কার্দি। আমি তো কবে থেকেই দেউলিয়া। দান করবো কোত্থেকে?[৪৫]

অপরপক্ষে, মারাঠা দস্যুরা জোহরা বেগমের পিতাকে হত্যা করেছে। তিনিও তাই মারাঠা শিবিরে স্বামীর অবস্থানকে মেনে নিতে নারাজ। অর্ন্তদ্বন্দ্বে জর্জরিত জোহরার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

> আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। এই মারাঠা শিবিরে তোমাকে আমি স্পর্শ করতে পারবো না। আমি মেহেদি বেগের কন্যা। মারাঠা দস্যুরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে। এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে। আমি তোমার কাছে এগুবো কি করে? তোমার হাতে হাত রাখবো কি করে?[৪৬]

যুদ্ধের শেষে কার্দি আহত অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছেন। জোহরা বেগম তার মুক্তির ফরমান সংগ্রহ করে ছুটে গেছেন কারাগারে, কিন্তু তখন কার্দি আর বেঁচে নেই। যুদ্ধ ইব্রাহিম কার্দিকে অনন্তলোকে পাঠিয়েছে, বেদনার বিষে জর্জর, ক্ষত-বিক্ষত জোহরা বেগমের হার্দিক অশ্রুৎপাত সমগ্র 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে তরঙ্গময় হয়ে উঠেছে—

জোহরা। তুমি কেন সাড়া দিলে না? কেন জেগে উঠলে না? কেন ঘুমিয়ে পড়লে? আমি এত কষ্টের আগুনে পুড়ে, মনের বিষে জরজর হয়ে এত রক্তের তপ্তস্রোত সাঁতরে পার হয়ে তোমাকে পাবার জন্য ছুটে এলাম—আর তুমি কি-না ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুমের কোন্ অতল তলে ডুবে রইলে যে আমি এত চিৎকার করে ডাকলাম তবু তুমি একবারও শুনতে পেলে না। আহা। ঘুমাও। আমি তোমাকে জাগাবো না। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝেছি, অনেকদিন তুমি ঘুমাও নি। চোখের দুপাতা মুদে মনের আগুনের লকলকে শিখাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আড়ালে ঠেলে দিতে পারোনি। কষ্ট, ঘুমের বড় কষ্টে ভুগেছো তুমি। ঘুমাও। আরো ঘুমাও। প্রাণভরে ঘুমাও।[৪৭]

'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে মুনীর চৌধুরী যুদ্ধকে প্রেক্ষাপট হিসাবে গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত এ নাটকে যুদ্ধ বিরোধী, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনারই প্রাধান্য দিয়েছেন। যুদ্ধজনিত কারণে আর্থ সামাজিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অবর্ণনীয়, প্রাণ হানির ভয়াবহ বর্ণনাও আহমদ শাহ আবদালীর সংলাপে তুলে ধরা হয়েছে—

> যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। লাশের উপর লাশ, তার উপর লাশ। কেউ উপুড় হয়ে, কেউ চিত হয়ে, কেউ দলা পাকিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে। আঁকড়ে ধরেছে, জাপটে ধরেছে। নানা জনের কাটা শরীরের নানা অংশ তালগোল পাকিয়ে এক জায়গায় পড়ে আছে। রক্তে রক্তে মিশেছে। কার সাধ্য এই রক্ত-মাংস-অস্থি হাতড়ে শত্রু-মিত্র বেছে আলাদা করে।[৪৮]

---

৪৫. মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ৭৪
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

এ নাটকে মুনীর চৌধুরী আতা খাঁ-হিরণবালা-দিলীপের মাধ্যমে একটি উপকাহিনী নির্মাণ করেছেন, যা মূল কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তা নির্মল প্রেম চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত। আতা খাঁ মুসলমান, হিরণবালা মারাঠা যুবতী। আতা খাঁ অমরেন্দ্রনাথের ছদ্মবেশে মুসলমানদের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তি করেছে। হিরণ তার প্রকৃত পরিচয় জেনেও তাকে ভালোবেসেছে। হিন্দু-মুসলমানের এই মরণঘাতী যুদ্ধে হিরণবালা নিহত হয়েছে, যুদ্ধ শেষে প্রেমিক আতা খাঁ তার প্রেমিকাকে রণক্ষেত্রে খুঁজে পেয়েছে ঠিকই, তবে জীবিত অবস্থায় নয়—

মন্নু। হিরণবালা কোথায়?

আতা খাঁ। হিরণবালা কোথায়?

মন্নু। সে কি তুমি একলা ফিরে এসেছো?

আতা খাঁ। না।

মন্নু। কোথায় রেখে এসেছো তাকে?

আতা খাঁ। বাইরে।

মন্নু। বাইরে কেন?

আতা খাঁ। মরে গেছে। আমি যখন তাকে খুঁজে পেলাম, তখন সে মরে পড়ে আছে। লাশটা কাঁধে ফেলে ধরে নিয়ে এসেছি।[৪৯]

যুদ্ধ জনিত কারণে মানসিক বিনাশ ও বিপর্যয়ের জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত হিরণ-আতা খাঁ। এদের প্রেমের করুণ পরিণতি নাট্যকারের যুদ্ধ বিরোধী মানসিকতারই পরিচয় বহন করে। যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা আরো প্রবলভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে সাধারণ সৈনিকদের কথোপকথনে—

...ঝুট বাত। মানুষকে খুন করে মানুষ। মানুষের রক্তে পিয়াস মেটায় মানুষ। জানোয়ার চাটে জানোয়ারের রক্ত।

... ...

রক্ত। মানুষের রক্ত মানুষে খায়। খেয়ে মাতাল হয়। মাতাল হয়ে উৎসবে মেতে ওঠে। আমার ভাইয়ের রক্ত ঢেলে প্রদীপ জ্বেলেছে। নইলে ওর আলো এত লাল হবে কেন?[৫০]

এই তত্ত্বগত দিকটি নাটকে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলেই তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, যুদ্ধ বিগ্রহে পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রেমের নাটক রচনা করতে গিয়ে আমিও হয়তো একালের আরও অনেক নাট্যকারের

---

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

মতোই সংগ্রাম নয়, শান্তির বাণী প্রচারে যত্ন নিয়েছি।[৫১] যুদ্ধ মানুষের মধ্যে অন্যায়বোধ জাগায়, মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে মানবজাতির ধ্বংস টেনে আনে। তাই মানবজাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্ম-সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক হিংসা পরিত্যাগ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা। মুনীর চৌধুরীর এই আধুনিক যুদ্ধবিরোধী চেতনা 'রক্তাক্ত প্রান্তর'কে যুগোত্তীর্ণ করেছে।[৫২] যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের মনোজগতের রক্তক্ষরণ—'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক।

৩

নুরুল মোমেনের 'নয়াখান্দান' তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সামাজিক নাটক। নাটকটির রচনাকাল ১৯৬১ সাল এবং প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। বক্তব্য ও আঙ্গিকগত দিক থেকে নূতনত্ব না থাকলেও উপস্থাপনার কলাকৌশলে নাটকটি স্বতন্ত্র। ষাটের দশকে এই উপমহাদেশে বংশ মর্যাদাবোধ ও আভিজাত্যের অহংবোধ প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশ ছিল। এই বিষয়টি নাটকে উপস্থাপিত ও পরিবেশিত হয়েছে ভিন্নভাবে। প্রাচীন আভিজাত্যবোধের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে। এ নাটকে নাট্যকারের দর্শন হলো—বুদ্ধি দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দর্শন।

অর্থ ও আভিজাত্য এবং বংশ মর্যাদাবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক বিশেষ শ্রেণী সম্প্রদায়। অর্থ ও আভিজাত্যের মিথ্যা অহংকার, বংশ মর্যাদাবোধ তাদেরকে অধঃপতনের চরম স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল, বিত্ত-বংশ মর্যাদাহীনের কোন মূল্যই তাদের কাছে স্বীকৃত ছিল না। বংশ ও আভিজাত্যের মোহ তাদের জীবনে চরম অন্ধকার ডেকে এনেছিল। আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত একদল তরুণ সম্প্রদায় এগিয়ে এসেছিল সেই আভিজাত্যবোধ ও বংশ মর্যাদা গর্বের মিথ্যা অহমিকাকে ভেঙ্গে দিতে—যারা কাজ করবে নতুন উদ্যম নিয়ে, ফসল ফলাবে, খাদ্য সমস্যা, নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে এগিয়ে আসবে, দেশের মাটিকে ভালোবাসবে, পুরোনো খান্দান আর আভিজাত্যের মিথ্যা গর্বকে ধূলিস্মাৎ করে দিয়ে নতুনত্বের প্রবর্তন করবে ...তারাই হবে এই নয়াখান্দানের বাসিন্দা। এই খান্দান ভিত্তিক সমস্যা এত প্রকট হয়েছিল যে সমসাময়িক নাট্যকাররা কলম তুলে ধরেছিলেন।

নয়াখান্দান নাটকটির পরিকল্পনা ভিন্নধর্মী নাটকটির সূচনা হয়েছে 'ম্যাজিক শো'র মাধ্যমে। ম্যাজিশিয়ান জবীর রূপক চরিত্র, ম্যাজিক নামক রূপকের অন্তরালে সামাজিক অসঙ্গতি, ভণ্ডামি, কুসংস্কার আর প্রাচীন আভিজাত্যের মিথ্যা অহমিকাবোধের দেয়াল ভেঙ্গে দিয়ে বুদ্ধিভিত্তিক খান্দান প্রতিষ্ঠা করেছেন—এ নাটকে।

---

৫১. দ্রষ্টব্য, ভূমিকা, রক্তাক্ত প্রান্তর

৫২. জিয়াউল হাসান, মুনীর চৌধুরীর নাটক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

জবীর একজন যাদুকর, এই যাদুকরী—বুদ্ধিবৃত্তির বহিপ্রকাশ, ফাঁকিবাজি, চালাকি নয়, মিথ্যা লোক ঠকানো নয়। সেটা স্পষ্ট করার জন্যই লেখক সৃষ্টি করেছেন দুটি চরিত্র : কৃষকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত দীপ্ত বুদ্ধির যাদুকর জবীর এবং ধুরন্ধর ধাপ্পাবাজ এনাম। জবীরের আসল উদ্দেশ্য ম্যাজিকের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ—

> নয়াখান্দান তৈরি করার চেষ্টা করুন, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে। সমাজের বিরুদ্ধে যারা কাজ করে, তাদেরকে ঠোক্কর দেবে। বোকার মত বসে থাকবে না। ঠেলে জোর করে নিজেদের কপাল ফেরাবে। সামনে একটা প্রতীক দেখে হামলা করা কোন বীর পুরুষের কাজ নয়।[৫৩]

নয়াখান্দান নাটকের নায়ক জবীরের প্রপৌত্র দেলোয়ার অত্যন্ত মেধাবী এবং একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক। সে দিন-রাত ল্যাবরেটরীতে গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে একটি ঔষধ আবিষ্কার করছে, ড. ইউসুফ ও শিরিন তাকে সাহায্য করছে। নায়ক দেলোয়ারকে নির্বাচন করেছেন কৃষক পরিবার থেকে। নায়িকা শিরিন, প্রাচীন বংশ গৌরব সম্পর্কে সচেতন খাস খান্দানী আবুল বাশারের প্রপৌত্রী, দেলোয়ার এবং শিরিন পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে। শিরিন ও দেলোয়ারের মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আবুল বাশারের প্রাচীন বংশ মর্যাদাবোধ। তিনি কিছুতেই এ বিয়ে মেনে নিতে পারছেন না। সামান্য চাষীর ছেলে যার কোন বংশ পরিচয় নেই তার সঙ্গে তার নাতনির পরিণয় হতে পারে না। পক্ষান্তরে, তার স্ত্রী মুস্তারী বেগম এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তার ধারণা—

> খান্দানে আর চলবেনা। নতুন লোক চাই যারা খাটবে, বুদ্ধিকে কাজে খাটাবে, কাজ করবে। তা' সে ভদ্রই হোক আর চাষাই হোক। বসে থেকে খাওয়া যে খান্দানী, তা রক্তেরই হোক আর অর্থেরই হোক, পৃথিবীতে আর কাজে লাগবে না।[৫৪]

খান্দানগর্বী আবুল বাশার এ বিয়ে মেনে নিতে রাজি নন। তিনি মেরজাইকে পাত্রের সন্ধান করতে বলেছেন, তিনি উচ্চ বংশীয় এবং খান্দানী পাত্র চান। দেলোয়ারের সঙ্গে বিয়ে হলে লজ্জায় তার মাথা নুইয়ে যাবে। মুস্তারী বেগমকে তিনি বলেছেন—আপনিই বংশটাকে ডুবাবেন। এদের বিয়ে হওয়া মানে কারো সামনে মাথা তোলা যাবে না।[৫৫]

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে খান্দানী আবুল বাশার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দেলোয়ারের আবিষ্কৃত ঔষধ যা ইতিপূর্বে মেরজাই সাহেবের দুই ছেলের অসুস্থতার সময় ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গিয়েছিল সেটাই আবুল বাশার সাহেবের অসুখের সময় ড. ইউসুফ তাকে দিয়েছিল। ইউসুফ আবুল বাশার সাহেবকে বলেছে—

---

৫৩. নুরুল মোমেন, নয়াখান্দান, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃ. ১২

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

মেরজাই সাহেবের দু' ছেলের ছাড়া আর এ রোগ আমরা পাইনি। তার ছেলেদের চিকিৎসায় এত সুফল পেলাম বলেই আপনাকে নিঃসন্দেহে দেয়া গেল ঔষধটা।[৫৬]

আবুল বাশার সাহেব ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে—

> ... খোদা কাজ করান নিমিত্তের মাধ্যমে। তাই বোধহয় তিনি মানুষের মধ্যে জিনিয়াস সৃষ্টি করে যান। এই জিনিয়াস হলো আসল মানুষ—যাদের জন্যে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। এই ছেলেটি তাদেরই একজন।[৫৭]

তাঁর অন্ধসংস্কার, আত্মসম্মানবোধ তাকে পীড়িত করে তুললো। নাতনির বিয়ের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। একদিকে পুরানো আভিজাত্যবোধ, অন্যদিকে দেলোয়ারের প্রতি তার আকর্ষণ কোনটিকেই তিনি উপেক্ষা করতে পারছেন না। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় গবেষণাকালে এক দুর্ঘটনায় দেলোয়ারকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। শিরিন খুব উৎকণ্ঠিত, ড. ইউসুফ তাকে অভয় দিয়ে জানায়—কোন ভয় নেই শিরীন। সবই ঠিক আছে। তবে রক্ত দেওয়া দরকার।[৫৮]

অসুবিধা একটাই ব্লাড ব্যাঙ্কে তার গ্রুপের কোন রক্ত নেই। একমাত্র আবুল বাশার সাহেবের রক্তই দেলোয়ারের গ্রুপের সঙ্গে মিলবে। সবাই আশঙ্কিত যে আবুল বাশার সাহেব তার 'খান্দানী রক্ত' দেলোয়ারের মত একজন সামান্য মানুষের জন্য দিতে রাজি হবেন কিনা। কিন্তু খান্দানগর্বী আবুল বাশার সাহেব সবাইকে অবাক করে দিয়ে স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়েছেন। তবে তার একটাই দ্বন্দ্ব ছিল—

> আমার রক্ত তোমার মধ্যে রয়েছে তা' যদি ওর দেহে যায় তাহলে তোমাদের মিলনের কোন বাধা হবে না তো? না কোন বাধা নেই। যাদুকর জবীর আমার মনের কথা বুঝে আগেই মওলানা নিজামী সাহেবের অভিমত নিয়ে এসেছে।[৫৯]

নয়াখান্দান নাটকে খান্দানগর্বী আবুল বাশারের খান্দান গর্ব শেষ পর্যন্ত দূরীভূত হয়েছে দেলোয়ার ও শিরিনের মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে। 'নয়াখান্দান' কমেডি নাটক। বংশ গৌরবের অহমিকাবোধ তৎকালীন সামাজিক জীবনে যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখক সেই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ জীবনের কুসংস্কার, অসঙ্গতি দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, প্রতিকারের পথও বাতলে দিয়েছেন। মিথ্যা আভিজাত্যবোধ ও বংশগৌরবের শোচনীয় পরিণতির স্বরূপ তিনি উদ্‌ঘাটন

---

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন, কিভাবে নয়া খান্দান সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে সংশোধন করা সম্ভবপর তাও তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

এ নাটকে নাট্যকার তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন—

১. পুরোনো প্রথাগত জীবনধারায় পরিবর্তন এসেছে।

২. বংশ মর্যাদাবোধ ও আভিজাত্যবোধ ক্রমশ অবলুপ্ত হচ্ছে।

৩. পুলিশ কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ ও বর্ডার এলাকায় ফলের মধ্য দিয়ে স্বর্ণ চালান।[৬০]

খাস খান্দানী (আবুল বাশার), নিস-খান্দানী (আখলাক), কৃষক শ্রেণী (জবীর), তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিচক্ষণ লোক (খিজির), ধুরন্ধর ধাপ্পাবাজ (এনাম), সাধু কর্মচারী (ইনসপেক্টর), ঘাগী ঘুষখোর (তসীর আলী), মেধাবী বৈজ্ঞানিক (দেলোয়ার), গবেষণা উন্মুখ ডাক্তার (ইউসুফ)—সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নাট্যকার নয়াখান্দান নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। 'নয়াখান্দান' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে একটি মাত্র দৃশ্য আছে। নাট্যকার এখানে বর্ডার এলাকার চোরাচালানের দৃশ্যটি তুলে ধরেছেন। ফলের মধ্যে সোনাপুরে চালান দেয়া আজকের সমাজেও বিরল নয়। ধুরন্ধর ধাপ্পাবাজ এনাম, দাগী ঘুষখোর তসীর আলীকে ঘুষ দিয়ে ফলের মধ্যে সোনা চালান দেয়। প্রফেসর জবীর বুদ্ধিবৃত্তির কৌশলে যাদুর সাহায্যে ফলের ভিতর থেকে সোনা উদ্ধার করেছে। তার বুদ্ধির কৌশলে এনাম ও তসীর আলী ধরা পড়েছে। ইনসপেক্টর সাহেব তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কলাকৌশলে মুগ্ধ হয়েছেন। যাদুর মাধ্যমে ধোকা দিয়ে আসল সত্যটি উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসই নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য আর এ কারণেই যাদু দৃশ্যের অবতারণা।

এ নাটকে কোন চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই, কেবলমাত্র আভিজাত্যবোধ নিয়ে সংকট দেখা যায়। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আবুল বাশার ও শিরিনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আবুল বাশারের মধ্যে আভিজাত্যবোধের দ্বন্দ্বটি প্রকট হয়ে উঠেছে—

> জানো শিরিন, বংশমর্যাদা এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে আমার মনকে মানাতে পারছিনা। অথচ যখন তুমি আর সে একসঙ্গে আমার সেবা করছিলে তখন অপূর্ব লাগছিলো দু'টিকে।[৬১]

তার এই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত কেটে গেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন পুরোনো বংশমর্যাদা নিয়ে বসে থাকা আর বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দেলোয়ারের মেধা, বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে—

---

৬০. সৈয়দা খালেদা জাহান, নুরুল মোমেন ও তাঁর নাটক (এম. ফিল থিসিস), ১৯৯৫, পৃ. ৯১

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

> ভূমিকম্পে সবকিছু ভেঙ্গেচুরে গেলে সেটা দেখে কি তার আগের অবস্থা কল্পনা করতে পারো? তাই হয়েছে। মফঃস্বলে গিয়ে মনে হয়েছে—যা' ছিল, যারা ছিল, সব হারানো হয়ে গেছে, একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। এবার নতুন লোক চাই। নতুন উদ্যম, নতুনভাবে মাথা খাটিয়ে প্রাণচাঞ্চল্যে এগিয়ে যাবে এমন লোক চাই। এই নতুন খান্দানের পয়লা নম্বর হলো দেলোয়ার।[৬২]

নয়াখান্দান নাটকটি প্রসঙ্গে ড. সুকুমার বিশ্বাস লিখেছেন—

> দৃশ্যান্তরে পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। দৃশ্য পরিকল্পনায়ও ত্রুটি বর্তমান। কাহিনী দৃঢ়-পিনদ্ধ নয়। নাটকে নাটকীয় গুণাবলীর দৈন্যও পাঠককে পীড়িত করে।[৬৩]

এ নাটক প্রসঙ্গে মোহাঃ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন—

> এ নাটকে সমাজ সত্যের কোন অকৃত্রিম গভীর যন্ত্রণা নেই, যা' আঙ্গিকে এবং বক্তব্যকে সমন্বিত শিল্পকর্মে পরিণত করতে পারে। তাই সংলাপ সর্বস্বতা নয়াখান্দানের নাট্যগুণকে খর্ব করেছে।[৬৪]

নয়াখান্দান নাটক প্রসঙ্গে সমালোচকদের অভিমত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাটকটি রচিত। নাটকটির কাহিনী বিন্যাসে, দৃশ্য পরিকল্পনায় তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। গঠনগত কলাকৌশলের নৈপুণ্যও ঘটনা বিন্যাসের চাতুর্যে গ্রন্থটি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। যাদু দৃশ্যের অবতারণা করে পাঠক ও দর্শকদের কৌতূহল বৃদ্ধি করেছেন। উপস্থাপনা কৌশলের মুন্সীয়ানায় নাটকটি মঞ্চসাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

৪

আভিজাত্যবোধ ও খান্দানের অহংবোধ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ তার 'ইহুদির মেয়ে'[৬৫] নাটকে। নাট্যকার রাজবন্দি থাকাবস্থায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে জেনেসিসের কাহিনী অবলম্বনে এ-কাব্যনাট্য রচনা করেন। কাব্যনাট্যে তিনটি অঙ্ক বর্তমান, দৃশ্য বিভাজনের পরিবর্তে সংখ্যা ব্যবহার করেছেন। তিনটি অঙ্কের প্রতিটিতে তিনটি করে মোট ন'টি সংখ্যা ব্যবহার করেছেন। 'ইহুদির মেয়ে' সম্পর্কে নাট্যকার লিখেছেন—

---

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২-৭৩
৬৩. সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮, পৃ. ২৭৪
৬৪. মোঃ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ৪৭৩
৬৫. আতাউর রহমান সাহিত্য ভবন ঢাকা থেকে জুন ১৯৬২ সালে প্রথম নাটকটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। রচনাকাল জুন ১৯৬১ সাল। পরবর্তীতে 'শ্রেষ্ঠ নাটক' গ্রন্থে তাঁর সমস্ত নাটক একত্রিত করে প্রকাশ করা হয়

Dhaka University Institutional Repository

> 'ইহুদির মেয়ে' বইটা আকস্মিকভাবে লেখা, এমনকি, কতকটা দৈব যোগাযোগ বলা যেতে পারে, যদিও ওসবে বিশ্বাস নেই। জেলখানায় মনটা থাকে খেয়ালী ও স্পর্শকাতর এবং খবরের কাগজ উত্তেজনার প্রধান অবলম্বন। খবরের কাগজে আমেরিকার একটি বিদ্যালয়ে বর্ণবিদ্বেষের বর্ণনা পড়ে যখন বিষণ্ন তখন ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি জরাজীর্ণ কপি আমার টেবিলে থাকত, মাঝে মাঝে অন্য মনস্কভাবে তার পাতা ওল্টাই। একবার জেনেসিসের একটি আখ্যানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম এ বিষয়ে শিল্পায়নের একমাত্র প্রকরণ কাব্যনাট্য।[৬৬]

ইয়াকুব কন্যা দিনাকে দেখে মুগ্ধ হয় সালেমের রাজপুত্র সেচেম। দিনা ও সেচেম পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে। উভয়ের সম্মতিক্রমে দিনার পিতা ইয়াকুবের নিকট সেচেমকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। ইয়াকুব রাজি হলেও তার পুত্রদের মধ্যে লেভি ও সেমিয়ন বংশমর্যাদার অজুহাতে এ' বিয়েতে অসম্মত হলো। কিন্তু রুবেল বলল—

> ...মানুষ মাত্রই এক রক্তধারা
> বর্ণে বর্ণে ইতর বিশেষ, জাতি জাতি গোত্রে গোত্রে
> আকৃতি অশেষ ; তবু মানতেই হবে যদি যুক্তির
> দাম থাকে, এ কেবল বাইরের রূপ, তার মানে
> আমরা সবাই একই আদমের বীজ, সুনিশ্চিত
> একই অস্থির রজ্জুতে বন্দী স্বর্গ-ভ্রষ্ট জীব ;
> হয়তো বা কেউ ভাগ্যগুণে ইতিহাস সংলগ্ন,
> অথবা হয়তো কেউ নয় ; কিন্তু তাতে সামান্যই
> ক্ষতি কারণ সকলে ঠিক একই সিঁড়ির যাত্রী
> অনাদিকালের বুকে শৃঙ্খলিত অশান্ত মিছিল।[৬৭]

সেচেমের পিতা হামরকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হলো, সেচেম দিনা কেউ কাউকে ত্যাগ করতে রাজি নয়। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে লেভি ও সেমিয়ন সেচেমের রাজধানী আক্রমণ করে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রেমিকের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে অস্থির হয়ে দিনা আত্মহত্যা করলো। বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের কারণে একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকার মিলন সম্ভব হলো না।

শেতাঙ্গ আমেরিকার বাসিন্দারা গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায় অথচ অশেতাঙ্গদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করে, ঘৃণাভরে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে, মানবতার এই অপমান, অভিজাত-অনভিজাত ভেদাভেদ সমাজ সংসারের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না নাট্যকার সেটিই তুলে ধরেছেন।

---

৬৬. আলাউদ্দিন আল আজাদ, শ্রেষ্ঠ নাটক, ইহুদির মেয়ে, নিবেদন দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮৩
৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

'ইহুদির মেয়ে' নাটকে কাব্য নাট্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কাব্য নাট্যের উপাদান ও শিল্পকলা নৈপুণ্য 'ইহুদির মেয়ে' নাটকে সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। নাট্যকার ইহুদির মেয়ে নাটকের রচনাশৈলী সম্পর্কে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—

> কাব্যের আবেগ আর নাট্যের সংঘাত এ দুয়ের উচ্চকিত শিক্ষাই কাব্যনাট্য। সেজন্য বাস্তবের উপরিতলের চিত্রণের চেয়ে অন্তস্তলের দিকেই এর অনিবার্য গতি এবং মানবাত্মার সেই অংশকে প্রতিফলন করাই তার লক্ষ্য যা কতকটা দুর্জ্ঞেয়, রহস্যমণ্ডিত কিংবা মহত্তর মূল্যবোধের প্রেরণায় উচু গ্রামে বাধা। একমাত্র একে আশ্রয় করেই মুখের ভাষা কাব্য সঞ্চরিত হয়ে উঠতে পারে। এজন্য সাধারণ নাটকের যেখানে শেষ, কাব্য নাট্যের সেখানে শুরু। সাধারণ নাটকের আবেদন কাহিনী ও চরিত্রের গ্রন্থনে ধীরে ধীরে চরমাবস্থায় গিয়ে পৌঁছে অথচ সংকটেই কাব্য নাট্যের সূত্রপাত। সঙ্গীতের রীতির মত তার চলার গতি আভোগে নামতে পারেনা বরং সর্বদা অস্থায়ী অন্তরাতেই অবস্থান করে।[৬৮]

কাহিনী সুগ্রন্থিত, সুপরিকল্পিত। চরিত্র–চিত্রণ যথাযথ। পদ্যাংশে নির্মিত সংলাপ সৃজনে এবং বাক্যবিন্যাসে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা লক্ষণীয়।

৫

'আলোছায়া' নাটকটি নুরুল মোমেনের পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট কমেডি। নাটকটি বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য লিখিত এবং ১৯৬২ সালের ৪ জুলাই ও ৫ জুলাই বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়।[৬৯] আলোছায়া নাটকের কাহিনী অভিনব না হলেও আঙ্গিকগত কলাকৌশল, চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা এবং সংলাপের নৈপুণ্যে তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। এ নাটকে দাম্পত্য প্রেমের নানা ধরণ, বিচিত্র কলাকৌশল নিয়ে আলোকপাত করেছেন। হৃদয়বৃত্তির বহুমুখী প্রকাশ ঘটেছে এখানে। প্রেমের দুটি অধ্যায়—-বিবাহপূর্ব প্রেম, বিবাহ পরবর্তী প্রেম অর্থাৎ দাম্পত্য প্রেম।

নাটকের মুখ্য চরিত্র বা নায়ক চরিত্র হচ্ছে হাম্মাদ জামিল। পরিচয় লিপিতে আছে তিনি বদমেজাজি, স্নেহময় গৃহস্বামী এবং সার্থক শিল্পপতি, তার আপাত কঠোর চরিত্রে অতিষ্ঠ হয়ে তার স্ত্রী ও পুত্র কন্যা মানসিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হয়। পরবর্তীতে তিনি নিরীহ চরিত্রে পরিণত হয়ে পরিবারের সকলের

---

৬৮. পূর্বোক্ত, ইহুদির মেয়ে, নিবেদন দ্রষ্টব্য

৬৯. নুরুল মোমেন, আলোছায়া, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২। নাটকটি প্রসঙ্গে নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্য : এই নাটকটি ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল বলে কাউকে বাদ না দিয়ে সকলের চরিত্রের উপযুক্ত করে চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছিল। নাটকটি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর দুটি ছাত্র এসে উপস্থিত হলো এবং তাদের জন্য নতুন করে ছাত্তার মামুন দুটি চরিত্র সৃষ্টি করতে হলো। (পৃ. শেষ কথন)

Dakha University Institutional Repository

উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠেন এবং সমাপ্তিতে আত্মক্রোধ ফিরে পান, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে এই কাহিনী পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

আলোছায়া নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'হাম্মাদ জামিল' একজন কর্মঠ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান সার্থক শিল্পপতি। আপাতদৃষ্টিতে তাকে কঠিন মনে হলেও স্ত্রী প্রেমিক, পুত্র-কন্যা বাৎসল, স্বজন-ভাজন একজন ব্যক্তি। তার এই কঠোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা—স্টীল ইন্ডাস্ট্রিজের কর্মচারীদের যেমন স্ব স্ব দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন করে রেখেছিল, তেমনি সংসার জীবনেও এনেছিল নিয়ম শৃঙ্খলা। তার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তার প্রিয়জনরা তাকে ভুল বুঝলো। তার পরিবারের সদস্যরা পরামর্শ করে ড. সরফারোশ নামে একজন মনোবিজ্ঞানীর স্মরণাপন্ন হয়। ড. সরফারোশের পরামর্শে তার কাছে মিথ্যা টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে—জাহানারা মারা গেছে। এই দু'সংবাদে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তিনি অসুস্থ থাকাবস্থায় কারখানার যাবতীয় দেখাশোনা করেছে পারভীন। পারভীনের প্রচেষ্টায় ঘরে বাইরে সর্বত্র শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছে। হাম্মাদ জামিল সুস্থ হয়ে ফিরে এসে নিজেই সব দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন। পূর্বের সেই মেজাজের পরিবর্তন হওয়াতে ঘরে বাইরে সর্বত্রই অরাজকতা বিরাজ করছে। সবাই স্বাধীনতা পেয়ে বসেছে। সুলতানের অবস্থাও তদ্রূপ। পারভীন আর তাকে শাসন করেনা, দিন দিন অলস হয়ে পড়েছে। পারভীনের সঙ্গে মতবিরোধ হয়ে সেও তাকে বিশ্বাস করতে চায় না। সুলতান নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে—

> স্বভাব যে মানুষের কি জিনিস তা' বুঝলাম। কারও সামনে না পড়লে আমার মত অলসের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি।[৭০]

হাম্মাদ জামিলের মেজাজের পরিবর্তন হওয়ায় সুযোগ-সন্ধানী দুর্নীতিবাজ ম্যানেজার ফায়দা লুটতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাম্মাদ জামিল সব দায়িত্বভার ম্যানেজারের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। পারভীন এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছে, বিনয়বাবুও থেমে থাকেনি সেও বিরোধিতা করেছে। নাটকের শেষে হাম্মাদ জামিল তার মেজাজ পুরোপুরি ফিরে পেয়েছেন। নাটকে তার শেষ সংলাপ—মারবো এক থাপ্পড়।[৭১]

এ নাটকে মিঃ জামিল ও পারভীন দুটি চরিত্র উজ্জ্বল। দু'জনেই স্বভাবের দিক দিয়ে এক রকম কঠোর, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আদর্শবাদী ও নিয়ম শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী। পাশাপাশি জাহানারা ও সুলতান তার উল্টো। সুলতান অলস, ব্যক্তিত্বহীন এবং নিজের প্রতিভা সম্পর্কে উদাসীন। হাম্মাদ জামিল ও পারভীনের তাগিদে সে ল্যাবরেটরীতে যায়, নিজস্ব উদ্যোগ নেই। জাহানারাও তাই, সে দুর্বল চিত্তের অধিকারী, কোন বিষয়েই তার

---

৭০. নুরুল মোমেন আলোছায়া, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃ. ৬৬
৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

কোন প্রচেষ্টা নেই। সে নিয়ম শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী নয়, স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে তার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে।

পারভীন বাস্তববাদী প্রগতিশীল নারী। সে কাজ পছন্দ করে, অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এবং কড়া স্বভাবের মেয়ে। সুলতান তাকে প্রথমে ভুল বুঝেছিল পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, কর্মজীবন—সর্বক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলা না থাকলে জীবন চলতে পারে না। একজন শিল্পপতির জীবন, ম্যানেজারের দুর্নীতি এবং অসাধুতা, মহিলাদের স্বামীপ্রেমে সংশয় ও প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস এবং আধুনিকাদের কেতাদুরস্ত চালচলন এসব চিত্র এঁকে সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন, বৃহত্তর কোন সামাজিক সমস্যা এখানে আলোচিত হয়নি।

আলোছায়া নাটকটি প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। অধিক সংখ্যক চরিত্রের সমাবেশ, সামঞ্জস্যহীন প্রবাহ নাটকের রসহানি ঘটিয়েছে।[৭২] এ নাটকে অধিক সংখ্যক চরিত্র সমাবেশ আছে সত্য, তবে ঘটনার সামঞ্জস্যহীনতা নেই। প্রতিটি চরিত্রই নাট্যকাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং কাহিনী সূচনা থেকে পরিণতির দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে। 'সংলাপ নির্ভর এ নাটকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। কাহিনী—নির্মিতিতে দুর্বলতা সুস্পষ্ট।[৭৩] এ নাট্যকাহিনীতে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টির অবকাশ খুব কমই আছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। এ কাহিনীতে হাম্মাদ জামিলের চরিত্রের ভালো-মন্দ ও পরিপূর্ণতার বিকাশ ঘটানো হয়েছে। এটি একটি পারিবারিক কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক, সামাজিক কোন সমস্যা এখানে আলোচিত হয়নি।

আলোছায়া নাটকটিতে নাট্যকারের সমাজ বিশ্লেষণ সুতীক্ষ্ণ ও সুচারু না হলেও সমাজ দর্শন পরিস্ফুট। এ নাটকে নাট্যকার একজন মেজাজি শিল্পপতির জীবন, পারিবারিক সমস্যা, সুযোগ সন্ধানী দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ম্যানেজারের অসাধুতা, মহিলাদের স্বামীপ্রেমে সংশয় এবং স্বামীর উপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি চিত্র তুলে ধরেছেন।

৬

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'মায়াবী প্রহর'[৭৪] ত্রি-অঙ্ক বিশিষ্ট ট্রাজি-কমেডি। ১ম অঙ্কে ৪টি দৃশ্য, ২য় অঙ্কে ২টি দৃশ্য, ৩য় অঙ্কে ৪টি দৃশ্য বর্তমান। শ্রেণী সংঘর্ষ ও সমাজ চেতনার বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে এ নাটকে।

---

৭২. ড. নীলিমা ইব্রাহিম, বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৭৯, পৃ. ৪৩৬

৭৩. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৯৪, পৃ. ২৭৩

৭৪. আলাউদ্দিন আল আজাদ, মায়াবী প্রহর (১৩৬৯)। জামিলা আজাদ সাহিত্য ভবন সিলেট থেকে ১৯৬২ (ফাল্গুন ১৩৬৯) সালে নাটকটি প্রকাশ করেন। সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজ ছাত্র সংসদের প্রযোজনায় ১৯৬৩ সালের ২৮ ও ২৯ মার্চ নাটকটি প্রথম মঞ্চায়িত

Dhaka University Institutional Repository

অর্থলোভ, নারী বিলাস, বিত্ত বৈভবের লোভে মনুষ্যত্ব বিসর্জন, মদ্যপান আর পৈশাচিক উল্লাস নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।

অর্থলোভী পিতা মধুখান সৎ মায়ের কু-পরামর্শে কন্যা সিতারাকে চোরাকারবারী লাল মিঞা নামের এক বৃদ্ধের কাছে সমর্পণ করে। জীবন সংগ্রামে পরাজিত সতেরো বছরের সেতারা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। ছোট বোন দিলারা সেতারার প্রণয়ী শহীদের সহায়তায় এক ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করে সৎমা, সিতারার বৃদ্ধ স্বামী ও পিতা মধুখানের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত মধুখান এক ভয়াল পরিবেশের শিকার হয়েছে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না—

মধুখান : শাস্তি। পাপের শাস্তি। একটা বিদঘুটে জীবন্ত লাশ এসে আমার গলা টিপে ধরলো। মনে হচ্ছে, আমি আর বাঁচতে পারবো না। আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। আমাকে ধরো তুমি, আমাকে ধরো।[৭৫]

লাল মিঞা একজন কালোবাজারী, ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছে। সিগারেটের টিনের মধ্যে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে বশীভূত করেছে। সমাজের আইন রক্ষাকারী পুলিশ শ্রেণীও মোটা অঙ্কের উৎকোচের কাছে বশীভূত হয়েছে, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের সাহায্য সহযোগিতা করেছে। লাল মিঞার সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার পুলিশ অফিসারদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন—

লাল মিঞা : আপনার দয়া স্যার। আপনাদের দয়াতেই তো বেঁচে আছি।[৭৬]

নাটকের শেষ দৃশ্যে কবর খোঁড়া লোকজন বা গোরখোদকদের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের শ্রেণী সচেতনতা বিদ্যমান—

তৃতীয় কবর

খোড়া : খালি ফেরেশতা না, উনি মনসিপালটির জামাই। যাদু। ঠিক মতন কাম করলে এক পইসা বেশি দিবো? যেমন দাম, তেমন কাম, নওয়াবী আমল, ইংরাজ গেল, কত পানি গড়াইল নর্দমায়, আবার সেই শূওর, সেই শূত্তর। আর পঁচিশ ঢাহায় পাছা থাবরাইয়া কূল পাত্তনের কথা না, তা আবার বৌ পালা।[৭৭]

কাহিনী দৃঢ় পিনদ্ধ নয়। সিতারা-শহীদ-দিলারাকে কেন্দ্র করে নাটকে চরম দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও নাট্যকার সে সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তবে সংলাপ কাব্যময়।[৭৮]

হয়। ঢাকায় প্রথম মঞ্চায়িত হয় ১৯৬৪ সালের ৯, ১০ই জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের প্রযোজনায়। পরবর্তীতে শ্রেষ্ঠ নাটক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়

৭৫. আলাউদ্দিন আল আজাদ, শ্রেষ্ঠ নাটক, মায়াবী প্রহর, পৃ. ১৩৬

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

৭৮. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

৭

আ. ন. ম. বজলুর রশীদের 'যা হতে পারে' নাটকটি আধুনিক নগর জীবন ও তার বিবিধ সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে ভারাক্রান্ত সমাজ ব্যবস্থায়—আভিজাত্যের মোহ, বংশ গরিমার মিথ্যা অহংবোধ মানুষের জীবনকে গ্রাস করেছিল তারই প্রভাব থেকে মুক্ত করে—সৃজনশীল প্রতিভার মূল্যায়নের প্রচেষ্টায় নাটকটি রচিত। যারা কাজ করবে, দেশের ফসল ফলাবে, নিরক্ষরতা দূর করবে—দেশকে, দেশের মাটিকে ভালোবাসবে তারাই এ সমাজের কর্ণধার—তাদের প্রতিভার স্পর্শে ঘটবে আগামী দিনের সূর্যোদয়।

ধানমণ্ডি উপনগরীতে দুটি বাড়ি—একটি বাড়িতে গাছপালার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য কিছুটা বেশি, এ বাড়ির ছেলে কামাল কৃষি বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ, সে সর্বদা গবেষণায় নিমগ্ন, সে কারণে পাশের বাড়ির সুন্দরী আধুনিকা 'ক্যামেলিয়া' তাকে চাষা বলে। কিন্তু একসময় মনের অজান্তে কামালকে ভালোবেসে ফেলেছে, উভয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে। ক্যামেলিয়ার মা খান্দানী ঘরের মেয়ে, তাই জামালকে তার অপছন্দ। তিনি মেয়েকে অভিজাত পাত্রে পাত্রস্থ করার জন্য স্বামীকে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু পিতা আদর্শবাদী অধ্যাপক আবদুল্লাহ স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করেন নি। তার ইচ্ছা অনুরূপ :

> আবদুল্লাহ : ... জানো পাকিস্তানে এখন এমনি যুবকের দরকার, যারা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা করে শস্যের উৎপাদন বাড়াবে। আঃ এতদিন আমি খেয়াল করিনি, পাশের বাড়িতে এমন একটি রত্ন থাকে।[৭৯]

আনোয়ারাও দেমাগের সাথেই জানিয়ে দিয়েছেন সি. এস. পি. জামাই তার চাই। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে সি. এস. পি. জামাই নিয়ে প্রতিযোগিতা অভিভাবকদের একটা মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ সময়ের বিভিন্ন নাটক উপন্যাসে এ চিত্রটি বেশ লক্ষণীয়। আনোয়ারা শেষ পর্যন্ত সি. এস. পি জামাই না পেয়ে হবু সি. এস. পি-কে জামাই নির্বাচনের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। কামালের সঙ্গে ক্যামেলিয়ার মেলামেশা দেখে তাকে নজরবন্দি করলেন। মায়ের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সে কামালের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কামাল ক্যামেলিয়ার মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে।

এই নাটকে কামাল চরিত্র নতুন আদর্শের দিশারী। বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও রোমান্টিকতার সমাবেশ ঘটেছে তার চরিত্রে। কামাল খাদ্যোৎপাদনে নব নব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে—কৃষিক্ষেত্রে তার মৌলিক গবেষণার অবদান দেশের অর্থনীতিতে নবযুগের সূচনা করেছে। এ জন্য সে রাষ্ট্রীয় খেতাব লাভ করলো—তার যশ ছড়িয়ে পড়ল দেশে বিদেশে। এখানে কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষিজীবীদের প্রতি নাট্যকারের গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হয়েছে।

---

৭৯. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, যা' হতে পারে, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

'মা' আনোয়ারার চরিত্রটি মিথ্যা আভিজাত্যের প্রতীক। তিনি সর্বদা বংশের আভিজাত্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর পিতৃপুরুষরা—সকলেই আমীর ওমরাহ ছিলেন। অধ্যাপক আবদুল্লাহ'র মতে—খান্দানীর অহংকার মিথ্যে, বর্তমানে নতুন খান্দানী গড়ে উঠেছে শ্রমিকদের নিয়ে। মেহনতি মানুষের গড়ে ওঠা খান্দানেই তার অটল বিশ্বাস, আভিজাত্যের খান্দানেই নয়। আভিজাত্যের কৃত্রিমতা মানবজীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দূর করে, ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধানের সূচনা করে।

'যা হতে পারে' নাটক হিসাবে সার্থকতা অর্জনে সমর্থ হয়নি, নাটকীয় দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই, তবে সংলাপগুলো কাব্যিক মাধুর্য ও আবেদনে ভরপুর।

৮

গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত আসকার ইবনে শাইখের 'এপার ওপার'[৮০] নাটকে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। আলোচ্য নাট্য কাহিনীতে দুনীর্তিবাজ চকদার ধানে গোলা ভর্তি রেখে মানুষের দুর্দশার সুযোগে তাদের জমিজমা, ঘটিবাটির বিনিময়ে ধান দেয়। দু'তিন গ্রামের লোক তার কাছে যায়, কৃষক, মজুর, তাঁতি, জেলে সর্বশ্রেণীর মানুষই তার দয়ায় নির্ভরশীল। কিন্তু এক সময়ে তাঁতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন জীবন চেতনা জাগ্রত হয়। তাঁতিরা আর তার কাছ থেকে কর্জ **দেয়** না, তারা একটা সমিতি গড়ে তুলেছে। সেখান থেকেই তারা কর্জ পায় এবং সমিতির মাধ্যমে তাদের মালপত্র বিক্রি করে বেশি লাভও করে। গ্রামের দরিদ্র মাস্টারের ছেলে আসাদ কৃষকদের নিয়ে 'সমবায় সমিতি' গড়ে তুলেছে, তাদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। আসাদের মা তাকে জমি বিক্রি করে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যেতে বলেছেন, কিন্তু আসাদ তা' না করে গ্রামের মাঠে সোনার ফসল ফলাবার উদ্যোগ নিয়েছে। দরিদ্র কৃষকদের সে বোঝাতে চেষ্টা করেছে—

> বাবুই পাখি বাসা বানায়। একটা দুটো খড় কুটো জোগাড় করে বাবুই গড়ে তোলে সুন্দর বাসা। বিন্দু বিন্দু মধু আহরণ করেই মধুতে চাক ভরে তোলে মৌমাছি। আর আমরা মানুষ হয়েও অল্প সঞ্চয়ে পারবনা সমবায়ের ভাণ্ডার ভরে তুলতে?[৮১]

গ্রামবাসীদের সামান্য সঞ্চয় দিয়ে গড়ে উঠলো সমিতি, তাতে জমলো মূলধন। গ্রামের লোকেরা উত্তরের বন্দে খাল কাটতে চায়। এতে করে তাদের জমি আবাদের সুবিধা হবে, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালো চকদার।

---

৮০. আসকার ইবনে শাইখ, 'এপার ওপার, ঢাকা ১৯৬২, পূর্ব পাকিস্তান সমবায় দফতর

৮১. এপার ওপার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

চকদারের তরুণী স্ত্রী কাঞ্চন গ্রামবাসীদের মঙ্গলের জন্য স্বামীকে রাজি করিয়ে সমবায় সমিতিকে খাল কাটার জন্য জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

নাট্য কাহিনীতে চকদারের ছোটবিবি কাঞ্চন ও রঘুর প্রসঙ্গ টেনে নাট্যকার একটি রসঘন ও সংঘাতময় চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হয়েছেন। সমবায়ের আটপৌরে কাহিনীকে নাট্যকার উপভোগ্য নাট্যাখ্যানরূপে গড়ে তুলেছেন। প্রচারধর্মিতার অন্তরালে নাটকীয় পরিবেশ, সংঘাত ও রসলোক সৃষ্টি করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। গ্রাম্য জীবনের সকল হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিরোধ ও দারিদ্র্যের অবসান ঘটিয়ে সুদূর প্রসারী কল্যাণ কামনায় লেখক উদগ্রীব। চকদার, আসাদ, কাঞ্চন, রঘু--চরিত্রগুলো আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। আসাদ আদর্শের প্রতীক, কাঞ্চন কল্যাণের ধারক ও বাহক। প্রণয়ী রঘু চকদারকে হত্যা করতে চেয়েছে, কিন্তু সে সবার মঙ্গল কামনা করে রঘুকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করেছে। সমবায় বিমুখ স্বামীকে রাজি করিয়ে খাল কাটার জন্য জমি দেয়ার ব্যবস্থাও করেছে। নিজের সুখ স্বাছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে দরিদ্র গ্রামবাসীদের ভাগ্যোন্নয়নে এগিয়ে এসেছে। ‘প্রচারধর্মী’ এ নাটকে নাটকীয় পরিবেশ বর্তমান। নাটকীয় দ্বন্দ্ব মৃদু। চরিত্রায়ণ যথাযথ। সংলাপ আবেগপূর্ণ। আসকার ইবনে শাইখের ‘এপার ওপার’ প্রচারধর্মী হলেও শিল্পমূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়।[৮২]

৯

আযীম উদ্‌দীনের ‘কাঞ্চন’ লোককাহিনী ভিত্তিক নাটক। ধোপার পাট পালাগান অবলম্বনে নাটকটি রচিত। সোনালীর জমিদার দিলীপ রায়ের পুত্র নন্দকিশোর গোদা ধোপার মেয়ে কাঞ্চনকে ভালোবাসে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের ছেলে আর ধোপার মেয়ের বিয়ে স্বীকৃত নয়। নন্দকুমার প্রেমের তীব্র আকর্ষণে এই সামাজিক বাধাকে সে মেনে নিতে চায়নি—

> নন্দ॥ সমাজ। কিন্তু সমাজ আমি চাই না। আমি হিন্দু চিনি না, মুসলমান চিনি না ; ব্রাহ্মণ চিনি না, শূদ্র চিনি না, চিনি মানুষ, চিনি তার মন। সমাজ মানুষের গড়া। দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচারের জন্য এর সৃষ্টি। ভগবানের রাজ্যে সমাজ নেই, সব সমান, সব একাকার। যে ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোকেও সৃষ্টি করেছেন। তবে কেন আমার পাশে তোর দাঁড়াবার অধিকার থাকবেনা?[৮৩]

উভয়ে উভয়কে ভালোবেসে গৃহত্যাগ করেছে। সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মে কাঞ্চনের পিতা গোদাকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। বিনা চিকিৎসায় অযত্নে কাঞ্চনের মা মালতী শেষ শয্যা নিয়েছে। এমনকি সমাজচ্যুত বলে তার সৎকারের দায়িত্বটাও সমাজ গ্রহণ করেনি---

৮২. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪

৮৩. আযীম উদ্দীন, কাঞ্চন, প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ১৯৬২, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বম্ভর।। যে জাতিচ্যুত, সমাজের যে বাইরে, তার সৎকারে সমাজ নেই।[৮৪]

সোনালী ত্যাগ করে নন্দ কিশোর-কাঞ্চন সুন্ধায় এক ধোপার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, উভয়ে ধোপার কাজ শুরু করেছে। সুন্ধার জমিদার কন্যা রাধা সুকৌশলে জমিদার নন্দন নন্দ কিশোরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে এবং সামাজিক রীতিতে তাদের বিয়ে হয়েছে। সংসার-সমাজ বর্জিত অসহায় নারী কাঞ্চন নন্দ কিশোরের এই অপমান, প্রবঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে 'ক্ষুরাই' নদীতে আত্মবিসর্জন দিয়েছে।

নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনুপস্থিত। হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা নাটকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের যে প্রভেদ নাট্যকার সেটি তুলে ধরেছেন।

১০

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও এদেশের জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব হয়নি। সমাজের মুষ্টিমেয় বিত্তবান লোক ছাড়া বাকি সবাই মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমাজের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে হতাশাগ্রস্ত জীবন যাপন করেছে। আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' নাটককে তুলে ধরেছেন অর্থনৈতিক সমস্যা সংবিত তেমনি এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনালেখ্য। গৃহকর্তা মজিদ একজন দরিদ্র স্কুল শিক্ষক। সংসারে বিবাহযোগ্য কন্যা কিন্তু পাত্রস্থ করার মত অর্থ নেই, একটি কিশোরী কন্যা এবং একমাত্র পুত্র আমিন অভাব অনটনে লেখাপড়া ছেড়ে হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করছে। সুযোগ বুঝে দুর্নীতিপরায়ণ সেক্রেটারী তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে। হেডমাস্টার মনসুর সাহেব তাকে কটাক্ষ করে বলেছেন—

মনসুর। আপনার মত অথর্ব অশত্থ গাছ জিইয়ে রেখে কোন লাভ আছে? শুধু লোকসান। আমি নতুন চারা লাগাব। পুরনো অকর্মণ্য লোক নিয়ে আমার চলবেনা। এটা চ্যারিটেবল্ ডিসপেন্সারি নয়—স্কুল, বুঝলেন?[৮৫]

দরিদ্র অসহায় স্কুল শিক্ষক মজিদ মাস্টার করুণ কণ্ঠে মিনতি জানিয়েছেন—

মজিদ। দেখুন আমার বিরাট সংসার—ছেলেমেয়ে, বৌ। আমি বেকার হলে ওদের যে পথে বসতে হবে। ছেলেটাও মানুষ হয়নি। আপনি বোধহয় এসব জানেন না—মানে আমার পারিবারিক সব সমস্যার কথা। কেমন করে জানবেন? আমিও কি আর কোনদিন বলেছি।[৮৬]

---

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
৮৫. আনিস চৌধুরী, মানচিত্র, বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩
৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

তার এই মিনতি কার্যকর হয়নি, চাকুরির অন্বেষণে তিনি হন্যে হয়ে ফিরেছেন শেষ পর্যন্ত জীবিকার সন্ধানে পরাজিত নায়কের মত গৃহ ত্যাগ করেছেন। আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে শহরে এসে ঠাঁই নিয়েছেন। দুঃখ-কষ্টে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, পুত্র উপার্জনক্ষম হয়ে সংসারী হয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সে ছোটটির দায়িত্ব নিয়েছে। পুত্র কন্যারা সবাই প্রতিষ্ঠিত। ঘটনাচক্রে পুত্র আমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে জোর করে পিতাকে নিজ গৃহে নিয়ে এসেছে। পুত্রবধূর অজান্তে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। কারো সুখের সংসারে তিনি বোঝা হয়ে থাকতে চাননি—

....

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
আমার সোনার ধানে যে সংসার আজ ভরে উঠেছে,
সেখানে আমার ঠাঁই কোথায়? আমাকে কেন জড়ানো।
আমার আর কদিন।[৮৭]

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস, প্রচ্ছন্ন বেদনার বোঝাকে সম্বল করে পথবাসী মজিদ মাস্টার পথকেই চিরসাথী করে নিয়েছেন। 'মানচিত্র' নাটকে মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র নাট্যকার দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সমালোচক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম মানচিত্র সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—

> ...আমরা প্রথম আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' নাটকে আমাদের বাস্তব মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিফলন খুঁজে পেলাম, ...সেখানে রয়েছে, গ্রাম্য স্কুল শিক্ষকের বেড়ার বাড়ি-ঘর, মঞ্চে আমরা আমাদের পরিচিত সংসার চিত্রগুলো খুঁজে পেলাম, সেই লাউয়ের ডগা, সেই ইলিশ মাছ, আদরের বেড়ালটি, আর মুসলমান সমাজের প্রচলিত পরিচিত মামাতো ভাইবোনের সলজ্জ মধুর প্রণয় দৃশ্য। শুধু তাই নয় এ নাটকে আমরা আমাদের অতি পরিচিত স্কুল মাস্টার, তার রুগ্না স্ত্রী আর স্কুলের সেক্রেটারী, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকেও দেখতে পেলাম। ... এই প্রথম আমরা মঞ্চে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা ও হতাশার রূপায়ণ দেখতে পেলাম।[৮৮]

নাটকটি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী, প্রতিটি চরিত্র নাট্যকারের সুগভীর পর্যবেক্ষণের ফল। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্রই এই মানচিত্রে উপস্থিত। দারিদ্র্যের কঠোর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত

---

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
৮৮. রফিকুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন মঞ্চ ও অভিনয়, মাসিক সমকাল, সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত, ঢাকা, কার্তিক ১৩৬৫, পৃ. ১৯৬। সংগ্রহ, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা

Dhaka University Institutional Repository

জীবনযুদ্ধে পরাজিত স্কুল মাস্টার মজিদের চরিত্রটি একটি বাস্তবধর্মী সার্থক চরিত্র। গ্রামের বিত্তবান জমিদার, সেক্রেটারী ইয়াকুবের চরিত্রটিও নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে চিত্রিত করে তুলেছেন। সেক্রেটারী ইয়াকুবের অনুগ্রহেই স্কুলটি চলছে, দরিদ্র শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না, পাওনা বেতন চাইতে গেলেও তার অজুহাতের শেষ নেই—

কলিম। হুজুর স্কুলের গরীব মাস্টারদের উপর একটু কৃপা না করলে আমরা যাই কোথায়?

ইয়াকুব। দেখ মাস্টাররা তাহলে খুলেই বলি। প্যাঁচের কথা আমার ভাল লাগে না। স্কুল করেছি বলে কি মাথা বেচে দিয়েছি।

কলিম। হুজুর স্কুল না করলে গরীবের ছেলেপুলেরা যে উচ্ছন্নে যেত—

ইয়াকুব। তাই যেত, সেটাই ভাল ছিল। খাল কেটে কুমীর এনেছি। আরে আমাকে কি শেখাবে মাস্টার। এই চাষাভূষের ছেলেরা দু' কলম পড়ে আজ বাদে কাল চোখ রাঙাতে আসবে, সে আর আমি জানি না—খুব জানি।[৮৯]

স্কুল সেক্রেটারী ইয়াকুব একজন স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রতিভূ হিসাবে সমুপস্থিত। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলেও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় জমিদার ও নায়েবের উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য নয়।

অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত পরিবেশেও সোনালী ভবিষ্যত আর নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছে রানু ও কামাল। তাদের প্রসঙ্গ নাট্যকাহিনীর সৌকর্য বৃদ্ধি করেছে। ব্যথা বেদনাহত এবং অভাব জর্জরিত বাঙালি মা হিসাবে মরিয়ম চরিত্র রূপায়ণে লেখক সার্থক।

নাটকে কোন আঙ্গিক অভিনবত্ব নেই, তবে সমাজকে রুঢ়ভাবে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার, দরিদ্র স্কুল শিক্ষকের জীবনের দুঃখ-দৈন্য ও লাঞ্ছনার করুণ চিত্র তিনি এঁকেছেন—মানচিত্রে। নাটকের ভাষা সহজ সরল ও সংলাপ আকর্ষণীয়।

১১

'উত্তর-ফাল্গুনী' নাটকে আ. ন. ম. বজলুর রশীদ আধুনিক জীবনের চাকচিক্য ও নগরকেন্দ্রিকতাকে সমালোচনা প্রসঙ্গে আদর্শ ও নীতিবাদ প্রচার করেছেন। নতুন আদর্শ ও নীতির সঙ্গে বস্তুর সংঘাত হয়েছে, আদর্শ ও নীতিরই জয় সূচিত হয়েছে। উত্তর-ফাল্গুনী দেশাত্মবোধমূলক এবং সমবায়ের আদর্শ উদ্বোধক উচ্চচিন্তার নাটক।[৯০]

---

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৯০. মুনীর চৌধুরী, মাহে নও, মার্চ, ১৯৬৫ সংগ্রহ, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী কবীর, নীলা বেশভূষা ও সাজ-সজ্জায় অত্যাধুনিক। অধ্যাপক আলী অর্থনীতির শিক্ষক, আদর্শ এবং সহজ জীবনের অনুরাগী। তিনি শ্রেণীকক্ষে আধুনিক সাজ-সজ্জা ও বেশবাসের নির্লজ্জতার সমালোচনা করেছিলেন, এতে কবীর-নীলা ক্ষুব্ধ হয়। অধ্যাপক আলী নির্বিকারভাবে আপন আদর্শ বলিষ্ঠ কণ্ঠে ব্যাখ্যা করে চলেন—

> আলী। ....বহিরাঙ্গের নেশায় আপনারা মেতে উঠেছেন। ফলে অন্তরঙ্গ ম্লান হয়ে আসছে। মনে করেছেন যত শান্তি, যতো তৃপ্তি আর সার্থকতা বস্তুর মধ্যে, নয়া কাটের সুট আর রুজ লিপস্টিক প্রসাধন দ্রব্যে।[৯১]

কবীর-নীলা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অধ্যাপক আলীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে। তার কন্যা জাহানারাও পিতার আদর্শে লালিত। জাহানারা বেশবাসে অত্যন্ত সাধারণ, সমাজ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে, তার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে নিজের অজান্তেই কবীর তাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

নাটকটির আসল সংকট শুরু হয়েছে অধ্যাপক আলীর পত্নী রওশনকে নিয়ে। রওশনের অনাড়ম্বর জীবনে বিত্তবান সালেহার বৈভবময় জীবনের সংস্পর্শ তাকে করে তুললো বিলাসী। বিত্তের চাকচিক্য, জৌলুসময় জীবন রওশনকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করলো। বিত্তের মোহে অন্ধ হয়ে সে তার স্বামীকে কঠোরভাবে আঘাত করেছে—

> রওশন। ভদ্র সমাজে বের হওয়ার মতো কাপড় আছে আমার। আজ কুড়ি বছর হলো চাকরি করছো, একভরি সোনা দেবার মুরোদ হলো না তোমার। আর সুতি কাপড় পরে পার্টিতে যাওয়া চলে না। কাতানের শাড়ির কথা ছেড়েই দিলাম, অন্তত একটা কাঞ্চিভরম থাকলেও না হয় ... ।[৯২]

সালেহার সঙ্গে একদিন বাজারে গিয়ে ছ' হাজার সাড়ে সাতশ' টাকার গহনা, দু' হাজার চারশ' পঁচিশ টাকার শাড়ি কিনে এনেছে, সালেহার প্ররোচনায় তার নিরীহ আদর্শবাদী অধ্যাপক স্বামীকে স্পেকুলেশন মার্কেটে নামতে বাধ্য করেছে—আদর্শ, নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে অর্থের পিছনে ছুটতে বাধ্য করেছে, সংসারে প্রাচুর্য্য এসেছে।

অধ্যাপক কন্যা জাহানারা তার আদর্শে অটুট থেকেছে, সে নয়াগ্রাম যেয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে নব জাগরণের বাণী পৌঁছে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কবীর ও জাহানারার আদর্শ অনুসরণ করে নয়াগ্রাম এসে দেশসেবায় মেতে উঠেছে। চাষাবাদ পদ্ধতির যান্ত্রীকরণের মাধ্যমে অধিক ফসল ফলিয়েছে, গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা

---

৯১. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, উত্তর ফাল্গুনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪, পৃ. ৬-৭
৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। নয়াগ্রামের খামারে সমবায়ের পদ্ধতিতে চাষাবাদের জয় জয়কার ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। জাহানারাও ফাল্গুনীর ছদ্মবেশে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে হেমজোড়ার বাঁধ প্রসঙ্গ নিয়ে গোলমালের সূত্রপাত হয়—ষড়যন্ত্র চলছিল, কবীরের প্রাণনাশের। অকস্মাৎ 'নীলা' এসে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কবীরকে রক্ষা করেছে।

অধ্যাপক আলী স্পেকুলেশানে ভুল করে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তার আদর্শের মৃত্যু ঘটেছে সেই দুঃখে তিনি ভারাক্রান্ত। কিন্তু তার পিতা শরীফ তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন—

> কে বলে তার মৃত্যু হয়েছে? তোমার মেয়ে জাহানারা তোমার ছাত্র কবীর তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তোমার ছাত্রী তার জন্য প্রাণ আহুতি দিয়েছে।[৯৩]

পিতার কথায় তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। তিনি সালামতকে জবাব দিয়েছেন—

> অর্থের লোভ আর দেখিও না। দেখালে কোন ফল হবে না। আমি আজ বিকালেই নয়াগ্রাম যাবো। রওশন, তুমি তৈরি থেকো।[৯৪]

নাটকের শেষ দৃশ্যে কবীর ফাল্গুনীরূপী জাহানারাকে চিনতে পেরেছে এবং উভয়ের মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকাপাত। নাটকটি উন্নত মানের রচনা, এই নাটকের মুখ্য চরিত্রগুলো যেমন মানবীয় রসে রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তেমনি আঘাতে-সংঘাতে, পরিবর্তনে তাদের মধ্য দিয়ে লেখকের আদর্শও সহজবোধ্য রূপ লাভের সুযোগ পেয়েছে।

জাহানারা এবং কবীর শেষ পর্যন্ত আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, সাময়িক জৌলুসের মোহে বিভ্রান্ত হয়নি। সামাজিক অবক্ষয়ে আলীর আদর্শ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, ব্যথিত কবীরের কণ্ঠে সেই আদর্শের বলিষ্ঠ উচ্চারণ—

> ... স্যার যাই করুন না কেনো, এখন তাঁর ভেতরকার আগুন আমাদের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। সে আগুন আমি চারিদিকে ছড়িয়ে দেবো। ভাব ও আদর্শ রোয়া ধানের মতো। যে মনে তারা জন্মে, সেখান থেকে তুলে অন্য ক্ষেত্রে লাগালে তাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় বিপুলতর। আমি নয়াগ্রাম চিনি। তার পাশেই আমার তিনশ' বিঘা খামার জমি। আমার সব দিয়ে যদি তার আদর্শকে রূপ দিতে পারি তবে।[৯৫]

কবীর শেষ পর্যন্ত তার শিক্ষকের আদর্শকে বাস্তবায়িত করে তুলেছে। সমবায় আদর্শ উপস্থাপন করতে গিয়ে নাট্যকার এখানে যেভাবে সমাজ ও বস্তু আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ তুলে ধরেছেন তা' হয়েছে মার্জিত রুচি সম্পন্ন

---

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

রসঘন এবং প্রশংসার যোগ্য।[৯৬] উদ্দেশ্যমূলক হলেও এতে সৃষ্টির আবেগ বড় হয়ে উঠেছে। প্রচার ধর্মিতা কিছু থাকলেও সাহিত্য-রস ক্ষুণ্ন হয়নি।[৯৭]

১২

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ধন্যবাদ'[৯৮] তিন বিশিষ্ট সামাজিক নাটক। এতে কোন দৃশ্য সংযোজন করা হয়নি। ষাটের দশকের সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নাটকের উপজীব্য। নাটকের একপ্রান্তে বর্ণিত দুঃখী মানুষের অভাব-অভিযোগ, দারিদ্র্য, অনশন, ক্ষুধায় মৃত্যু, অন্যদিকে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকবর্গের প্রসাদপুষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিভাবে দেশসেবার নামে অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, অর্থ ও যশের প্রলোভন দেখিয়ে সমাজ সচেতন যুব সমাজকে পথভ্রষ্ট করতে প্রয়াসী হয় সেই সব কায়েমি স্বার্থবাদীদের চিত্র ধন্যবাদ নাটকে বিধৃত।

খাদ্যমন্ত্রী জুলু চৌধুরীর গ্রামের সর্বহারা গরিব আদম আলী পেটের দায়ে শেষ সম্বল ভিটেমাটি বিক্রি করতে চেয়েছে—ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এ সত্য স্বীকার করতে সরকার রাজি নয়। মন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী দারোগা তদন্ত শেষে রিপোর্ট প্রদান করে। তদন্তের শুরুতেই দারোগা জনতাকে উদ্দেশ্য করে তার বক্তব্য পেশ করে—

> খোদাদদ খান। ... না খেয়ে মরাটা সরকারি নীতি নয়। তার অর্থ, আপনি যখন ইচ্ছে মরতে পারবেন কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু কোনক্রমেই না খেয়ে মরতে পারবেন না। জবানবন্দী দেওয়ার সময় এই দিকটার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।[৯৯]

খোদাদদ খানের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তৎকালীন সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারি প্রেসনোটে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে—

> ... সোনাকান্দি গ্রামের আদম আলি ওরফে আদু ক্ষুধার জ্বালায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু ইহা সবৈব মিথ্যা। সরজমিনে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে, আদম আলি আসলে অনশনে আত্মহত্যা করে নাই। কারণ, মৃত্যুর সময় তাহার ঘরে প্রচুর চাল ডাল ও অনেক টাকা ছিল। প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে, অনেকদিন নিদারুণ রক্তামশয়ে ভুগিতে ভুগিতে অসহ্য হওয়ায় সে গলায় ফাঁসি নিয়াছে।[১০০]

---

৯৬. মুনীর চৌধুরী , মাহে নও, মার্চ ১৯৬৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৪

৯৭. পূর্বোক্ত, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, পৃ. ৩৬৪

৯৮. ধন্যবাদ নাটকের রচনাকাল ১৩৬৫, প্রকাশকাল ১৩৭০ (১৯৬৪) আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর শ্রেষ্ঠ নাটক গ্রন্থে সমস্ত নাটক একত্রিত করে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটি ষষ্ঠ ঢাকা বইমেলা ৯৯ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়

৯৯. আলাউদ্দিন আল আজাদ, শ্রেষ্ঠ নাটক, ধন্যবাদ, পৃ. ৩৮

১০০.শ্রেষ্ঠ নাটক, পূর্বোক্ত, ধন্যবাদ, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

এই রিপোর্ট প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়, পাক-শাসিত সরকারের দুর্নীতি আর অপকর্মের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। গ্রামের অশিক্ষিত নিরীহ লোকজনকে প্রতারণা করে সরকারি আমলারা তাদের নিজস্ব স্বার্থোদ্ধারের জন্য নানা রকম কলাকৌশল প্রয়োগ করেছে।

স্বৈর শাসনের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে অবরুদ্ধ দেশকালের মধ্যে জ্বলে উঠেছে বিপ্লবের অগ্নিশিখা। গ্রামের তরুণ যুবক আনিস গ্রামের লোকজনদের মধ্যে বিপ্লবের চেতনা জাগ্রত করেছে। সে চায় এদেশ থেকে সকল মিথ্যা, অন্যায়, অবিচারের অবসান হোক। অভাব, অনটন, মৃত্যু-ক্ষুধার অবসানে নতুন যুগের সূচনা হোক। মেহের ও ফুলবানু আনিসকে সহযোগিতা করেছে। খাদ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি রাজা আলি আনিসকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করেছে—

> রাজা আলি : ... রিমেম্বার, চান্স ইজ লাইফ। ভালো চান্স পেলে তুমি একটা কিছু হয়ে যেতে পারবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সেকেন্ড ইয়ারে আছ, সিরিয়াসলি পড়াশোনা করে পরীক্ষাটা দাও। ইউনিভারসিটির খরচের জন্য ভাবতে হবে না। ... যদি ফরেন যেতে চাও তারও ব্যবস্থা সহজেই করে দেয়া যাবে। আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স ইটালি জার্মেনী যে দেশে ইচ্ছে যেতে পার।[১০১]

শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যুবক আনিস রাজা আলিদের মত কুচক্রীদের হাতের ক্রীড়নক নয়, সে সমস্ত প্রলোভন জয় করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে—

> আনিস : চুপ করুন। আমি সব বুঝতে পেরেছি, আর হিপোক্রেসি করবেন না। কিন্তু জেনে রাখুন, আগুনকে ছাই দিয়ে রাখা অসম্ভব। বাতাস পেলে যে দাউ দাউ করে জ্বলবেই।[১০২]

আনিসের মত যুবকরা পরাভব স্বীকার করে না, দেশের মঙ্গলের জন্য, জনসাধারণের কল্যাণ কামনায় জীবন উৎসর্গ করে। নাট্যকার নিজেও ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, কারাভোগ করেছেন। 'সে সময় অনেক নেতা-কর্মীই বাংলা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে সরকারি সহায়তায় বিদেশে পাড়ি দেন—সরকারি উচ্চপদ লাভ করেন।'[১০৩]

শ্রেণী সচেতন মানুষের বিপ্লবী প্রতিনিধি—আনিস, আনিসের নেতৃত্বে একদিন নির্যাতিত শ্রমজীবী মানুষ জেগে উঠবে। পাকিস্তান সরকারের প্রচলিত নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে আনিস যেন এক মূর্ত প্রতিবাদ, নাট্যকারের সার্থক সৃষ্টি—

---

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১০২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১০৩. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : একুশের সংকলন ৮০ : স্মৃতিচারণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

> ... কাঠের আগুন সহজেই নেভে, কিন্তু প্রাণের আগুন বড় ভয়ঙ্কর একবার জ্বলে সকল মিথ্যা প্রবঞ্চনাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে এবং তার মাঝখান থেকে জাগায় অঙ্কুরিত উচ্ছসিত হিল্লোলিত জীবনের রক্তপদ্ম।[১০৪]

সেলিম পাগলাও আনিসের আন্দোলনে শরীক হয়েছে। সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলে—

> আমিও মরেছিলাম, কিন্তু এই দেখ আবার বেঁচে উঠেছি। নতুন যুগের দিশারী আমরা নতুন যুগের যাত্রী। অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি ; সে সময় যারা আমাদেরকে অত্যাচার অবিচারের শাসন শোষণের থাপ্পর মেরে জাগিয়ে দেয়, তারা আমাদের শত্রু হলেও বন্ধু। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।[১০৫]

'ধন্যবাদ' নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের জীবনালেখ্য। কায়েমি স্বার্থবাদীদের শোষণের প্রতি এক তীব্র রোষ ফুটে উঠেছে। শ্রেণী সংঘাতের বাস্তব চিত্র ও মানবতার প্রতি গভীর মমত্ববোধ এই নাটকের কেন্দ্রীয় চেতনা। খোদাদদ খান, জুলু চৌধুরী, রাজা আলি—সমকালীন সামন্ত প্রভুদের সার্থক প্রতিভূ। কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ রচনার দক্ষতায় আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ধন্যবাদ' সার্থকতার দাবিদার।

১৩

ইউরোপীয় আধুনিক নাট্য-আঙ্গিকে রচিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'তরঙ্গভঙ্গ'[১০৬] সমকালীন নাট্যসাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। নাটকে কোন অঙ্ক বিভাগ নেই, মাত্র তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত এ নাটকে মঞ্চপরিকল্পনায় অভিনবত্ব বর্তমান। প্রথম দৃশ্যে বিচারালয়, দ্বিতীয় দৃশ্যে জেলখানা এবং শেষ দৃশ্যে পুনরায় বিচারালয়ের উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটকে উপস্থাপিত চরিত্রসমূহকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—এক. বিবেকবান, ন্যায়ানুগ ও সত্যানুসন্ধানী, দুই. নীতি বিবর্জিত, স্বার্থবাদী ও ভণ্ড। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে : জজ, ভিখারিণী, যুবক, মতলুব আলী এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে : আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী, উকিল, বারিশপীর এবং কিছু জনতা, ভিখারিণীর সংলাপের মধ্য দিয়েই নাট্যকার নাটকে উপস্থাপিত দুটি শ্রেণীর যথার্থ পরিচয় তুলে ধরেছেন —

---

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

১০৬. 'তরঙ্গভঙ্গ' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় নাটক। ১৩৭১ সালে আষাঢ় মাসে (অর্থাৎ ১৯৬৫-র জুন-জুলাইয়ে) বাংলা একাডেমী এটি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার পূর্বে এটি ত্রৈমাসিক 'সংলাপ' পত্রিকায় পরপর দু' সংখ্যায় বেরিয়েছিল, ১৯৬২ সালে, 'একটি বিচারকের কাহিনী' নামে। এ-নাটকের রচনাকাল ১৯৬১-৬২ হলেও নাট্যগ্রন্থ হিসাবে প্রকাশে বিলম্ব ঘটার কারণ ছিল। নাট্যকার নাটকের নামই শুধু পরিবর্তন করেননি, তিনি নাট্যাংশে বর্জন-সংযোজন-পরিমার্জন ইত্যাদি সংস্কার করে প্রায় একটি নতুন নাটকে এর রূপান্তর ঘটিয়েছেন। অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন মন্তব্য করেছেন, "প্রকৃতপক্ষে 'তরঙ্গভঙ্গ' পুনর্লিখিত নাটক"

Dhaka University Institutional Repository

> ...দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তবে আসামীকে নিয়ে নয়। ...একদল সাধু, অন্যদল অসাধু। তবে কোন্ দল সাধু কোন্ দল সাধু নয় তা সহজে বোঝা মুশকিল।[১০৭]

'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র আমেনা, গ্রাম বাঙলার এক দুঃখিনী নারী। তার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। স্বামী-সন্তান হত্যার দায়ে সে আদালতে অভিযুক্ত। পারিবারিক অভাব-অনটন ও রোগ-শোকের চাপে পড়ে আমেনা তার স্বামী ও শিশু সন্তানকে হত্যা করেছে। তাকে এই হত্যাকাণ্ডে প্রলুব্ধ করেছিল সমাজের এক ভণ্ড ব্যক্তি আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী। নাট্যকার প্রতীক চরিত্র ভিখারিণীর সংলাপে তা তুলে ধরেছেন—

> ভিখারিণী। ...সেদিন দুপুর বেলা উঠানে বসে আমেনা, পাশে চারটে সন্তান ট্যা ট্যা করছে ক্ষিধেয়। সে গিয়েছিল মিঞাদের বাড়িতে কাজের খোঁজে। কিন্তু মিঞাদের বাড়িতে কাজ নেই। আজও নেই কালও নেই। মিঞার বিবি নাকের নথে ঝট্‌কা দিয়ে বললো, না গো বেটি, তোমার কোলের এইটুকুন বাচ্চা কেঁদে কেঁদে জান খেয়ে ফেলবে, বড় ছেলেমেয়েগুলো ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি করে পাগল বানিয়ে দেবে। তুমি তাদের সামলাবে না কাজ করবে।...উঠানে বসে সে কথায় ভাবছিল আমেনা। হঠাৎ তখন উঠান অতিক্রম করে কে তার কানে কানে বলেছিল, আমেনা, আমি যা বলি তাই কর।...কে বলেছিল, চল আমেনা, অন্তত একটা সমস্যার সমাধান কর। কারণ কত আর সহ্য করা যায়।...
>
> নিষ্পাপ শিশু খোদার কাছেই ফিরে যাবে। তোমার গুনাহ হবে, তুমি দোজখে যাবে, কিন্তু তার কষ্টের শেষ হবে।...
>
> আমেনা বললো, 'আমি দোজখের আগুনকে ভয় করি না। আমার বাচ্চার দুঃখ-কষ্ট যদি শেষ হয় আমি দোজখে যেতে রাজী।[১০৮]

আমেনার এই অধঃপতন বা মানসিক বিকৃতির জন্য প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, নিঃস্ব অনাহারী আমেনা বিপ্রতীপ পরিবেশের শিকার হয়ে স্বামীর মুখে বিষ তুলে দিয়েছিল, কোলের শিশুকে গলা টিপে হত্যা করে সে নিজেও মরতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। 'চার-চারটে সন্তান কী করে? স্বামীর কষ্টে দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে মরতে গিয়েছিল। স্বামী আর বেঁচে নেই বুঝতে পারলে সন্তানদের কথা মনে পড়লো মায়ের মন।[১০৯] আমেনা জীবনবাদী, সেও সমাজের অন্যান্য নারীর মত স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করতে চেয়েছিল কিন্তু এই নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থা তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। যে মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী তাকে সন্তান হত্যায় প্ররোচিত করেছিল সেই তার

---

১০৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, তরঙ্গভঙ্গ, ২য় প্রকাশ, ১৩৭৫, পৃ. ১৯
১০৮. তরঙ্গভঙ্গ, প্রকাশকাল ১৯৬৫, পৃ. ৩১-৩২
১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তির জন্য জজের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছে। সত্য ও ন্যায়পরায়ণ জজ সাহেব আমেনার বিচারে বিলম্ব করায় আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। উকিল সম্প্রদায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তার বিচার ক্ষমতার উপর অনাস্থা এনেছে—

> আপনার মতিগতি ফিরবে বলে অপেক্ষা করতে থাকলে সমাজের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়বে, তার মেরামত আর তখন সম্ভব হবে না। তখন আপনাকে নয়, আমাকেই জবাবদিহি দিতে হবে।[১১০]
>
> একটি নয়, দুই-দুইটি নৃশংস হত্যা অনাত্মীয় অপরিচিত কেউ নয়, নিজেরই সন্তান, নিজেরই স্বামী।...যাদের ঈমান আছে, দিলে ভয়-ডর আছে, বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে তাদের বিলম্ব হবে না। কী করি, এ অনাচার বন্ধ করতেই হবে। সবারই নিরাপত্তার জন্যে কাজটি আমাকে করতেই হবে।[১১১]

জীবনযুদ্ধে পরাজিত আমেনা স্বামী-সন্তান হত্যার কথা অবলীলাক্রমে স্বীকার করেছে, উন্মাদের মত হাসি হেসে সে নীরব হয়ে গেছে। বিবেকবান জজ সাহেব আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীর ষড়যন্ত্রের কাছে পরাজিত হয়েছেন। জনতা আমেনাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। ধর্মের ছত্রছায়ায় বসে সমাজের এই সমস্ত ভণ্ড, মুখোশধারী ব্যক্তি ছলনার আশ্রয় নিয়ে অসহায় মানুষদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। ধর্ম ও সমাজ রক্ষার নামে নানা ধরনের মতবাদ প্রচার করে।

এই নাটকের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র ভিখারিণী তার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিস্কার। সাথে ভাঙ্গা পাত্র। নাট্যকার তার মুখ দিয়ে আমেনার দুঃখ-বেদনা ও স্বামী হত্যার কাহিনী বিবৃত করেছেন। সমাজের ভণ্ড স্বার্থবাদী ব্যক্তিদের স্বরূপ তার অজানা নয়, সে প্রতিবাদী, নির্ভীক আর সত্যানুসন্ধানী। সামাজিক বিশৃঙ্খলা আর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ সোচ্চার—

> আমি ঝোঁপ ঝাড়ের সাপ নই, পানি-ঢোড়া সাপ নই, আমার বিষথলি কখনো শূন্য হয় না, ক্রোধ ও নিঃশেষ হয় না। এই বিষ দিয়ে, এই ক্রোধ দিয়ে তাকে রক্ষা করবো।[১১২]

ভিখারিণী শেষ পর্যন্ত দুঃখিনী আমেনাকে রক্ষা করতে পারেনি। নাটকের শেষে দেখা যায় সেও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তার মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে নাট্যকার জজ সাহেবের মনোজগতের বিভঙ্গ ভাবনার রূপ উন্মোচনে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি একজন দায়িত্ব সচেতন বিচারক হয়েও নেওলাপুরীর শাস্তির ব্যাপারে অস্তিত্বহীনতায় ভোগেন এবং এক সময় তার মৃতদেহ ছাদ থেকে ঝুলতে থাকে। স্পষ্টত বোঝা যায়, 'কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)

---

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
১১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০-৬১
১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের মুহম্মদ মুস্তাফার মতো অস্তিত্ব বিলুপ্তি যন্ত্রণায় তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। 'আর বিচারকের এই স্বেচ্ছা মৃত্যুতে তার অস্তিত্বময় জাগরণের প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে হলেও গভীরতর বিবেচনায় তা মূলত অস্তিত্ব থেকে পলায়ন। বস্তুত, শর্তবন্দি সমাজব্যবস্থায় ন্যায় বিচার প্রদানে ব্যর্থ, অস্তিত্বের দায়ভার বহনে অসমর্থ হয়েই অস্তিত্ব থেকে পলায়ন করেছেন।[১১৩]

মতলুব আলী চরিত্রটিও প্রতীক চরিত্র হয়ে উঠেছে। ভিখারিণীর মত সেও বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। সেও সমাজের প্রতিকূল পরিবেশের শিকার। কোন এক যুদ্ধের শুরুতে সে কিছু টাকা উপার্জন করেছিল, তা দিয়ে তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার অনেকগুলো বিল আটকে গেছে। এক সময় তার অবস্থা ভালো ছিল, আজ খারাপ হয়েছে বলে অনেকে তাকে কটাক্ষ করে, পাগল ভাবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বিপর্যস্ত মতলুব আলীর কণ্ঠে হতাশার সুর শোনা যায়—

> শান-শওকাতে বিয়ে দিলাম তিন মেয়ে। কিন্তু জামাইগুলো কী আমার খোঁজ-খবর নেয়? বিলগুলি যদি একবার পাশ করাতে পারতাম তবে তাদের পরওয়াই করতাম না।[১১৪]

সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে মতলুব আলী ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

উকিল ও বারিশপীর যেন আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীরই অনুসারী। নেওলাপুরীর ষড়যন্ত্রে তারা সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। উকিলের সহযোগিতায় উকিল সম্প্রদায় জজের বিচার ক্ষমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, বারিশপীর নেওলাপুরীকে ভলো মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের কেরানী, হেকিম, বই বিক্রেতা, পুলিশ, চাপরাশী, গ্রামবাসী, শ্রোতা প্রমুখ অপ্রধান চরিত্র নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

কোন কোন সমালোচক 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটককে এ্যাবসার্ড নাটক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এ্যাবসার্ড নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য ভাবনার অসঙ্গতি, অর্থহীন ভবিষ্যতের জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা এবং সঙ্গতিহীন, আপাতবিচ্ছিন্ন সংলাপ এ নাটকে নেই। দ্বিতীয় দৃশ্যে এ্যাবসার্ড নাটকের স্পর্শ থাকলেও তরঙ্গভঙ্গ এর মূল প্রেরণা এ্যাবসার্ড রীতি নয়, বিন্যাসরীতি এবং চিন্তাস্রোতে তা যথার্থ অর্থেই অভিব্যক্তিবাদী রীতি আশ্রয়ী নাটক।[১১৫]

তিনটি দৃশ্য সম্বলিত 'তরঙ্গভঙ্গ' অভিব্যক্তিবাদী নাটক। অভিব্যক্তিবাদীরা মানুষের মনোজগতের বিভঙ্গ ভাবনার উন্মোচন ঘটান, স্বপ্ন সেখানে পালন করে সহায়ক ভূমিকা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তিনটি

---

১১৩. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, পৃ. ১৬৯

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১১৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, প্রবন্ধ, বাংলাদেশের পাঁচটি নাটক : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই নাটকের প্রথম দুটো দৃশ্যে চরিত্রসমূহের অন্তর্মর্ম ভাবনা মগ্ন চৈতন্য প্রবাহরীতিতে প্রকাশিত হয়েছে। স্বপ্ন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে নাট্যকার চরিত্রসমূহের অন্তর্সত্তাকে উন্মোচিত করেছেন। 'দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বপ্নের জগতে কুকুরের পৌনঃপুনিক আর্তনাদ যেমন জজ সাহেবের যন্ত্রণাময় আর্তির প্রতীক, তেমনি চশমা হয়ে ওঠে মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতিতে শর্তবন্দি মানুষের অস্তিত্বহীনতার প্রতীক।[১১৬] মতলুব আলীর সংলাপের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব জিজ্ঞাসু অবচেতন সত্তার প্রকাশ ঘটেছে—

> মতলুব আলী॥ একদিন আমি ছায়াশূন্য ছিলাম। মনে হয় বহুদিন আগে। তারপর সেই ছায়া এলো, হঠাৎ। শূন্যমাঠে ঘুর্ণি ওঠার মতো, হঠাৎ। প্রথমে আমার আশে পাশে ঘোরে, সাহস নেই যে ঝট করে আমাকে ছোঁয়। তখন আমারও যেমন তাকে ভয়, তারও তেমনি আমাকে ভয়। তারপর একদিন আমার হার হলো। যেদিন সে আমার ভেতরে প্রবেশ করলো, সেদিন অদ্ভুত একটা তৃপ্তিও পেলাম। কখনো কখনো ভাবি, কে কাকে গ্রহণ করেছে? সে বীভৎস ছায়া আমাকে গ্রহণ করেনি, আমিই তাকে গ্রহণ করেছি। জজ সাহেব, বগলে বিল নিয়ে যে ঘাটে-বাটে পাগলের মতো ঘোরাঘুরি করি, সেটা আমার বাইরের চেহারা। সেটা সমাজে বাস করার ছাড়পত্র শুধু। ভেতরে চেহারা ভিন্ন। ভেতরে আমি আর মানুষ নেই। জজ সাহেব।[১১৭]

অভিব্যক্তিবাদী নাটকের উপযোগী সংলাপ নির্মাণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ব্যক্তির অবচেতন মনের ভাবনা তরঙ্গের বিভঙ্গতা উপস্থাপন করে নাট্যকার এই নাটকে সংযোজন করেছেন অভিব্যক্তিবাদী চেতনা। পরাধীনতার গ্লানি, হতাশা-নৈরাশ্য, আত্মিক শূন্যতাবোধ ও সামাজিক অবক্ষয় মানুষের সুখ-স্বপ্ন ও আশাবাদ যখন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় তখন সেই প্রতিকূল পরিবেশে মানবসত্তার যন্ত্রণাময় অবস্থার অনুভূতিকে রূপায়ণের প্রয়োজনেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অভিব্যক্তিবাদী রীতিকে আশ্রয় করে 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের প্রেক্ষাপট সাজিয়েছেন।

১৪

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রতীকাশ্রয়ী নাটক 'সুড়ঙ্গ' একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনা। এ নাটকে প্রচ্ছন্ন প্রেম, রহস্য কৌতুক থাকলেও ঘটনা বিন্যাসে রয়েছে এক রূপকীয় আবহ। নাটকটি প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র নিজস্ব বক্তব্য—

> নাটকটি প্রধানত কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা। তবে তরুণমনা বয়স্করা—যারা সম্ভব অসম্ভব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, তারা এটি পড়ে বা দেখে আমোদ বোধ করবেন বলে আশা রাখি।

---

১১৬. পূর্বোক্ত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, পৃ. ১৭০
১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

> নাটকটি প্রথম ১৯৫৫ সালে দৈনিক সংবাদের আজাদী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েক বছরের পুরোনো লেখা। তাই এখানে সেখানে একটু অদল-বদল করেছি।[১১৮]

ষাটের দশকের স্বৈর শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে কোন কোন নাট্যকার সমাজ-মনস্ক, মৃত্তিকা সংলগ্ন নাট্য রচনা থেকে দূরে সরে গিয়ে ইউরোপীয় নাট্যকলার আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁদেরই একজন।

'সুড়ঙ্গ' নাটকের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে রেজ্জাক সাহেবের কন্যা রাবেয়াকে কেন্দ্র করে। তার বয়স পনের ষোলো। রেজ্জাক সাহেব তার মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেছেন। বিয়ের কয়েকদিন পূর্বে তার একটি উপসর্গ দেখা দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়ে চাদর আবৃত হয়ে সারাক্ষণ তার ঘরে শুয়ে থাকে। ডাক্তার-হেকিম সবাই তার চিকিৎসা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তার শরীরে কোন অসুখ নেই। মাতৃহারা কন্যাটিকে নিয়ে পিতার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। এক পর্যায়ে তার সন্দেহ হয়েছে, বিয়েতে সম্ভবত মেয়ের মত নেই—

> বিয়ে এড়াবার জন্য তুই অসুখের ভান করছিস না তো? দুলা কি তোর মনোমত নয়? বল্ ... কথা দিচ্ছি, যদি কোন কারণে বিয়ে করতে না চাস বা ছেলে মনোমত না হয়, তবে যে কোন অজুহাতে—ধর্ তোর এই ভান করা অসুখের অজুহাতেই বিয়েটা এক্ষুণি ভেঙে দেবো। বল্ মা, বল্। বিয়ে করতে চাস না তুই?[১১৯]

রাবেয়া স্পষ্টই পিতাকে জানিয়ে দিয়েছে বিয়েতে তার সম্মতি আছে, 'দুলায়' অমত নেই। এক দুর্দমনীয় কৌতূহল আর রহস্য উন্মোচনের অপার আগ্রহে সে রোগী সেজেছে। রাবেয়ার চাচাতো ভাই 'কলিমুদ্দিন' ও 'জনৈক যুবক' উভয়েই রাবেয়ার পাণিপ্রার্থী। তারা জনরব শুনেছে রাবেয়াদের বাড়িতে গুপ্তধন আছে এবং কৌশলে তা উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। এই রহস্য রাবেয়াকে আনন্দ দেয়, কিন্তু সে রহস্য ভেদ করতে চায় না—

> রাবেয়া। কাল থেকে শুনছি শুয়ে-শুয়ে—কেন জানব না? কেউ সুড়ঙ্গ কাটছে। তার গন্তব্যস্থল হল সিন্দুক।
>
> কলিম। (রাগে ফেটে পড়ে) তুমি জান অথচ দিব্যি শুয়ে আছ? জান না, কেউ যদি সিন্দুক পর্যন্ত পৌঁছায়, তবে অগাধ ধন চুরি হয়ে যাবে? তাকে বাধা দেবার কোনো ব্যবস্থাই করছ না?
>
> রাবেয়া। আপনাকেও—তো আমি বাধা দেই নি।
>
> কলিম। ও (একটু ইতস্তত করে জোর দিয়ে) কিন্তু আমি যে ঘরের লোক। এ-ধন আমাদের সকলের।

---

১১৮. বহিপীরের সমকালীন রচনা সুড়ঙ্গ, কারণ ১৯৫৫ সালের দৈনিক সংবাদ স্বাধীনতা সংখ্যায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন বাংলা একাডেমী। 'সুড়ঙ্গ' ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১১৯. সৈয়দ আকরম হোসেন (সংগৃহীত-সম্পাদিত), ১৯৮৭, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫০২

Dhaka University Institutional Repository

রাবেয়া। সে জন্যই ফকির সেজে এসেছেন বুঝি?

কলিম। তুমি বুঝবে না সেসব কথা। কিন্তু আলোচনার সময় নেই। জায়গাটা কোথায় বল।

রাবেয়া। এত অধীর হচ্ছেন কেন? যে-লোক আজ দু'দিন ধরে মাটি কেটে কেটে সুড়ঙ্গ বানিয়ে তিল তিল করে এগিয়ে আসছে, তাকে অন্ততপক্ষে সিন্দুক পর্যন্ত পৌছতে তো দিন। না হলে তার সমস্ত শ্রমই পণ্ড হয়ে যাবে যে।

কলিম। না, তুমি পাগল, বদ্ধ পাগল।

রাবেয়া। আমি পাগল হতে যাব কেন? বরঞ্চ আমার মধ্যে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা, দয়া-মায়া আছে। ভাবুন লোকটির কথা। সে কী অমানুষিক পরিশ্রমই না করছে আজ দু'দিন ধরে। ফকিরি পোশাক পরে ধিনধিন করে নেচে বেড়ানো আর সুড়ঙ্গ কাটার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তাছাড়া আরেক কথা। সে যে শুধু অসম্ভব পরিশ্রমই করছে তা নয়, তার মধ্যে লজ্জা শরমও আছে। তাই সে দিনে দুপুরে ডাকাতি করছে না যা-করবার তা সকলের চোখের আড়ালেই করছে, এমনকি চাঁদ-সূর্য, পশুপক্ষীও জানে না সে কী করছে।[১২০]

নাট্যকার কলিমকে ফকিরের পোশাক পরিয়ে স্বার্থসিদ্ধির যে প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন, তাতে 'বহিপীর' নাটকের 'বহিপীর'ও তরঙ্গভঙ্গ নাটকের 'আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে বয়সের পার্থক্যের জন্য কলিমের কর্মকাণ্ড কৌতুকপ্রদ মনে হলেও ঘৃণার উদ্রেক করে না। যুবক চরিত্রটি একটু ভিন্নধর্মী, তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যুবকের প্রতি রাবেয়ার সহানুভূতি বা কৌতূহল রয়েছে। 'সুড়ঙ্গ' ভেদ করে যুবকটি বের হয়ে আসে। সে কলিমের বন্ধু। তার প্রতিযোগী বন্ধু কলিম তাকে যে কোন মুহূর্তে খুন করতে পারে, সে ভয়ে সে ভীত। এ প্রসঙ্গে রাবেয়ার বক্তব্য—

রাবেয়া। ...দু'দিন ধরে আপনার সুড়ঙ্গ কাটা শুনেছি আর ভেবেছি আপনার কথা। আপনি নিশ্চয় কলিম ভাইয়ের বন্ধু, যার সঙ্গে গুপ্তধনের লোভে নিশ্চয়ই বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন।

....

যুবক। না কলিম এক দিক দিয়ে ঢুকতে না পেরে সুড়ঙ্গের ও মাথা দিয়ে ঢুকতে গেছে। তার মাথায় খুন চড়েছে। সে আমাকে মেরে ফেলবে।

রাবেয়া। ...ভয় দেখিয়েছে। সুড়ঙ্গের ও মাথা দিয়ে ঢুকবে, না হাতি করবে। সুড়ঙ্গে, মাটির অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে সবাই কি ঢুকতে পারে? যে-কাটে, সেই আবার ঢুকতে পারে, কারণ সে মাটির অন্ধকারের রহস্য নিজের হাতেই একটু একটু করে ভেদ করেছে। তার কাছে সে দুর্ভেদ্য অন্ধকার আর ভীতিজনক নয়।

---

১২০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৮

Dhaka University Institutional Repository

যুবক। কিন্তু ও ঢুকবে। ওর মাথায় খুন চড়েছে যে।[১২১]

গুপ্তধন পাওয়ার আশায় যুবক রাতদিন সিঁদ কেটেছে, কলিম ফকিরের ছদ্মবেশ নিয়েছে। কিন্তু গুপ্তধন প্রাপ্তির সৌভাগ্য তাদের হয়নি। কেননা সিন্দুক শূন্য। গুপ্তধন পাওয়ার আশায় দুই যুবকের প্রতিযোগিতা, নিরন্তর সংগ্রাম নাটকে এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। রাবেয়া অসুখের ভান করে সেটা উপভোগ করেছে—

> ...আমি ভালোই আছি আব্বা। আমি যেন কেমন স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম গুপ্তধনের। দেখছিলাম, অনেক-অনেক সোনা-মোহর আলোতে ঝকঝক করছে। দেখে যেন চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। মনে নেই আপনি গল্প বলতেন? বলতেন, জনরব সে আমাদের বাড়িতেই এমনি গুপ্তধন আছে? আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, সেটা যেন জনরব নয়, সত্যি।[১২২]

রাবেয়া, কলিম ও যুবক—তিনটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক এক ধোঁয়াটে, রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। এই রহস্যের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় 'সুড়ঙ্গ' নাটক।

সুড়ঙ্গ নাটকটির কাহিনী রহস্যমণ্ডিত, অবিশ্বাস্য—এবং এই রহস্য ও অবিশ্বাসের পটে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তুলে আনতে চেয়েছেন মানুষের চেতনার গভীরস্থ লোভ-লালসা-ঘৃণা ও ঈর্ষাকে।[১২৩] সুড়ঙ্গ নাটকের অ্যাবসার্ড ধর্ম নির্দেশ প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র কিশোর-নাটিকা সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), এতেও এ্যাবসার্ড নাটকের ছায়া আছে। কাহিনীটি ধোঁয়াটে, সবকিছু পরিষ্কার বোঝা যায় না, ঘটনার গতি প্রকৃতি রহস্যের আড়ালে ঢাকা থাকে আর সমস্ত ঘটনা ঘটে একটা বিশ্বাসহীন আবহাওয়ার মধ্যে...।[১২৪]

'সুড়ঙ্গ' নাটকের সংলাপে আছে সামঞ্জস্যহীন, আপাতবিচ্ছিন্ন ভাব যা সৃষ্টি করেছে এক রহস্যময় ধোঁয়াটে পরিবেশ—

কলিম। ...এখনো চোখ নিমীলিত, নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না। অথচ তুড়ি বাজালে চোখ কাঁপে। কিন্তু তুমি ঘুমাও। তোমার গায়ে পালকের আঁচড় পর্যন্ত পড়বে না। তুমি ভান করছো, আমিও ভান করছি।...দু-জনের স্বার্থে সংঘর্ষ হবার কোনই কারণ নেই। একজন চোখ বুঁজে শুয়ে থাকবে, আরেকজন আপন মনে কাজ করে যাবে।

....

১২১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী (২য় খণ্ড), পৃ. ৫১০
১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৫
১২৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ১৮৭-৮৮
১২৪. কবীর চৌধুরী, এ্যাবসার্ড নাটক, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

রাবেয়া। তিনটে নয়।

কলিম। (চমকে উঠে) কে। ও।

রাবেয়া। (ফিক করে হেসে) তিনটে নয়, চারটে।

কলিম। (কিছুটা বিরক্তির ভাব করে) কী চারটে?

রাবেয়া। দাঁত। পোকা পড়া দাঁত।

কলিম। ও (নকশা পড়ে)।

রাবেয়া। সেটা বড় কথা নয়। কেন, আমার নানির দশ দশটা দাঁতে পোকা ছিল, তবু নানা-নানি কখনো ঝগড়া করেনি। আসল কথা, আপনি ফিকিরে ফকির। মানে ফকিরের সাজ সেজে কিছুর ফিকিরে আছেন।

কলিম। না, না, আমি ফকির, মস্ত ফকির। তবে একটু অদ্ভুত ধরনের। তুমি বুঝবে না।

রাবেয়া। আরেক কথা। আব্বার হার্টের আর ব্লাড-প্রেসারের গোলমাল তো আছেই, চোখেও আছে। শুধু বড়াই করে বলেন, বাজপাখির মতো তাঁর দৃষ্টি।

কলিম। (আবার মেঝে মাপতে মাপতে অন্যমনস্কভাবে) কেউ নিজের দোষ স্বীকার করে না।

রাবেয়া। আমি সে কথা বলছিলাম না। বলছিলাম যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি সত্যিই যদি বাজপাখির মতো চোখা হতো, তাহলে তিনি আপনাকে ঠিক চিনতেন। আমি তো চিনেছি। সেই হাঁটা, সেই গলা, আর সেই নাকের আওয়াজ।

কলিম। (সচকিত হয়ে তার দিকে চেয়ে) কি বাজে কথা বলছো?[১২৫]

কলিম এবং রাবেয়ার সংলাপে আপাত কোন যোগসূত্র নেই, দু'জনের বিচ্ছিন্ন ভাবনা এক অস্পষ্ট, রহস্যময় দুর্ভেদ্য জগৎ নির্মাণ করেছে। এই অস্পষ্ট রহস্যময়তা এ নাটকে সংযোজন করেছে অ্যাবসার্ডধর্মী শিল্পমাত্রা।

১৫

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'উজানে মৃত্যু'[১২৬] তিন চরিত্রবিশিষ্ট একাঙ্ক নাটক। নাটকের কাহিনী বিন্যাস পাশ্চাত্য আঙ্গিকসমৃদ্ধ, চরিত্রসমূহ প্রতীকাশ্রয়ী—নৌকাবাহক, সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ও কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি। নৌকাবাহক জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত-শ্রান্ত পরাজিত ও মৃত্যু প্রত্যাশী। সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি সত্যানুসন্ধানী ও সুন্দরের প্রতীক, কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ষড়যন্ত্রকারী অসত্যের প্রতীক।

---

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫-৫০৬

১২৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সর্বশেষ নাট্যকর্ম উজানে মৃত্যু। এর ইংরেজি তর্জমা 'ডেথ আপ স্ট্রিম'। এটি একটি একাঙ্কিকা। 'উজানে মৃত্যু' সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' এর ১৩৭০ জ্যৈষ্ঠ (৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৯৬৩) সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, পৃ. ৭২০-৭৩৭। 'উজানে মৃত্যু', স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে আজও প্রকাশিত হয়নি। সৈয়দ আকরম হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী (২য় খণ্ড) একাঙ্কিকাটি অন্তর্ভুক্ত করেন

Dhaka University Institutional Repository

'উজানে মৃত্যু'র নায়ক নৌকাবাহক সর্বরিক্ত, পরাজিত, বেদনাবিদগ্ধ এক সত্তা। সে পৌছুতে চায় এক অনাবিল শান্তির জগতে। সেই নিশ্চিত গন্তব্যস্থলে উপনীত হওয়ার জন্যই তার নৌকা বেয়ে উজানে যাত্রা। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, প্রথাবদ্ধ রীতিনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মানুষ যখন প্রতিকারের পথ খুঁজে পায়না তখন সে হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ, ক্লান্তিময়, বিপর্যস্ত সৈনিক, চলমান জীবন, বহমান সমাজ ব্যবস্থার বিপরীতমুখী স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা শুরু করে। নাটকের সূচনাতেই দেখা যায়, নৌকাবাহক দড়ি দিয়ে নৌকা টানছে এবং ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে। তারপর একটা উড়ন্ত পাখি দেখে তার মনে হচ্ছে—'বালিহাঁস ! ...ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বালিহাঁসই হবে। সূর্যের দিকে উড়ে যাচ্ছে : একমুঠো সোনালী বালু যেন।[১২৭] সে একটানা উদ্দেশ্যহীনভাবে নৌকা বেয়ে চলেছে, সে জানেনা কোথায় তার গন্তব্যস্থল। ঘর-সংসার স্ত্রী-পুত্র, জমিজমা সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত, নিঃস্ব অসহায় মানুষ—

নৌকাবাহক ।। ...আমার দুই ছেলে বসন্তে মরেছে। সে তিন বছর হলো। তখন সবে মাত্র নতুন বছর এসেছে। মাঠে মাঠে ঘূর্ণি হাওয়া।

সাদা পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি ।। তারপর গত বছর তোমার তৃতীয় ছেলেটিও মরলো। আদরের ছেলে, সেও মরলো।

নৌকাবাহক ।। (ক্ষণকালের জন্য কেমন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তারপর তার সঙ্গীর কথার পুনরাবৃত্তি করে) সেও মরলো। বিনা কারণে হাড়মাস হয়ে মরলো ছেলেটা।

সাদা পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি ।। তারপর তোমার বউ। সেও আর নাই। ধীরস্থির দয়ালু বউ, সেও মরলো। কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ কী বউ হারায় নাই?

নৌকাবাহক ।। (হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে) আমার বউ-ছেলেদের কথা বলছো কেন?

সাদা পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি ।। সারারাত অর্থহীনভাবে খালি নৌকা টেনেছো, তুমি জানোনা কেন? শোন। তোমার বুকে অনেক দুঃখ, কিন্তু তাই বলে এমন পাগলামি করবে নাকি?

নৌকাবাহক ।। না, তুমি আমাকে বুঝতে পারছো না। এর সঙ্গে ও সবের কোনো সম্বন্ধ নাই। আমার বুকে অনেক দুঃখ আছে কি নাই তাও ঠিক জানি না। আমি আমার বউ-সন্তানসন্ততি হারিয়েছি বটে, কিন্তু সে সব অন্যকথা। এমনকি অন্য ক্ষতিটাও।

সাদা পোশাক

---

১২৭. সৈয়দ আকরম হোসেন সংগৃহীত সম্পাদিত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (২য় খণ্ড) প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৯৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ৫২১

Dhaka University Institutional Repository

পরিহিত ব্যক্তি॥ জানি, তুমি অর্ধেক জমি হারিয়েছো।

নৌকাবাহক॥ এমনিতে একরত্তি জমি ছিলো। বাকিটাও পানিতে। কিন্তু এর সঙ্গে সে সবের সত্যিই কোন সম্বন্ধ নাই। আমি জমির কথাও ভাবছি না। একলা মানুষ। একটা পেটের ভাবনা নাই। না, না সে সব কথা ভাবছি না। কেবল আমাকে কোথাও যেতেই হবে।[১২৮]

গ্রাম-বাঙলার পটভূমিতে নাটকের কাহিনী বিন্যস্ত হলেও চরিত্রসমূহ চিন্তা চেতনায় পাশ্চাত্য আলোকে সমৃদ্ধ। নৌকাবাহককে ঘিরে আরও দুটি চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি, নৌকাবাহকের বাল্যবন্ধু। সে তার কল্যাণ কামনা করে, সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে নৌকাবাহককে তার নির্ধারিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে চায়। 'আর এভাবে স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমেই সে হবে পুনর্জাত, প্রতিস্থাপন করতে পারবে তার অস্তিত্বময় সত্তাকে।'[১২৯]

কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির অনুভূতি চেতনা ভিন্নমুখী। প্রথাবদ্ধ রীতিনীতি ও 'নিরস্তিত্বময় জীবন-স্রোতে সমর্পিত হয়ে সে অভ্যস্ত।'[১৩০] নৌকাবাহকের এই উজানে যাত্রাকে সে ভয় পায়, তাকে সে যাত্রা থেকে নিরস্ত হতে পরামর্শ দেয়। 'বস্তুত, নরম্যান ফ্রেডরিক সিমসনের[১৩১] অনওয়ে পেনডুলাম নাটকের মতোই উজানে মৃত্যুর কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সমাজ বাস্তবতা, অনিশ্চয়তা ভীতিতাড়িত ও নিমজ্জিত অস্তিত্ব মানুষের সত্তাস্বরূপ, তার সমাজ-অভ্যাসই আভাসিত হয়েছে।[১৩২]

মানুষ মরে গেলেও প্রকৃতির নিয়মে সবই চলতে থাকে, করো জন্য জীবন থেমে থাকে না, নৌকাবাহক সেটা বুঝতে পারে। বাঁশবিদ্ধ লোকটির মৃত্যুতে সাময়িকভাবে তার আত্মীয় স্বজনরা খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিল, পরে একসময় সবই ঠিক হয়ে যায়—

> বুঝতে পেরেছি। সেও ঐ বাঁশবিদ্ধ মানুষের মতো। তিন দিন তিনরাত তার চারধারে দাঁড়িয়ে তার আত্মীয়-স্বজনরা কেঁদেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়েছিল সবকিছুই অতি সাধারণ, সবকিছুই ঠিকঠাক আছে।[১৩৩]

'উজানে মৃত্যু' নাটকের সমাপ্তিতে নৌকাবাহক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে। শেখভের 'ভার্জিন চার্চ' নাটকে বিষণ্ণতার ছাপ থাকলেও তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে—

---

১২৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৪

১২৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

১৩১. দ্রষ্টব্য : Martin Esslin : 1968, The Theatre of the Absurd, London : Penguin Books, p. 300, সংগৃহ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : জীবনদর্শন ও সাহিত্য কর্ম, পৃ. ১৮০

১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৬

Dhaka University Institutional Repository

সোনিয়া : এর কোন প্রতিকার নেই। বাস্তব জীবনই এই এবং এর মধ্যেই আমাদের বাস করতে হবে। দিন ও রাত্রির মিছিল এমনি চলতে থাকবে : দীর্ঘ সন্ধ্যা কাটতে চাইবে না : কপালের লেখা খণ্ডাবে কে? পরের জন্যে আমাদের কাজ করেই যেতে হবে ; এখনও এবং পরে বুড়ো বয়সেও। ...আমাদের জীবন চুমোর মত নিথর মিষ্টি এবং মধুর হবে। আমি একথা বিশ্বাস করি চাচা, বিশ্বাস করি। (সে তার চক্ষু মোছে) চাচা আপনি কাঁদছেন, সুখ কাকে বলে তা আপনি কোনদিন অনুভব করেননি ; কিন্তু অপেক্ষা করুন ভার্জিন চাচা, অপেক্ষা করুন, অবশ্যই আমাদের বিশ্রাম নেওয়ার সময় আসবে।... নিশ্চয়ই আমরা বিশ্রাম পাবো।[১৩৪]

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড হাঁপানি শুরু হয়েছে, তবুও নৌকাবাহক তার উজানে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এক সময় সে তার কাঙ্ক্ষিত গ্রাম বা গন্তব্যস্থল দেখতে পেয়েছে—

নৌকাবাহক॥ আশ্চর্য। আমি এমন পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। (আপন মনে) আমি ভেবেছিলাম, আমি কোথাও যাচ্ছিলাম না, উদ্দেশ্যহীনভাবেই চলছিলাম। কিন্তু ঐ যে! অসীম আকাশ আর উন্মুক্ত প্রসারিত ধরণীর প্রান্তে : একান্ত নিরাপদ, একান্ত নিশ্চিত! না, চোখের ভুল নয়।

কালো পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি॥ ...কিন্তু কী? কথা সাফ করে বলুন।

নৌকাবাহক॥ (পূর্ববৎ কণ্ঠে, তার প্রশ্নে কান না দিয়ে) আর কী শুদ্ধ-পবিত্র, কী শান্তিময়।

কালো পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি॥ আরে, জেগে উঠুন। মনে হচ্ছে আপনার মতিভ্রম ঘটেছে।

নৌকাবাহক॥ ঐ যে, সে গ্রাম। অতি উজ্জ্বল, তবু তারার মতো তাপশূন্য। দেখলেই বুক জুড়িয়ে যায়।

কালো পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি॥ (এবার রেগে) জেগে উঠুন, জেগে উঠুন। আপনি স্বপ্ন দেখছেন।

নৌকাবাহক॥ (নিশ্চিত মানুষের মতো উত্তেজনা দমন করে) না, আমি স্বপ্ন দেখছি না। সেটি আমার চোখের সামনেই যে। ঐ যে, ঐ।

কালো পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি॥ (নেপথ্য হতে, বিস্ময়ে) এই, কী ব্যাপার? নৌকা যে আর চলছে না।

নৌকাবাহক॥ (তার কথাও না শুনে, আপন মনে) আশ্চর্য সমগ্র মনে প্রাণে কেমন একটা বিচিত্র ভয়ের উদয় হয়েছে। মনে হচ্ছে, বিয়ের প্রথম দিনে আমার বউয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে আছি যেন। ভেবেছিলাম, সে ভাব দ্বিতীয়বার আসে না। সব ভুল, সব ভুল।

---

১৩৪. আদ্রে মেরোয়া—'শিল্পীর সাধনা', অনুবাদ—আবু জাফর শামসুদ্দীন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৬৭, পৃ. ২৬৪-২৬৫। সংগ্রহ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

কালো পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি।। আপনি প্রলাপ করছেন। তবে এসব তামাশার প্রয়োজন কী ছিল? তবে ঘরে থাকেন নি কেন এবং আবার বিয়ে করে নতুন বউয়ের দিকে তাকান নি কেন? সে চোখে কখনো তারতম্য ঘটে না। তারপর ছেলেপুলে করতেন, অনেক ছেলেপুলে। কিছু মরে গেলেও একেবারে শূন্য হাত যেন না হয়।

নৌকাবাহক।। (এখনো তাকে না শুনে) আর আমি ভেবেছিলাম আমি শুধু পালিয়ে যাচ্ছি। এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে। জানি না নৌকাটা কেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মানুষ যখন একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তরে যায় তখন কিছুতেই কোনো অর্থ থাকে না। অথবা হয়তো নৌকাটির জন্য মনে হচ্ছিল তবু কোথাও যেন যাচ্ছি। সব জেনেও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া মুশকিল।

কালো পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি।। না, লোকটি সত্যিই পাগল হয়েছে এবার। (হাতে তালি দিয়ে নৌকাবাহককে জাগাবার চেষ্টা করে) জেগে উঠুন বলছি। শুনছেন?

নৌকাবাহক।। (পূর্ববৎ আপন মনে) অবশ্য ঘরেই থাকতে পারতাম। শান্ত-শিষ্ট একটি মেয়েকে আবার বিয়ে করতে পারতাম। তারপর অনেক ছেলেমেয়ে হত। কিন্তু ওসব কিছু করি নি। তাতে কেবল পুনরাবৃত্তি হত, এবং পুনরাবৃত্তির মতো সোজা জিনিস আর কিছু নাই। তাছাড়া জাঁক-জাঁকালো করে পুনরাবৃত্তি করলে তেমন নিদারুণ শোক-দুঃখও ডোবানো যায়। কিন্তু আমি বেরিয়ে পড়ি। কারণ কেমন মনে হয়েছিলো, সেখানে কোথাও যেন ভুল আছে, কোথায় একটা ফাটল আছে।[১৩৫]

আধুনিক যুগ-যন্ত্রণা, অন্তহীন শূন্যতা, ক্লান্তি. নৈরাশ্য ও অন্তহীন প্রতীক্ষা 'উজানে মৃত্যু'র কেন্দ্রীয় বিষয়। কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ও সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার নৌকাবাহকের অবচেতন মনের সত্য-অসত্য, কল্যাণ-অকল্যাণের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত রূপটি চিত্রিত করেছেন। নৌকা টানতে টানতে এক সময় নৌকাবাহকের হাঁপানির আওয়াজ থেমে যায়, নৌকাটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শব্দময় জগৎ থেকে সে পৌঁছে যায় নৈঃশব্দ্যলোকে।

উজানে মৃত্যু'র সংলাপ কার্যকারণহীন, বিষম কাল-চেতনার মধ্য দিয়ে বহমান চরিত্রসমূহের চেতনা প্রবাহের ভাষ্য ; তাদেরই কথামালার সমষ্টি। ফলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো অর্থপূর্ণ বক্তব্যের সন্ধান দেয় না :[১৩৬]

নৌকাবাহক।। বাঁশে বিদ্ধ হয়ে মরেছিল লোকটা। ব্যথা লাগবে বলে কাউকে বাঁশটা বের করতেও দেয় নাই। কী ভয়ানক মৃত্যু ! মরতে তিন দিন তিন রাত লেগেছিল।

---

১৩৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৩
১৩৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : জীবন দর্শন ও সাহিত্যকর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

সাদা পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি॥ সব কল্পনা ! তুমি ভাবছ গ্রামটি চেন ; কারণ তুমি একথা বিশ্বাস করতে চাও যে, তুমি জান কোথায় তুমি যাচ্ছো আর গ্রামটি তোমার পথে একটি সুপরিচিত চিহ্ন।

নৌকাবাহক॥ (তার কথায় কান না দিয়ে) আর তিন রাত তিন দিন আত্মীয়-স্বজনরা তার পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল। অবশেষে বাঁশবিদ্ধ লোকটিও কাঁদতে শুরু করে। হয়তো সে ভেবেছিল, সে নয় অন্য কেউ নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে এবং তারই জন্যে অন্যদের সঙ্গে সেও কাঁদছে।

সাদা পোশাক

পরিহিত ব্যক্তি॥ এসব কথা বানাচ্ছ কেন?

নৌকাবাহক॥ (এখনো তার কথায় কান না দিয়ে) না, শেষে সে আর কষ্ট ভোগ করে নাই। তার নিদারুণ কষ্ট আর ভীষণ মৃত্যু অবশেষে অন্যের কষ্টে এবং মৃত্যুতে পরিণত হয়েছিল।[১৩৭]

সংলাপে সিমেট্রির শৈল্পিক ইফেক্ট এখানে নেই, তার পরিবর্তে পাই এলিয়েনেশন ইফেক্ট, যা অ্যাবসার্ডিটির অন্যতম লক্ষণ।[১৩৮]

'উজানে মৃত্যু' নাটকে নৌকাবাহকের হাঁপানির আওয়াজ কখনও থামেনি, হাপানির শব্দের পুনঃ পুনঃ উপস্থাপনা জগৎ ও জীবনের সমস্ত নৈশব্দ্য ভেদ করে নাটকে এনেছে এক ভিন্ন মাত্রিক ব্যঞ্জনা। 'এ আওয়াজ কেবল নৌকাবাহকের বেদনা প্রকাশক ধ্বনি নয় ; সভ্যতার, ধনবাদী সমাজব্যবস্থায় যূপবিদ্ধ মানুষের অবরুদ্ধ যন্ত্রণারও তা অভিব্যক্তি। বস্তুত, অন্ধকার, নৈঃশব্দ্য, কালো রঙের ব্যবহার ও হাঁপানির শ্রব্যকল্পই উজানে মৃত্যুর পরিবেশকে করেছে ঘণীভূত, বেদনানীল আর নাটকটিকে দান করেছে অ্যাবসার্ড চরিত্র।[১৩৯]

১৬

অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ণিত সামাজিক স্তরবিন্যাসকে নিয়ে রচিত হয়েছে আনিস চৌধুরীর 'এ্যালবাম' নাটক। 'এ্যালবাম' নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে সমাজের দুটি শ্রেণীচিত্র--একটি উচ্চাবিত্ত শ্রেণী, অপরটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

'এ্যালবাম' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আদর্শবান অধ্যাপক ইনাম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ। বেকার যুবক কাইউম ও কলিম,, রুবী-মকবুল এদেরই প্রতিনিধি। পাশাপাশি উপস্থাপিত হয়েছে ধনী ব্যবসায়ী মুস্তাফার

---

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৫
১৩৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩
১৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার। মুস্তাফার কন্যা লিলি ও পুত্র আনোয়ার আধুনিক সমাজ জীবনের প্রতিনিধি। অর্থবিত্তের জৌলুসে মোহগ্রস্ত। আনোয়ার ইতিহাসের দ্বিতীয়পত্রে ফেল করে অধ্যাপক ইনামকে ধরেছে পরীক্ষা পাসের জন্য, নীতিবান অধ্যাপক ইনাম কিছুতেই রাজি হননি। আনোয়ারের চাল চলনে ঔদ্ধত্য ও কথাবার্তায় অভদ্রতার চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্র অধ্যাপকের দারিদ্র্য নিয়ে উপহাস করতেও দ্বিধাবোধ করেনি, আনোয়ার ও ইনামের সংলাপে সেটি লক্ষ্য করা যায়—

আনোয়ার। কয়েকটা নম্বর বাড়িয়ে দিলেই ভাল করতেন।

ইনাম। কেন ভয় আছে নাকি—

আনোয়ার। না, ভয় আর কি। তবে আমার তেমন এসেও যায় না কিছু। আপনাদের মত আধপেটা খেয়ে মাস্টারী করার জন্য তো পড়ছি না, স্যার।

ইনাম। যে রকম তেড়ে কথা বলছ, মনে হয় টাকা পয়সার ফেলাছড়ি।

আনোয়ার। তা একটু আধটু তো আছেই। ইচ্ছে করলে কি আর, অপরাধ নেবেন না স্যার, আপনাদের মত দু' একটা মাস্টার রাখতে পারি...।

....

আনোয়ার। কি ভাবছেন বলুনতো? দেখা যাবে, দু'দিন পর ও শর্মার কাছেই আসতে হবে—

ইনাম। কেন জানতে পারি?

আনেয়ার। হতে পারে—টাকার জন্যই হাত পাততে আসতে হবে।[১৪০]

ধনীপুত্র কিভাবে সামান্য বেতনভোগী অধ্যাপককে অপদস্ত করতে পারে তার চিত্র তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে বিত্তবান মুস্তাফার কন্যা লিলিও সামান্য বেতনভুক্ত চাকুরিজীবী মকবুলের স্ত্রীর কথোপকথনে অর্থের প্রচণ্ড অহংবোধ প্রকাশ ঘটেছে—

রুবী। জর্জেট অনেক দাম।

লিলি। দাম না হাতি ওকে আবার দাম বলে নাকি? এইতো ডলিরা পঞ্চাশ টাকায় সেদিন নিয়ে এল।

রুবী। পঞ্চাশ টাকা—

লিলি। না তা কেন? একদম বিনি পয়সায় দেবে। তোদের এসব বুঝিনা। গরীব, গরীব, শুনি অথচ দেখি বেশ চলছে। কোন জিনিসের অভাব তো মনে হয় না—[১৪১]

---

১৪০. আনিস চৌধুরী, এ্যালবাম, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃ. ৪৪-৪৫

১৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী মুস্তাফার মধ্যেও আভিজাত্য প্রকাশের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়—

মুস্তাফা। দেখাদেখির কি আছে। এত সচরাচরই পরি। হ্যাঁ জানেন সাহেব কত করে গজ? তেত্রিশ টাকা। জানাশোনা ছিল বলে দেড়শোতেই সেলাই হল।[১৪২]

সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়ী মুস্তাফার উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া পুত্র আনোয়ারের গাড়ির তলায় চাপা পড়েছে এনামের প্রাক্তন ছাত্র এবং রুবীর স্বামী মকবুল। এই দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় আনোয়ারের জীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন, সে অনুতপ্ত হয়েছে, রুবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সে ভালো হয়ে গেছে। তার বোন লিলির মধ্যেও মানবতাবোধ জেগেছে, অর্থের জৌলুস আর বিত্তের অহংবোধ খসে পড়েছে। মকবুলের নাবালক পুত্র রতন ও স্ত্রীর দায়িত্বভার নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন ইনাম। এভাবেই নাট্যকাহিনীর যবনিকাপাত ঘটেছে।

বেকার যুবক কলিম ও তার কন্যা মিনুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যের নির্মমতার চরম প্রকাশ ঘটেছে। এদেশের শত শত দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েই দিন দিন অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছে মুস্তাফার মত দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীরা, সুযোগ পেলে এদেরকে তাদের শোষণের হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহার করেছে।

শিক্ষার দৈন্যদশা নাট্যকারকে পীড়া দিয়েছে। তাই কলিমের মুখে শোনা যায়—

কলিম। ...বইয়ের ভেতর টাকা রাখ? বাক্স-পেটরা নেই।

ইনাম। ওটাই নিরাপদ।

কলিম। মানে?

ইনাম। চুরি হওয়ার ভয় কম। খুঁজে পেতে পেতেও সময় লাগে।

কলিম। ও, তাই। তা ভাবছ, বই চুরি হতে পারে না?

ইনাম। আগামী দশ বছরে তো তার কোন সম্ভাবনা দেখছি নে।

কলিম। কেন?

ইনাম। যা শিক্ষার প্রসার, দশ বছরের আগে কি আর জ্ঞানপিপাসু তস্কর বই খুঁজতে শেলফে আসবে।[১৪৩]

'এ্যালবাম' নাটকের কাহিনীতে তিনটি ধারাকে একত্রে গ্রথিত করেছেন নাট্যকার আনিস চৌধুরী। উচ্চবিত্ত মুস্তাফার পরিবার, মধ্যবিত্ত মকবুল-রুবীর সংসার এবং আদর্শবাদী অধ্যাপক ইনাম ও কাইউমের জীবনধারাকে

---

১৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

১৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। মূলত অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের চিত্রই এ্যালবামে উপস্থাপিত হয়েছে। উপস্থাপনার দিক দিয়ে নাটকটিতে নতুনত্ব আছে। কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকার সার্থকতা অর্জন করতে সক্ষম না হলেও সংলাপ রচনার দক্ষতায় একজন কুশলী নাট্যকারেব পরিচয় দিয়েছেন—

> রুবী। এক সংসার থেকে পালিয়ে আর এক সংসার গড়া যায় না। যে দুঃখ, গ্লানির ভয় আপনাকে ঘরছাড়া করেছে সে কি অন্য কোথাও নেই? ভালোবাসা, স্নেহ দিয়ে জীবনের ছোটবড় স্মৃতি দিয়ে যে পরিবেশ গড়ে উঠল, শুধুমাত্র একটি দিনের খেয়ালে তাকে আপনি ছেড়ে চলে যাবেন... আর যদি যেতে হয় কাপুরুষের মত কেন? হয়ত ভীরুতারও ক্ষমা আছে। কিন্তু যে ভীরুতা—দিনের আলোয় চোখ মেলে তাকাতে পারে না অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে চায়, তাকে কেউ ক্ষমা করে না।[১৪৪]

অর্থনৈতিক সমস্যার ফলে সৃষ্ট সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রথা এদেশের সমাজ ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল যা নাট্যকারদের মনোভূমি স্পর্শ করেছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'এ্যালবাম' নাটকে।

১৭

আ. ন. ম. বজলুর রশীদের 'সংযুক্তা'[১৪৫] চার অঙ্ক বিশিষ্ট সামাজিক নাটক। আভিজাত্যবোধ ও খান্দানের সংঘাত, শেষ পর্যন্ত মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ণ নাটকের মৌল বিষয়। 'সংযুক্তা' নাটকের নায়ক আনোয়ার আদর্শবাদী যুবক, তার জন্ম গ্রামের কৃষক পরিবারে, নায়িকা সংযুক্তা ওরফে লিলি নিজেকে পাঠানপুরের রইস মীর বংশের মেয়ে বলে দাবি করে। লিলি আনোয়ার উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। লিলি আভিজাত্য গর্বে গর্বিতা। নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির পক্ষ থেকে চাঁদা চাওয়ার জন্য সে আনোয়ারকে তাচ্ছিল্য করে বলে—

> আমি এই অভিযানের বিরুদ্ধতা করছি। যারা নীচে পড়ে আছে, চাষা-ভুষা যারা, তাদের শিক্ষা দিলে আভিজাত্যের গৌরব ক্ষুণ্ন হবে... ভাল বংশের ছেলে-মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত হয়ে থাকে। সেজন্য আমাদের শিক্ষা সমস্যাকে অনর্থক জটিল করে তুলেছেন।[১৪৬]

আনোয়ার তার উত্তরে বলেছে—

> ...দেশের সকলকে শিক্ষিত করে না তুলতে পারলে, কোন আনন্দময় মুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠবে না। যে ক'জন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, তাদের জীবনকেও তো অজ্ঞ সাধারণ লোক নোংরা ও বিষাক্ত করে তুলেছে।[১৪৭]

---

১৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

১৪৫. নাটকটি 'রক্তের রং নীল' এই নামে ঢাকা বেতার মারফত ১৯৬৬ সালে প্রচারিত হয়েছিল

১৪৬. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, সংযুক্তা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃ. ৫

১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

লিলি আনোয়ারের সঙ্গে কথার প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে তার বংশ মর্যাদার উপর কটাক্ষপাত করেছে—

> চাষী বংশের ছেলের কাছ থেকে আর কতটুকু ভদ্রতা আশা করতে পারি। আমার বংশের মর্যাদা আপনি কি বুঝবেন...ছোটলোক যারা...।[১৪৮]

আনোয়ারও দমে যাওয়ার পাত্র নয়, সেও যথার্থ উত্তর দিয়েছে—

> বুনিয়াদী বংশের দাবী একমাত্র আমিই করতে পারি। আপনি মিথ্যা আভিজাত্যের মোহে আচ্ছন্ন আছেন।[১৪৯]

এভাবেই উভয়েরই মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। শরীফ খান তার একমাত্র কন্যা লিলিকে অতি আদরে মানুষ করেছেন। তার পিতা মীর সাহেব নাতনিকে স্নেহ-মমতায়, হাসি-তামাশায় সর্বদা উৎফুল্ল করে রাখেন। লিলি আনোয়ারকে যতই অপমান করে দূরে সরিয়ে দিতে চায় সে ততই তার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়, তার আদর্শ, চিন্তা-চেতনা তাকে সারাক্ষণ ঘিরে রাখে। আনোয়ার গ্রামের বাড়িতে গেলে সেও তার পিতার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়, উপলক্ষ্য আনোয়ারের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার। আনোয়ারকে সে ভালোবেসে ফেলেছে, কিন্তু মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় 'বংশ গরিমা'। তাই লিলি প্রতিনিয়ত অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। ইতোমধ্যে ছমিরের মুখে 'মীনা' নামের এক মেয়ের আনোয়ারের প্রতি অনুরাগের কথা শুনে সে আরও ক্ষুব্ধ হয়েছে।

লিলির মা বরাবরই আনোয়ারের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। মীনা আনোয়ারের কেউ নয়, একথা সে লিলিকে জানাতে তাদের দরজায় আসতেই তার মাথায় কে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। রক্তাক্ত আনোয়ারকে দেখে লিলি বলে—

> আঘাত লেগেছে আমার।...সারাক্ষণ হলেও আমি যে—উঃ সে কি মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব।[১৫০]

বংশ অহঙ্কার সে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত বিষপানে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে দাদু তাকে জানিয়েছেন—

> উনিশ শ' তেতাল্লিশের মন্বন্তর, এক ভিখারিণী এসে অন্ধকার রাতে আমাদের বাসার গ্যারেজে আশ্রয় নেয়। সেই রাতেই তোমার মায়ের এক মেয়ে হয়, কিন্তু মরা মেয়ে। মোহসেনা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ঠিক তার দু'ঘণ্টা পর সে ভিখারিণী তোমাকে প্রসব করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। আমি তোমাকে তোমার বাবার মত নিয়ে তোমার মায়ের পাশে শুইয়ে দেই।[১৫১]

---

১৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮
১৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
১৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
১৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

মুহূর্তে লিলির 'বংশ গরিমা' শেষ হয়ে গেল। এখন কে তাকে গ্রহণ করবে ভেবে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। আনোয়ার সাগ্রহে এগিয়ে এলো—

> আমি তো মানুষকে মানুষ বলে দেখি বংশ তো উপলক্ষ্য মাত্র।[১৫২]

মীর সাহেব নিশ্চিত হলেন। লিলি আনোয়ারের মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে।

নাটকটিতে লেখকের খান্দান নিরপেক্ষ জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকটি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। এখানে লেখকের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, মার্জিত রুচি ও স্বচ্ছ চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। ভাষা ও সংলাপ আকর্ষণীয়, মধুর ও মননশীল। সমালোচক যথার্থই বলেছেন : সংযুক্তা একটি রসঘন সংলাপ প্রধান নাটক। সংলাপের ভাষা অত্যন্ত আকর্ষণীয় যেটি দর্শক ও শ্রোতাদের মনকে শেষ পরিণতির দিকে আকৃষ্ট করে রাখে। সেদিক থেকে বিচার করলে সংযুক্তা একটি সার্থক নাটক।[১৫৩]

আনোয়ার আদর্শের প্রতীক। লিলি চরিত্রটি সম্ভাবনাময়ী ছিল। একদিকে আনোয়ারের প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ অন্যদিকে বংশ গরিমা—শেষ পর্যন্ত তার জন্ম রহস্য উন্মোচিত হলে সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে—ত্রিমুখী সংঘাতে সে আরও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সার্থক চরিত্রে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু তা হতে পারেনি। তবে সংযুক্তা নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন—

> ...তাঁর পাত্র-পাত্রীর বাচন পদ্ধতি খুবই প্রাণবন্ত। সংযুক্তা নাটকে কবি বজলুর রশীদের নাট্যকার পরিচয়ের সঙ্গে আর একটি পরিচয় সংযুক্ত হয়েছে। সে হচ্ছে : তিনি তার্কিক। প্রকৃতপক্ষে এ নাটকের প্রথমাংশে তার্কিকই প্রবল, শেষ অংশে অবশ্য নাট্যকার তাঁর স্থান খুঁজে পেয়েছেন এবং তর্কের সমাপ্তি ঘটেছে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে। তর্কের সূচনা অংশেও নাটকীয় চমক কম নেই।
>
> ...পূর্ব পাকিস্তানী অনেক নাট্যকারই কৌতুক রস পরিবেশনের জন্য ভৃত্য-চরিত্র ব্যবহার করেন। নাটককে যদি সমকালীন জীবনের প্রধান দর্পণ বলে ধরি তো মানতেই হয় আমাদের জীবনের কৌতুকবোধ এখনো কেবল ভৃত্যের মধ্যেই বিরাজমান।[১৫৪]

সমালোচকের উক্তিটি যথার্থ হয়েছে। আ. ন. ম. বজলুর রশীদের 'সংযুক্তা' সংলাপ প্রধান সার্থক সৃষ্টি।

১৮

সিকানদার আবু জাফরের ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা'[১৫৫] মোট চারটি অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে চারটি এবং সর্বশেষ অঙ্কে দুটি দৃশ্য রয়েছে। নাট্যকার এ নাটকে

---

১৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

১৫৩. গোলাম রহমান, সওগাত, ভাদ্র ১৩৭৫, পৃ. ৭৩

১৫৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'বক্ত', ১ম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৬৬, পৃ. ৪৯৩-৪৯৫, সংগ্রহ, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ৩০২

১৫৫. ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৬৫ সালে প্রথম নাটকটি প্রকাশ করে। প্রথম মঞ্চায়ন : ১৯ এপ্রিল ১৯৬৩, স্থান : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, নির্দেশনা : ইসমাইল মোহাম্মদ, সঙ্গীত : সুধীন দাস।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্ক ও দৃশ্যের দুটি নতুন নামকরণ করেছেন, 'অধ্যায়' ও 'পরিবেশ'। সর্বমোট চরিত্র ২৯টি। এছাড়া রয়েছে নর্তকী, সৈন্য, পরিচারিকা, নাগরিকবৃন্দ। এই নাটকের চরিত্রসমূহ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—ভালো ও মন্দ। ভালো চরিত্রের মধ্যে পড়ে—সিরাজ, মোহনলাল, মীর মর্দান, নারায়ণ সিংহ প্রমুখ ন্যায়পরায়ণ , দেশপ্রেমিক ব্যক্তি। মন্দ চরিত্রের মধ্যে রয়েছে—মীর জাফর, মানিক চাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি সুযোগসন্ধানী আর ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতক বাঙালিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কুচক্রী আর কাপুরুষ ইংরেজ বাহিনী।

দেশপ্রেমিক সিরাজ-উ-দ্দৌলা নির্ভিক, বীর। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ সবসময় প্রতিবাদে উচ্চকিত থেকেছে। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়েও তিনি দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধার মত ঘোষণা করেছেন—

> নবাব। বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহশালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কি রকম আচরণ করা বিধেয় তা-ও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। আপনি, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটকে রাখতে পারি। হ্যাঁ, কোনো দুর্বলতা নয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে মোহনলাল।[১৫৬]

সিরাজ-উ-দ্দৌলা ইংরেজ উপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে গেছেন কিন্তু এদেশের বিশ্বাসঘাতক কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে তিনি পরাজিত হয়েছেন। পলাশী প্রান্তরে সিরাজের এই পরাজয় বাঙালির স্বাধীনতার সূর্যকে অস্তমিত করে দিয়েছিল। প্রায় একটানা দু'শ বছর বাঙালিদের ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে।

সিকানদার আবু জাফর 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকে স্বৈরশাসনের সেই দিনগুলিতে এদেশের নিপীড়িত অবহেলিত মানুষের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত করার প্রয়াসে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পরাজিত নায়ককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

১৯

মুনীর চৌধুরীর 'মানুষ'[১৫৭] একাঙ্কিকার রচনাকাল ৯.৩.১৯৪৭। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে নাটিকাটি রচিত। বিভাগপূর্ব হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মুনীর চৌধুরীর মানসপটে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তারই বাস্তবচিত্র 'মানুষ' নাটিকা। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য, '...সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়কার সে দিনগুলোতে আমরা ছিলাম জাগ্রত প্রহরী। মনে আছে একদিন রাত তখন একটা। শুনলাম এক ভদ্রলোক

---

১৫৬. সিকানদার আবু জাফর, সিরাজ-উ-দ্দৌলা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃ. ৩৩

১৫৭. নাটিকাটির রচনাকাল ১৯৪৭ সাল, পরবর্তীকালে মুনীর চৌধুরী মানুষ, নষ্টছেলে ও কবর—তিনটি একাংকিকাকে একত্রিত করে 'কবর' নাম দিয়ে ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম, শাহীন বুক ক্লাব থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আটকা পড়েছেন বকসীবাজারে। মাত্র দু'জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ছুটলাম তাকে উদ্ধার করতে। দেখলাম গুণ্ডারা অবরোধ করে আছে বাড়ি। তারই মধ্যে মোটরে করে নিয়ে ফিরলাম তাঁকে।[১৫৮]

'মানুষ' একাঙ্কিকায় একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের বড় ছেলে মোর্শেদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়েছে, অন্যদিকে ঘরে অসুস্থ ছোট খোকা। খোকার মুমূর্ষু অবস্থায় মা খুব বিচলিত, ঠিক তখনই একজন হিন্দু ডাক্তার প্রাণভয়ে মুসলিম পরিবারের আশ্রয় প্রার্থী হয়। ডাক্তারের চিকিৎসায় অসুস্থ খোকার জীবন রক্ষা হয়। এদিকে পাড়ার মুসলমান তরুণেরা ডাক্তারকে খুঁজতে এলে খান্দানী পরিবারের পর্দানশীন মা মশারীর নীচে সেই আগন্তুক ডাক্তারকে আশ্রয় দিয়ে তার জীবন রক্ষা করেন। নাট্যকারের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান কোন আলাদা সৃষ্টি নয়। ধর্ম সম্প্রদায়, সবকিছুর ঊর্ধ্বে। ডাক্তারের আত্ম-পরিচয় দানের মধ্য দিয়েই নাটকের মূল সুর ধরা পড়েছে—

> ফরিদ। আম্মা। এ কে?
>
> লোকটা। আবার বলছ ভাই? আমি মানুষ।[১৫৯]

পঞ্চাশের দশকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৬ আগস্ট থেকে এ দাঙ্গা আরম্ভ হয়। কলকাতা শহরে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান এ দাঙ্গায় নিহত হয়। 'এই দাঙ্গায় সরকারি হিসাব মতে ৫০০০ নিহত, ১৫০০০ আহত, ১০০০০০ গৃহহীন ও বহু কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। অবিলম্বে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারি করে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করে দাঙ্গা রোধ করা হয়। কলকাতার দাঙ্গার পর বিহার, নোয়াখালী, মিরাট, দিল্লী ও পাঞ্জাবে দাঙ্গার তাণ্ডব চলে এবং হাজারে হাজারে লোক নিহত হয়।'[১৬০] সমসাময়িক উত্তেজনাময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনীর চৌধুরী 'মানুষ' নাটিকার প্রেক্ষাপট সাজিয়েছেন।

'মানুষ' একাঙ্কিকার স্বল্প পরিসরে নাট্যকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সেই ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন—

> আব্বা?...ওরা আমার ছেলেকে কেটে, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, শরীর থেকে গলা কেটে মাথাটা আলাদা করে ফেলেছে। মোর্শেদের কালো কোঁকড়া চুল চাক বাঁধা রক্তের দলার সঙ্গে লেপটে ওর মরা চোখ ঢেকে রেখেছে।[১৬১]

'মানুষ'— এ দাঙ্গায় নিহত পুত্রের শোকে পিতার উম্মাদনা, অসুস্থ পুত্রের জন্য মাতার উদ্বেগ, ফরিদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ডাক্তারের সেবার ভূমিকা দর্শকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। অসাম্প্রদায়িক জীবনাদর্শে লালিত মুনীর চৌধুরীর 'মানুষ' সফল সৃষ্টি।

---

১৫৮. আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, অন্তরঙ্গ আলোকে, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮৭, পৃ. ১০৩

১৫৯. মুনীর চৌধুরী, কবর, মানুষ, পৃ. ২১

১৬০. নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত, 'মুক্তি সংগ্রাম' (১ম পর্ব) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, ১৯৭২, পৃ. ৩৭৯। সংগ্রহ, মুনীর চৌধুরীর নাটক, পূর্বোক্ত

১৬১. পূর্বোক্ত, মানুষ, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

২০

'দন্ডকারণ্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তিনটি নাটক--দন্ড, 'দন্ডধর' ও দন্ডকারণ্য'। নাট্য গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসর্গ করেছেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন—

> যদিও 'কবর' ও 'দন্ডকারণ্য' আমার নাটকীয় প্রয়াসের দুই বিপরীত প্রকৃতির প্রয়াস, উভয়ের মধ্যে আমার স্বভাব ও দৃষ্টির ঐক্যও বিদ্যমান। তবে, 'কবর' ক্ষোভপূর্ণ, অভিযোগশ্রয়ী এবং রক্তাক্ত। 'দন্ডকারণ্য কৌতুকাবহ, অন্তরাশ্রয়ী এবং অদ্ভুত রসাত্মক। 'কবরে'র রচনাকাল উনিশ শ' সাতচল্লিশের সংলগ্ন পাঁচ সাত বছর। দন্ডকারণ্যের উনিশ শ' ষাট-পঁষট্টি। মূল্যায়নের প্রয়োজনে উভয় গ্রন্থ একত্রে গ্রহণ করলেই আমার প্রতি সদ্বিচার করা হবে।[১৬২]

দন্ডকারণ্য গ্রন্থের প্রথম নাটিকা 'দন্ড'। এতে চরিত্র সংখ্যা তিনজন। স্বামী, স্ত্রী ও চোর (নেপথ্যে)। আধুনিক নরনারীর দাম্পত্য-কলহ ও প্রেমে সংশয় নিয়ে নাটকটি রচিত। স্বামী একজন উকিল। ইদানীং, তিনি বিধবা সুরাইয়া খানমের মামলার চিন্তায় মগ্ন। তার পোর্টফোলিও ব্যাগে সংরক্ষিত মহিলা মক্কেলের ছবি দেখে স্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগে। স্ত্রীও আবার গলায় মাছের কাঁটা বেধার নাম করে দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর এক ডাক্তার বন্ধুকে দিয়ে চিকিৎসা করান। ডাক্তারের ফেলে যাওয়া ডায়েরিটি তিনি মহামূল্যবান ধন মনে করে আগলে রেখেছেন। ফটো নিয়ে আর ডাক্তারের ডায়েরি নিয়ে চলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই—

> স্ত্রী। ... যখন তোমার পয়সা কম ছিল, তখন হয়তো সত্যি সত্যি কিছু ক্ষমতা হাতে ছিল। এখন কত বাদশা-বেগম তোমার ওকালতির বশ। ক্ষমতা সব তোমার হাতে বলেই না এত সহজে, ন্যায্য পাওনা টাকার এতবড় একটা বাণ্ডিল কোথাকার কোন দুঃখিনীর করকমলে গুঁজে দিয়ে এসেও খোশ মেজাজে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।[১৬৩]
>
> ....
>
> স্বামী। এতগুলো টাকা তোমার কাছে মূল্যবান মনে হোলো না। আলমারীতে তুলে রাখা প্রয়োজন মনে করলে না অথচ কার না কার ফেলে যাওয়া পড়ে থাকা ডায়েরী মহামূল্য গুপ্তধনের মতো সন্তর্পণে আগলে বেড়াচ্ছ।[১৬৪]

স্বামী-স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাতে একটি চোর জানালার ফাঁক দিয়ে বংশদন্ডের সাহায্যে অপহরণ করে মক্কেলের ছবি সমেত স্বামীর পোর্ট ফোলিও ব্যাগটি এবং সেই শার্টটিও, যার পকেটে স্ত্রী রেখেছিল ডাক্তারের ডায়েরিটি। এভাবে দন্ডধারী চোরের আবির্ভাবে স্বামী, স্ত্রী দু'জনের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসে।

---

১৬২. 'দন্ডকারণ্য', প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, ভূমিকা অংশ, দ্রষ্টব্য
১৬৩. আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৬
১৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

২১

'দন্ডধর' নাটকের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয় ঘটিত অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। এই একাঙ্কিকার একজন অধ্যাপক ছাড়া সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র ও অধ্যাপনা জীবনে মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বহু নাটক মঞ্চায়ন করেছেন। নিজের লেখা নাটক পাঠ, মহড়া ও মঞ্চায়ন কালে কলাকুশলীদের পারস্পরিক বিরোধ হৃদ্যতা ও ভালোবাসার যে দৃষ্টান্ত লক্ষ করেছেন, তারই নাট্যিকরূপ দন্ডধর।[১৬৫]

একটি নাটকের মহড়া দিতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শেষ পর্যন্ত বাস্তব জীবন নাটকে অনুপ্রবেশ করে। এই নাটকে দুই জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—আমিন-রোকেয়া, জাহানারা-সেলিম। নাটকটির সূচনা হয় আমিন-জাহানারার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে। এরা এক সময় পরস্পরকে ভালোবাসতো, কিন্তু ইদানীং আমিন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ুয়া মেয়ে রোকেয়ার প্রতি দুর্বল। আমিন চায় জাহানারা বড়লোক বাবা-মার একমাত্র ছেলে সেলিমকে ভালোবাসুক—

আমিন। আমি জানি তুমি সেলিমকে অপছন্দ করো না। তোমাকে দর্শন করা মাত্র ওর চোখে যে আলো নেচে ওঠে তা তুমি লক্ষ্য করতে ভুলে যাও না। তুমি যখন ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াও তখন ওঁর নিঃশ্বাসের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। অনুভব করে তুমি পুলকিত হও। ওর সুকুমার চিত্ত থেকে ঝরে পড়া স্তুতি—বন্দনার প্রতি কণা তুমি গোপনে গোপনে কৃপণের মত সঞ্চয় করে রাখো। আমার চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করো না। ওকে গ্রহণ করো।[১৬৬]

দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় সূত্রপাত হয় আমিন ও রোকেয়ার মধ্যে। আমিন রোকেয়াকে ভালোবাসে, কিন্তু রোকেয়ার পক্ষে বাবাকে অকপটে নিজের পছন্দের কথা বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া রোকেয়া জানতো, আমিনের প্রতি জাহানারা দুর্বল।

রোকেয়া। ...আমি যা চাই তা আমি অন্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবো কেন? আমি এমনি পেতে চাই।

আমিন। কে বলেছে যে তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছ। আমাকে কেউ অধিকার করে নেই। আমি কারো সঙ্গে গ্রথিত নই। আমি ছিন্নমূল, আমি উদ্বাস্তু।[১৬৭]

---

১৬৫. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০। ষাটের দশকে মুনীর চৌধুরীর পরিচালনায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছে দণ্ড, দণ্ডধর, কৃষ্ণকুমারী, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি নাটক। —ঢাকা মহানগরী নাট্যচর্চা, ১৯৯২, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ৭৮

১৬৬. মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

১৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

এ দ্বন্দ্বের নিরসন না হয়েই শুরু হয় নাটকের মহড়া। মহড়া চলাকালে চোরের আগমনে অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চের পিছন থেকে জাহানারার কণ্ঠনিঃসৃত তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত আর্তনাদে ঘটনার আকস্মিকতা সৃষ্টি হয়, যা নাটকে প্রাণসঞ্চার করে। এরপর থেকে নাটক পরিণতির দিকে এগুতে থাকে। জাহানারার হৃদয়ে সেলিমের স্থান পাওয়ার পথ দন্ডধারী চোরটি প্রশস্ত করে দেয়। এদের মিলনের মধ্য দিয়ে রোকেয়া-আমিনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং এক মধুর মিলনান্তক সমাপ্তিতে নাটিকাটির যবনিকাপাত হয়।

দন্ড ও দন্ডধর দুটি নাটকেই চুরির প্রসঙ্গ আছে। চোর বাঁশের দন্ডের সাহায্যে জানালা দিয়ে ঘরের জিনিসপত্র টেনে নিয়ে যায়। এ চৌর্য-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ কৌশল নাট্যকারের নিছক কল্পনা প্রসূত নয়, বাস্তব ঘটনা নির্ভরও।[১৬৮] এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন—

> দন্ড ও দন্ডধর নাটক দুটি যখন মুনীর চৌধুরী রচনা করেন তখন ঢাকা শহরে এই রকম দন্ডের সাহায্যে বিভিন্ন পাড়ায় বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ ছিঁচকে চুরির ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।[১৬৯]

পরোক্ষভাবে দন্ড বা দন্ডধরই এই মিলন বা প্রশান্তির সহায়ক উপকরণ শক্তি।

২২

'দন্ডকারণ্য' নাট্যগ্রন্থের তিনটি একাঙ্কিকার সর্বশেষ একাঙ্কিকা 'দন্ডকারণ্য'। 'দন্ডকারণ্য' নাটিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক লিখেছেন—

> দন্ডকারণ্য নাটকের চরিত্র ও বিষয় আধুনিক, সমকালীন নাগরিক কিন্তু এ নাটকে তিনি 'Myth' বা পুরাণের কাহিনী এবং চরিত্র ব্যবহার করেছেন। নাটকের নাম থেকেও তা বোঝা যায়। এখানে নাট্যকারের উদ্দেশ্য পুরাণের কাহিনী বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণ নয় বরং বর্তমানের কোন ঘটনা বা চরিত্রকে পুরাণের কোন প্রতিষ্ঠিত কাহিনী বা চরিত্রের আশ্রয়ে স্পষ্ট করে তোলা।[১৭০]

পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিতে নাট্যকার বর্তমান সমাজের আধুনিক নর-নারীর চিত্তবৃত্তির বহুমুখী বিকাশকে চিত্রিত করেছেন। কায়সর, মনোয়ার ও লাইলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ওয়াফা ছাত্রী হলের হাউস টিউটর। এই একাঙ্কিকাতে দেখা যায়, মনোয়ার-লাইলী পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে, লাইলীর প্রতি কায়সরের অনুরাগ, 'ওয়াফা' মনোয়ারের প্রতি অনুরক্ত। কাহিনীতে—লাইলী হচ্ছে সীতা, কায়সররূপী লক্ষ্মণ, মনোয়ার রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং 'ওয়াফা' শূর্পনখার প্রতীক। ওয়াফার মত একজন শিক্ষিতা,

---

১৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

১৬৯. কবীর চৌধুরী, প্রসঙ্গ নাটক, ১৯৮১, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ২৩৮

১৭০. অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, আজাদী উত্তর নাট্যসাহিত্যে নাগরিক চেতনাবোধ, এলান, ঈদ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৬৮, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

সুপ্রতিষ্ঠিতা নারীর প্রণয় নিবেদনকে নাট্যকার শূর্পনখার সাথে তুলনা করেছেন। কাহিনীর পরিণতির দৃশ্যটিও একইভাবে সাজিয়েছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে কায়সর লায়লীকে বলেছে—

> আমি কায়সর নই। আমি অন্য কেউ। আমি ওয়ারীর সেই ছাত্র যে চলন্ত রিকসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কোন এক পরীক্ষার্থিনীর নাসিকা কর্তনের জন্য। মোমেনশাহীর সেই যুবক যে সৎমার প্রথম পতির কন্যার জন্য দিওয়ানা হয়ে মধ্যরাতে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে প্রিয়তমার নাক ঘচাৎ করে কেটে উধাও। আমি দেবদাস পার্বতীকে প্রহার করি। আমি প্রমথেশ যমুনাকে আঘাত করি। আমি রাক্ষস। আমি দন্ডকারণ্যের বাসিন্দা। আমি রামানুজ... ।[১৭১]

কায়সার হচ্ছে সমাজের বিবেক। যারা স্বামী,- প্রেমিক রেখে জৈবিক বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অন্য পুরুষের সাহচর্য কামনা করে, নিজের রূপে দগ্ধ করে, তাদের অসৎ পথ থেকে বিরত করার এটিই উৎকৃষ্ট পথ, সৌন্দর্যের বিনষ্টি। এতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে সমাজ বন্ধনও অটুট থাকবে। ড. নীলিমা ইব্রাহিম নাটিকাকে আদি রসাত্মক বলে অভিহিত করেছেন।[১৭২] কথাটা পুরোপুটি গ্রহণযোগ্য না হলেও আংশিকভাবে সত্য। যেখানে রূপের বর্ণনা রয়েছে সেখানেই আদি রসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। একাঙ্কিকাটির মধ্যে যে তত্ত্বকথা নিহীত আছে তা হলো—'Man Change but substance remains' অর্থাৎ মানুষের পরিবর্তন হলেও আদিম অভিব্যক্তি অপরিবর্তিত থাকে। স্থান-কাল-পাত্র, শিক্ষা ইত্যাদির পরিপূর্ণ সমাবেশেও এই পরিবর্তন সম্ভব নয়।

দন্ডকারণ্য নাটিকায় নাট্যকার পুরোনো ঐতিহ্যের নবায়ণ করেছেন। নাটকের আঙ্গিকগত নিরীক্ষা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বক্তব্য-বিষয় সরল ও অনাড়ম্বর। সংলাপের মাধুর্য নাটকটিকে অভিনবত্ব দান করেছে। দন্ডকারণ্য সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত স্মরণযোগ্য—

> দন্ডকারণ্য উপস্থাপন ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক, সুতরাং অভিনব। এ পর্যায়ে নাট্যকারের সংলাপ আরো তীক্ষ্ণ, কৌতুকাবহ ও পরিমিত হয়েছে। 'দন্ডকারণ্য' তার সংযমী সংলাপ-রচনা ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করছে।[১৭৩]

মূলত এ নাটকে পুরাতনের মধ্য দিয়েই নতুনের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

'দন্ডকারণ্য' নাটক প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ মন্তব্য করেছেন—

---

১৭১. মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

১৭২. নীলিমা ইব্রাহিম, বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, পৃ. ৪৫৮

১৭৩. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৫২

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য নাটকে মুনীর চৌধুরী এক সেট চরিত্র দিয়েই পুরাণ ও সমকালের মধ্যে মানবিক প্রবৃত্তির সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। মানবিক প্রবৃত্তির আদিম মৌলিকতা পুরাণের পাতা ছিঁড়ে সমকালেও সমান মাত্রায় থাকে সঞ্চরণশীল। এই সূত্রেই এ নাটকে পুরাণ আর সমকাল মিলে-মিশে হয়ে গেছে একাকার।[১৭৪]

'দন্ডকারণ্য' নাটকে মুনীর চৌধুরী অ্যাবসার্ড আবহে সংলাপ নির্মাণ করেছেন, 'যে সংলাপ আপাত-বিচ্ছিন্ন, কিন্তু গভীরতর সত্যে সম্পর্কিত'—[১৭৫]

সাধু। অধৈর্য হয়ো না। অরণ্য কাউকে নিরাশ করে না।

রাম। অসহ্য এই অরণ্যের স্তব্ধতা, উদ্ভিদের এই অপ্রতিরোধ্য বিস্তার। শুধু ফুল আর ফল, বৃক্ষ আর মৃত্তিকা, বনভূমি আর লতাগুল্ম। গাছের মাথায় পাখি, মধ্যে বানর, পাদমূলে তপস্বী—ক্ষমা করবেন—নাগরিক রসনার পাপপূর্ণ তাড়নায় কী অসঙ্গত কথা বলে ফেললাম।

সাধু। আমি তোমার বাক্যে কর্ণপাত করিনি। তোমার অন্তরের যন্ত্রণাকে লক্ষ্য করেছিলাম। তুমি নিশ্চিত হও বৎস। আর এও জেনে রাখ, নগরে আর অরণ্যে ভেদ অতি সূক্ষ্ম। তোমার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রবে না। অরণ্যও কম বিপদসংকুল নয়।[১৭৬]

আপাত বিচ্ছিন্ন সংলাপরীতি ও বিষয়বস্তু নির্মাণ কলা এই নাটকে নিয়ে এসেছে 'সীমিত অর্থে, অ্যাবসার্ড নাটকের আবহ।'[১৭৭]

২৩

ষাটের দশকের অবরুদ্ধ সময় কালের প্রেক্ষাপটে সিকান্দার আবু জাফর রূপকের আশ্রয় নিয়ে লিখলেন 'শকুন্ত উপাখ্যান'।[১৭৮] যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে লেখা তাঁর রূপক নাটক শকুন্ত উপাখ্যানে প্রকাশিত হয়েছে যুদ্ধ বিরোধী মানসিকতা। পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকবর্গের শাসন ও শোষণের নেপথ্যে যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ক্রিয়াশীল ছিল তা দীর্ঘদিন ধরে এদেশের জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। বৈরী পরিবেশে অবস্থান করে এদেশের লেখকবৃন্দ সমকালীন সমাজ, দেশকালকে প্রতীকের সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন। সেইসঙ্গে আঙ্গিক কলাকৌশলগত নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও এনেছেন বৈচিত্র্য।

---

১৭৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫), (প্রবন্ধ) রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক' প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ. ১৯৬

১৭৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ২০৩

১৭৬. দন্ডকারণ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫

১৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

১৭৮. শকুন্ত উপাখ্যান, নাটকটি মাসিক সমকাল, ৫ম বর্ষ, ৩-৫ম সংখ্যা, ঢাকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮, পৃ. ২২৪-২৪৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৯৭ সালে আবদুল মান্নান সৈয়দ বাংলা একাডেমী থেকে সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী ২ টি খণ্ডে প্রকাশিত করেন। ২য় খণ্ডে 'শকুন্ত উপাখ্যান' নাটকটি সংযোজন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

'শকুন্ত উপাখ্যান' নাটকে কোন অঙ্ক বিভাগ নেই, সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত নাটকের চরিত্রসমূহ হলো— মণিপুচ্ছ, দিকচক্ষু, শুক, হংসগর্ব, জ্ঞানাধিপ, সুচক্ষু, তিমিরপক্ষ, হংসমহিষী এবং বায়স-মহিষী। এছাড়া রয়েছে প্রহরী, দৌবারিক, গুপ্তচর, সৈনিক ও জনতা।

'শকুন্ত উপাখ্যান' নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। নাটকের প্রারম্ভে নেপথ্য থেকে নাট্যকার ঘোষণা করেছেন রূপকার্থ সন্ধানের সূত্র—

> স্মরণাতীতকালে কাহিনী। ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে, জীবজন্তু, পশু-পাখি তখন কথা বলতে পারত। চিন্তায়, জ্ঞানে, বিচার বুদ্ধিতে তারা ছিল আজকের মানুষের মতই উন্নত। তাদের নানা দেশ ছিল, শাসক ছিল, শাসন পদ্ধতি ছিল, মন্ত্রী ছিল, উপদেষ্টা ছিল, আর ছিল বীরত্ব এবং দেশপ্রেম। সে যুগেও কোন না কোন কারণে যে কোন দুই দেশের ভিতর লড়াই বেঁধে যেত। আমাদের এ নাটক ময়ূর ও রাজহংসের অধিকারভুক্ত দু'টি স্বতন্ত্র দেশের মর্মান্তিক যুদ্ধ কাহিনী।[১৭৯]

'শকুন্ত উপাখ্যান' নাটকে নাট্যকার সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে পক্ষীকুলের রূপকে তুলে ধরেছেন মানুষের চেতনার গভীরস্থ ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এই দ্বন্দ্বে মন্দ (evil) পরাজিত হয়েছে, যুদ্ধ আর ক্ষমতার দম্ভের পরিবর্তে ভালোবাসা আর মৈত্রী বন্ধন বিজয়ী হয়েছে।

এই নাটকের পাত্র-পাত্রী কেউ মানব-মানবী নয়, তারা বিভিন্ন জাতের পাখি। স্বপ্নগ্রামের সম্রাট মণিপুচ্ছ ক্ষমতার দম্ভে আক্রমণ করেছে হংস-গর্বের রাজ্য কল্পগ্রাম। ভয়াবহ যুদ্ধের পর নতুন যুদ্ধের আশঙ্কায় শঙ্কিত মণিপুচ্ছ প্রধানমন্ত্রী দিকচক্ষুর মাধ্যমে শান্তি সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। বস্তুত শান্তির মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারই নাটকটির মূল উদ্দেশ্য। দিকচক্ষু ও হংসগর্বের সংলাপে এ উক্তির যথার্থ প্রমাণ মেলে—

> হংসগর্ব : আপনার মতে কোন প্রকার সন্ধি সর্বশ্রেষ্ঠ?
>
> দিকচক্ষু : জাঁহাপনার আপত্তি না থাকলে স্বপ্নগ্রামের পক্ষ থেকে কল্পগ্রামের সঙ্গে আমি 'সুবর্ণ-সন্ধি'র প্রস্তাব দেবো।
>
> (জনতার গুঞ্জন : সুবর্ণ সন্ধি—সুবর্ণ সন্ধি)
>
> হংসগর্ব : সুবর্ণ-সন্ধি।
>
> দিকচক্ষু : হ্যাঁ, সম্রাট।
>
> হংসগর্ব : এ সন্ধির শর্ত?
>
> দিকচক্ষু : সত্যের প্রতিজ্ঞায় এর শুরু, সখ্যতার বন্ধনে এর শেষ। একে বলব 'মৈত্রীর সন্ধি।'...
>
> হংসগর্ব : ...ধন্য ধন্য মহামন্ত্রী। স্বপ্নগ্রামের আলিঙ্গন গ্রহণ করুন।...মহত্ত্বের অধিকার, হৃদয়ের অধিকার, জীবনের অধিকার যে সন্ধির শর্ত তাই স্বাক্ষরিত হোক, শুধু আমাদের ভেতরই নয়—দেশে দেশে যুগে যুগে।[১৮০]

---

১৭৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী (২য় খণ্ড), শকুন্ত উপাখ্যান, পৃ. ১৪৫

১৮০. শকুন্ত উপাখ্যান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

কিছু সংখ্যক উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষমতার লোভ নিরীহ মানুষের জীবনে চরম দুর্ভোগ বয়ে আনে। এইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতালোভীদের নাট্যকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন—

দিকচক্ষু : সম্রাট জয়ী হোন, দীর্ঘজীবী হোন, রাজকোষ আবার পূর্ণ হয়ে উঠবে। যুদ্ধ জয় হলে কল্পগ্রামের ঐশ্বর্যেই স্বপ্নগ্রামের রাজকোষ মুহূর্তে ভরে উঠবে। কিন্তু যারা যুদ্ধ করবে, যাদের আত্মদানে যুদ্ধ জয় হবে, প্রলোভনের হাতছানিতে মুগ্ধ না হলে তারা উৎসাহ পাবে কোথায়? ঐশ্বর্যের আকর্ষণ প্রাণের চেয়ে বড় করে না তুললে তারা প্রাণ দেবে কেন?[১৮১]

'শকুন্ত উপাখ্যান' এর নাট্যকাহিনী রূপক হলেও এর নামকরণে আছে প্রতীকধর্ম। একদিকে এর নামকরণ পক্ষীকুলের উপাখ্যান বলে 'শকুন্ত উপাখ্যান'—এটা ভেবে নেওয়া যায়। অন্যদিকে ধূর্ত, হিংস্র, অন্যের শাবক ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া স্বভাবসম্পন্ন শকুন পাখির প্রতীকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধপ্রিয়তা, ধাতব অস্ত্রধারীর নির্বুদ্ধিতা এবং দিকচক্ষু-জ্ঞানাধিপরূপ মন্ত্রণাদাতার খেলনা-পুতুল রাজশক্তির অদূরদর্শিতা হয়তো নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু এক সময় এই শকুনশক্তি পরাভব মানবে; যুদ্ধের পরিবর্তে মানুষে মানুষে গড়ে উঠবে মিলন সেতু—সেই সূত্রেই নাটকের নাম হয়তো শকুন্ত উপাখ্যান।[১৮২]

'শকুন্ত উপাখ্যান' নাটকের রূপকীয় আবরণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার যুদ্ধ নয়, শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ জীবন কামনা করেছেন। বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে 'শকুন্ত উপাখ্যান' একটি ব্যতিক্রমধর্মী সৃজন প্রয়াস।

২৪

সাঈদ আহমদ-এর 'কালবেলা' বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস। পূর্ব বাঙলার দক্ষিণাঞ্চলে সংঘটিত ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনাকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করে লেখক ঘূর্ণিঝড়ের নিবিড় অভিজ্ঞতা দ্বারা এমন কার্যকরভাবে গড়ে তোলেন এক বিমূর্ত জগত, যেখানে ঘূর্ণিঝড় নিজেই হয়ে ওঠে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র।[১৮৩] নাটক সম্পর্কে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন—

> আমার 'কালবেলা' নাটকটি ১৯৬১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিকায় রচিত। এটি লিখতে এক বছর সময় লেগেছিল আমার। দেড়দশক আগে 'কালবেলা' ইংরেজি ভাষায় লিখি। সেকালে কবিবন্ধু শামসুর রাহমান নাটকটির একটি অনূদিত রূপ প্রকাশের জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। তার উদ্যোগে এবং আমার সুহৃদ বজলুল করিমের অনেক প্রহরের শ্রমের ফল 'দ্য থিং' ভাষান্তরিত হয় কালবেলায়।[১৮৪]

---

১৮১. শকুন্ত উপাখ্যান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

১৮২. বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলাদেশের সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১। প্রবন্ধ : বাংলাদেশের পাঁচটি নাটক : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী, পৃ. ৮১

১৮৩. হেদায়েত হোসাইন মোর্শেদ, 'ড্রামা সার্কেল', পৃ. ৩১১-৩১৪। সংগ্রহ, হাজার বছর বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, পৃ. ১৭৩

১৮৪. 'কালবেলা' প্রথম ইংরেজি ভাষায় 'দ্য থিং' নামে লেখা হয়। পরে বজলুল করিম কর্তৃক ভাষান্তরিত হয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত মাসিক 'পরিক্রম'-এ ২য় বর্ষ : একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৬৩ পৃ. ৮৯৫-৯০৯ এবং

Dhaka University Institutional Repository

'কালবেলা' নাটকে দুটি 'অঙ্কবিভাগ' করা হয়েছে, প্রথম অঙ্কে একটি দৃশ্য কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে কোন দৃশ্য সংযোজিত হয়নি। নাটকের চরিত্রাবলী হলো--মোড়ল, আহাম্মদ, মুনীর, ঢুলী, উনেন, উপেং, কুমারী মেয়ে, চারজন পার্ষদ, শিষদার বংশীধারী এবং দাগী। নাটকের কাহিনীর কোন আদি, মধ্য, অন্ত নেই। আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহ পটভূমিতে বিমূর্ত জগতের এক অদ্ভুত মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দ্বীপবাসী মানুষের ভীতি-বিহ্বলতা, উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা ও চিত্তবৈকল্য বর্ণিত হয়েছে 'কালবেলা' নাটকের পরিস্থিতি পরম্পরায়। 'কালবেলা' সম্পর্কে বজলুল করিমের বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়—

> ১৯৬১ সনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম অঞ্চলে গোর্কির ভয়াবহ পরিস্থিতির পটভূমিকায় একটি ছোট্ট দ্বীপের অধিবাসী একদল অতীত সমৃদ্ধ মানুষের চেতনার বিহ্বল প্রকাশ ঘটানো হয়েছে এই নাটকটিতে। তাদের অতীতকে তারা উদ্ধার করে আনতে চায় বর্তমানের বিন্দুতে, অভিজ্ঞতার, চেতনার আলোকে ভবিষ্যতের দিকে তারা মেলতে চায় দৃষ্টি। ঘূর্ণিবার্ত্যা, তার আগমন সংকেত জানায়। তারা অপেক্ষা করে যায়, সময় কাটিয়ে যায়। গোর্কির প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডবে এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মানুষ, দ্বীপ, সবকিছু। তবু চেতনার যে রেশ তারা রেখে যায়, তার মাঝে ভেসে বেড়ায় আদি বিস্ময়মাখা নানা টুকরো গীতিময় ছবি, আপাতবিচ্ছিন্ন কথার উনাজালে জীবনের সুন্দর গৌরবময় প্রতিচ্ছায়া, ব্যাপ্ত করে বোধের দিগন্তকে। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অপেক্ষায় ভ্রূক্ষেপহীনভাবে জীবনকালের কথায় আর কেলিতে সময় কাটিয়ে দিয়ে তারা মরণেরই মৃত্যু ঘটায়। অপেক্ষা আর সময় কাটানোই সেখানে প্রধান, মরণ কিংবা মরণাতীতের বিশাল প্রকট ছায়ার নীচে জীবনের তুচ্ছতা নেই; তার জ্বালাও সেখানে ক্ষীণ।[১৮৫]

এ নাটকে কোন নাট্যিক গতি নেই, চরিত্রসমূহের বিকাশ নেই, আছে শুধু ভবিষ্যত ঘটনাবলীর জন্য অন্তহীন প্রতীক্ষা। এ নাটকে চিন্তার কোন ঐক্যসূত্র নেই, ভাবনা এগিয়ে চলেছে পারম্পর্যহীনভাবে চেতনাপ্রবাহ রীতিতে, নাট্যকার তার ভাবনাকে প্রকাশের জন্য খণ্ড খণ্ড চিত্র ও চূর্ণ-বিচূর্ণ চিত্রকল্পের সাহায্য নিয়েছেন।

চট্টগ্রাম এলাকার একটি ছোট্ট দ্বীপ আলেকজাণ্ডারের মানুষগুলোর জীবনে প্রলয়ঙ্কারী জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা নেমে আসবে জেনেও তাদের আপাত সঙ্গতিহীন সংলাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উপেক্ষা করার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে—

ঢুলী। এই দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে অদ্য রাত্রি সাতটার মধ্যে আমরা ভীষণ এক ঘূর্ণিবার্ত্যার আশঙ্কা করিতেছি। ঝিরিঝিরি নরম বাতাস বহিয়া আনিবে আগুনের হল্কা। সাগরের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইবে

৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ৪৩-৫৮-তে প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুলাই ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক, 'কালবেলা মাইলপোস্ট তৃষ্ণায়' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। 'ড্রামা সার্কেল' ১৯৬২ সালের জুলাই-আগস্ট-এ একাদিক্রমে পাঁচ দিনব্যাপী তোপখানা রোডস্থ ইউসিস মিলনায়তনে প্রথম 'কালবেলা' মঞ্চরূপ দেয়। সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক, দ্রষ্টব্য, কালবেলা, শিরোনামহীন ভূমিকা

১৮৫. সাইদ আহমদের তিনটি নাটক, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য, কালবেলা, শিরোনামহীন ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

রক্তিম লাভাস্রোত। সমস্ত কিছুই ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। আবহাওয়া দপ্তরের এই ঘোষণা। অনুরোধ করা যাইতেছে যেন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। পূর্ণ মর্যাদার সহিত এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে হইবে। আমাদের নৌকাগুলি পুরাতন এবং বাচ্চাদের জন্য সেগুলি যথেষ্ট নয়। যে কোন দিক হইতেই নিকটবর্তী উপকূল পাঁচ মাইলেরও বেশি দূরে। সাঁতরাইয়া যাওয়া অসম্ভব। হাঙ্গরকুল যুগ যুগ ধরিয়া ক্ষুধার্ত। সমুদ্রের মানিক এই দ্বীপ প্লাবিত, বিধ্বস্ত ও নিমজ্জিত হইবে। আমরা ঘূর্ণিবার্ত্যার অপেক্ষায় আছি। আজ রাত সাতটা পর্যন্ত।[১৮৬]

....

মোড়ল। সে নাচবে শুধু তোমার বাঁশীতেই। বাজাও, বাজাও কলিজার টুকরোগুলা যতক্ষণ না ছিদ্র দিয়ে গলে গলে বেরিয়ে আসে। মোচড়ানো সুরের বেড়ী উদগত হয়ে তার দেহকে অজগরের মতো জাপটে ধরুক, পেষণ করুক।

লোকটা। আমার বাঁশী তো আমি ফেলে দিয়েছি। (সবাই আহতবোধ করে)

দাগী। এমন কাজটা তুমি করলেই বা কেন?

লোকটা। বাচ্চাদের বাজিয়ে শোনাবার জন্য ওরা আমাকে ডেকেছিল কোথাও। আমার সুরের বর্ণালী প্রকাশের জন্য সাতটা কি আটটা ছিদ্রই-ই যথেষ্ট ছিলো না। সেইজন্য অনেকগুলো ছিদ্র করেছিলাম আমি। তারপর সুর নয়, শুধুই হাওয়া।...

পুরোহিত। শিস বাজাতে তো পারো। তোমার জিভটা তো রয়েছে।

দাগী। নাও, নাও শিস বাজাও। ত্বরা করো।

লোকটা। (সমুদ্র থেকে হাওয়া বইতে শুরু করে...)। আমার জিভের উপর দিয়ে হাওয়ারা সব নেচে চলেছে। তাদের সামলাতে আর পারছিনা আমি।

পুরোহিত। করি কি আমরা?

মোড়ল। শ্বাস রুদ্ধ করো। সোজা হয়ে দাঁড়াও, শুধু কথা বলে যাও। সময় কেটে যাবে।...এসো শুরু করা যাক। শীগগীর। (নড়ে না)

লোকটা। আমি শুরু করি শীগগীর।

মেয়েটা। একটা গান গাই আমি। নাই বা রইল ঢোলক, নাই বা রইল বাঁশী।[১৮৭]

'কালবেলা' নাটকের গঠন সৌষ্ঠব সম্পর্কে বজলুল করিমের মন্তব্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
১৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮–৩৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাশ দশকের ইউরোপের অস্তিত্ববাদী (Existentialism) এবং অধিবাস্তববাদী (Absurd) ভাবধারার যে প্রকাশ ঘটেছিল, তার সঙ্গে এতদাঞ্চলের, এক রকম বলতে গেলে, প্রথম পরিচয় ঘটে, ১৯৬২ সালে মঞ্চস্থ সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' নাটকের মাধ্যমে। সেইদিক থেকে প্রাচ্যের এই অঞ্চলে, নাটকটিকে ভাবনার গহনরাজ্যে আরেকটি দিকের দিশারী বলা যায়। ... অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা নানা শাখা প্রশাখা নিয়ে বিতর্ক যতই থাকুক না কেন, আমাদের দেশে এই নাটকের সাফল্য এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, এই ভাবধারারও এক আবেদন আছে যা মানবিক এবং বিশ্বজনীন। ... জেমস জয়েস–এর উত্তরসূরী স্যামুয়েল বেকেট–এর কৌশল ও বিন্যাসগত দিক এবং সংলাপ রীতির যেটুকু প্রভাব এই নাটকে আছে, সেটা অধিবাস্তববাদী নাটকে সাধারণভাবে গৃহীত পদ্ধতি। সেখানে এক চরিত্রের মন্তব্য অনেক সময়ে আরেকের উত্তর কিংবা ভাবনাকে অনুসরণ করে।

...'কালবেলা' নাটকটির স্বকীয়তা এবং বৈশিষ্ট্য, সেটার আবেদনে, ওয়েটিং ফর গডট' নাটকের মত অন্তের স্পর্শ–গ্রাসী–নাস্তির (Nothing) প্রকৃতি বা রূপের দিকে সম্মোহিত না করেও অপেক্ষার মত নিষ্ক্রিয়তাকে (Inaction) ক্রিয়া কর্মে (Action) রূপান্তর ঘটানোতে এবং সর্বোপরি, ইতিহাসপুষ্ট, প্রখরভাবে সচেতন সত্তার গীতিময় প্রকাশ।[১৮৮]

Roger crutchley সাঈদ আহমদকে 'The bird of Bangladesh' বলে আখ্যায়িত করে দীর্ঘ নিবন্ধের এক স্থানে উল্লেখ করেন—

The themes of Sayeed's works reflect the intense, often tragic relationship his country has with nature. His first published play was 'The Thing' not as one might think, a horror story about a giant raddish or like, but a powerful presentation based on the ravages of Cyclones which yearly batter the Bengal coast causing death and destruction of a mind bending scale.[১৮৯]

অপর এক পত্রিকায় নাট্যকারকে 'Sayeed marries the elemental with the abstract' আখ্যায়িত করে দীর্ঘ নিবন্ধের এক স্থানে লেখা হয়েছে—

...A part from receiving considerable critical acclaim, his plays are said to have revolutionised theatre on the sub-continent. Sayeed prefers themes which are naturalistic and elemental, in his own words "abstract yet tangible", which bring to light the deeply felt but not often realised spiretual effects of famine, Cyclone and war. ...his first published play, the thing his

১৮৮. কালবেলা, শিরোনামহীন ভূমিকা দ্রষ্টব্য

১৮৯. 'Bankok Post', Bankok, 5th November 1978. সংগ্রহ , বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ৩১৩

Dhaka University Institutional Repository

> unconventional hero is the Cyclone, the central figure around which everything revolves.[১৯০]

'কালবেলা' নাটকের নির্মাণ কৌশলে ও সংলাপ রীতিতে পাশ্চাত্য 'অ্যাবসার্ড' নাটকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ নাটকের সংলাপের সঙ্গতিহীনতা, দৈর্ঘ্য স্বল্পাকৃতি এবং চেতনাপ্রবাহের রীতিতে দ্রুত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির লক্ষণাক্রান্ত। স্যামুয়েল বেকেটের 'Waiting for Godot-এর (১৯৫৩) সঙ্গে 'কালবেলা'র সংলাপের অর্ন্তস্রোতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

ESTRAGON : It's so we won't think,
VLADIMIR : We have that excuse.
ESTRAGON : It's so we won't hear.
VLADIMIR : We have our reasons.
ESTRAGON : All the dead voices.
VLADIMIR : They make a noise like wings.
ESTRAGON : Like leaves.
VLADIMIR : Like sand.
ESTRAGON : Like leaves.[১৯১]

....

ESTRAGON : What do we do now?
VLADIMIR : While waiting.
ESTRAGON : While waiting Silence.
VLADUMIR : We could do our exercises.
ESTRAGON : Our movements.
VLADIMIR : Our elevations.
ESTRAGON : Our relaxations.
VLADIMIR : Our elongations.
ESTRAGON : Our relaxations.
VLADIMIR : To warm us up.

---

১৯০. Fifilim, New Straits Times, Kualalumpur, 3 April 1982. সংগ্রহ, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ৩১৩

১৯১. SAMUEL BECKETT, WAITING FOR GODOT, Oxford University Press YMCA Library Building, Jai Singh Road, New Delhi 110001, Ninth impression 1997, P. No. 92.

Dhaka University Institutional Repository

ESTRAGON : To calm us down.

VLADIMIR : Off we go.[১৯২]

....

VLADIMIR : We are no longer alone, waiting for the night, waiting for Godot, waiting for...waiting. All evening we have struggled, unassisted. Now it's over. It's already tomorrow.[১৯৩]

....

ESTRAGON : You say we have to come back tomorrow?

VLADIMIR : Yes.

ESTRAGON : Then we can bring a good bit of rope.

VLADIMIR : Yes.

Silence

ESTRAGON : I can't go on lke this.

VLADIMIR : That's what you think.

ESTRAGON : If we parted? That might be better for us.

VLADIMIR : We'll hang ourselves tomorrow...unless Godot comes.

ESTRAGON : And if he comes?

VLADIMIR : We'll be saved.

....

ESTRAGON : Well? shall we go?

VLADIMIR : Pull on your trousers.

ESTRAGON : What?

VLADIMIR : Pull on your trousers.

ESTRAGON : You want me to pull off my trousers?

VLADIMIR : Pull on your trousers.

ESTRAGON : ...True. He pulls up his trousers.

VLADIMIR : Well? Shall we go?

১৯২.. Ibid, P. 106

১৯৩. Ibid, P. 107

Dhaka University Institutional Repository

ESTRAGON : Yes, let's go.

They do not move.[১৯৪]

'কালবেলা' নাটকে নাট্যকার জীবনের সেই করুণ অ্যাবসার্ডটিকে তুলে ধরেছেন দ্বীপবাসীদের আপাত বিচ্ছিন্ন, সঙ্গতিহীন সংলাপে—

আহাম্মদ – বলে যাও হে বোকাচণ্ডী।

মোড়ল – পুরোহিতের সেই বার্তা।

মুনীর – উপেং এর বার্তা মোড়লের জন্য।

উনেন – উপেং এর বার্তা এই।

আহম্মদ – সংক্ষেপে বলো আমাদের।

মোড়ল – পুরোহিত যেমনটি বলেছেন।

মুনীর – শোনার অপেক্ষায় ক্ষয়ে যাচ্ছি আমি।

আহাম্মদ – দেখার অপেক্ষায় বেঁচে আছি আমি।

মোড়ল – দেখা ও শোনার প্রতীক্ষায় রয়েছি আমি।

মুনীর – দেখা এবং শোনার আগে কিছুই বিশ্বাস করা চলে না।

উনেন – এখন সেই বার্তা শোনোবা আমি।[১৯৫]

....

মোড়ল – আমার অতীতের কথা শুনতে চাই না আমি। অনেক আগেই তার আমি গোর দিয়েছি। তা দিয়ে কারও কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বরং শুনবো গৌরব দীপ্ত বর্তমানের, আশাভরা ভবিষ্যতের কথা।

উপেং– অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। শুধু বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা। এগুলো পৃথক করা চলে না। অতীতে যা শুনেছো, তা বর্তমানে, বর্তমানে যখন আছো মন ছুটে চলে ভবিষ্যতে। আর বিবেক ঘড়ির দোলকের মতো ভূত আর ভবিষ্যতের মধ্যে দুলে চলেছে। বর্তমানকে সঁপে দেওয়া হয়েছে নিয়তির হাতে। (বিরতি) বর্তমান। (বিরতি) অসাড়, অনড়, একটি মুহূর্ত শুধু।

আহাম্মদ – রাজী হও না কেন তুমি। ওর অতীতই শোনা যাক। জানার মধ্যে তো শুধু কয়েকটি কথা-জীবনের কয়েক লহমা দিশাহীনতার, কিছু আশা আর অসংখ্য নিরাশার। মানুষের ভবিষ্যত নষ্ট করে দিও না। ত্যাগ স্বীকার করো। ত্যাগ স্বীকার করো বৃহত্তর প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে।[১৯৬]

১৯৪. Ibid, P. 124

১৯৫. কালবেলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬–৭

১৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫–১৬

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপ রীতিতে 'কালবেলা' সুস্পষ্টভাবে 'Waiting For Godot' নাটকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ নাটকে ভাষা ব্যবহার ও সংলাপ নির্মাণে নাট্যকার সচেতন শিল্প দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। পাশ্চাত্য নিরীক্ষায় আঙ্গিক বিন্যাসসমৃদ্ধ নাটক 'কালবেলা' উপকূলবাসীদের জীবন সংগ্রাম, হতাশা-নিরাশার প্রেক্ষাপটে নাট্যকার বাস্তব সত্যকে উপস্থাপন করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অবস্থান এরূপ যে এখানে রয়েছে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নোডো, সাইক্লোন এদেশের মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। নিরুপায় হয়ে মানুষে জীবন বিসর্জন দিচ্ছে—

লোকটা – না আমাদের জন্য ব্যাপারটা বড় তাড়াতাড়িই এসে গ্যালো। তোমার সে রূপকথা তুমি পারলে না বলতে, আমিও পারলাম না পুরো সুর ভাঁজতে। সবার জন্য আসবে আগামীকাল, হয়তো বা আগামী পরশু, আমাদের মতো, চকিতে, অজান্তে, কোনদিন... কোন একদিন, কোনখানে, কোন দ্বীপে, আর কোন শিসধারী বংশীধারী... অন্য কোনখানে... সবখানে। অবধারিত সত্য এ সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। সালাম, পৃথিবী সালাম।

পুরোহিত – তারপর ...

মোড়ল – বলো ...

মেয়েটি – (খিল খিল হাসি)।

পুরোহিত – ...কি বলবে তারপর ...

মোড়ল – ... বলো ...

দাগী – কি বলবে ...

মোড়ল – তারপর বলো ...

দাগী – বলো...কি বলবে...বলো...বলো

[কেউ সাড়া দেয় না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ঐ কথা কয়টি বিড়বিড় করে বলতে থাকে।][১৯৭]

উপকূলবর্তী মানুষের জীবনের উপর দিয়ে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবলীলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সমুদ্র-দ্বীপ, জনপদ, প্রকৃতি ও মানুষ। তাদের নিরর্থক কালক্ষেপণ, সঙ্গতিহীন কথোপকথন, অতীত স্মৃতিচারণ, দুর্ভর নৈরাশ্য—সবকিছুর পরিনামে এক ভয়াবহ শূন্যতা নেমে আসে এবং সর্বগ্রাসী পরিণতির মধ্য দিয়ে 'এক অদ্ভুত মীমাংসিত সত্তায় উত্তরিত হয় এইসব বিপর্যস্ত মানুষেরা।'[১৯৮] প্রকাশরীতির অভিনবত্বে, শিল্পকলার নৈপুণ্যে সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' নাট্যসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

---

১৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

১৯৮. মেহের নিগার, সাঈদ আহমদের নাটকে অ্যাবসার্ড ধর্ম, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এক চল্লিশ বর্ষ॥ তৃতীয় সংখ্যা॥ আষাঢ় ১৪০৫, পৃ. ১৫

২৫

'শিলা ও শৈলী' সমকালীন বাঙালি জীবন ও যৌথ খামার, কৃষি-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। এই নাটকের মধ্য দিয়ে আ.ন.ম. বজলুর রশীদের নীতি ও আদর্শবোধ প্রচারিত হয়েছে। কৃষিপ্রধান দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে নবতর সাফল্যের পথে পরিচালনার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে—সমবায় বা যৌথ খামার করে চাষাবাদে যে অধিক খাদ্য ফলবে এবং দেশ ফুলে-মুকুলে, ফলে ফসলে ভরে উঠবে সেই অনাগত সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছেন নাট্যকার শিলা ও শৈলীতে।[১৯৯] যৌথ খামার পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে নাটকটির পটভূমি গড়ে উঠলেও তারই অন্তরালে মুখোশধারী দেশপ্রেমিকের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের হীন প্রয়াস, প্রেম-প্রীতি ও মানবীয় চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অনবদ্য চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

সত্য-সুন্দর সমিতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সুন্দর জীবনযাপনে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যেই নাটকটি রচিত। 'সত্য-সুন্দর সমিতির ত্রিবিধ পরিকল্পনা—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধি। মীনা এ সমিতির সম্পাদিকা, হিকমত সভাপতি, মামুজী অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা এবং পৃষ্ঠপোষক। হিকমতের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উৎপাদন এ তিন শাখায় বিভক্ত হবে। শিক্ষা দপ্তরের ভার থাকবে মীনার উপর, স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব মামুজী এবং কামালের উপর উৎপাদনের দায়িত্ব থাকবে।

এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কামাল একজন আদর্শবান যুবক, কৃষিবিদ্যায়, উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে সে এই সমিতিতে যোগ দিয়েছে। পাক-মেক্সিকো গম ও যাদুধানের গবেষণায় সে আত্মনিয়োগ করেছে। তার প্রচেষ্টায় যাদুধান ও গমের আশাতিরিক্ত ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের লোক তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মীনা তার অনুরাগিনী, সখিনা তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে, সেদিকে কামালের কোনো লক্ষ্য নেই, তার একমাত্র চিন্তা শস্য উৎপাদনের চিন্তা। দেশের অজ্ঞতা, বুভুক্ষা দূরীকরণের জন্য সে সব সময় ব্যস্ত থাকে। রোমান্স, বিয়ে এগুলো তার কাছে গৌন। দুনীর্তিবাজ মোড়ল কন্যা সখিনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কামালকে সখিনার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে ব্যর্থ হলে এক দুর্যোগময় রাত্রিতে সে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। সখিনা বাধা দিয়েও রক্ষা করতে পারেনি—সে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে সেই বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতে। মীনা বজ্রপাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। পরে মামুজীর সহায়তায় কামাল-মীনার মিলন হয়েছে।

এ নাটকে আদর্শ প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। সভাপতি হিকমত বিরাট ধনী ব্যবসায়ী কিন্তু স্খলিত চরিত্রের অধিকারী। সমিতির সেবা করার নামে নারীর সৌন্দর্য উপভোগ

১৯৯. মুহম্মদ মজির উদ্দীন, সাহিত্য শিল্পী বজলুর রশীদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। সমিতির কর্মী রীনা, নাজমা, মীনা এই তিন সুন্দরীকে নিয়েই সে প্রেমের অভিনয় করেছে। এরা তিনজনই উচ্চ শিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও হিকমতের প্রবঞ্চনার 'শিকার' হয়েছে। হিকমতের দেয়া রুবি বসানো লকেট–হার, মুক্তার ফুল গুচ্ছ, মুক্তা বসানো কানের দুল, কোনটাকেই তারা অস্বীকার করতে পারেনি। হিকমতের বিকৃত রুচি, নোংরামি ও অর্থের জালে সবাই আটকা পড়েছে। নাজমা–সেকেন্দর, মীনা–কামালের মিলনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর শেষ হয়েছে।

'মামুজী' চরিত্রটি নতুন জীবনবোধ ও আদর্শে উদ্দীপ্ত। আদর্শ প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যম হিসাবেই নাট্যকার চরিত্রটি বেছে নিয়েছেন। ত্যাগ, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসের জীবন্ত প্রতিমূর্তি মামুজী। তাঁর সযত্ন প্রয়াসে গড়ে উঠেছে এই সমিতি—

> ...আমি সারাজীবন স্বপ্ন দেখেছি...দেশের দশ কোটি মানুষ খেয়ে পরে সুন্দরের পরিচর্যা করে বাঁচবে, বাঁচার মতো বাঁচবে, তার সূচনা তোমরা করে যাবে। একজনের সুখ, সুখ নয়, দশজনের মিলিয়ে যে সুখ, যে আনন্দ তা জীবন ও জগতকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলে।[২০০]

তাঁর সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ তিনি সমিতিকে দান করে গেছেন—

> আমার সমস্ত জীবনের সঞ্চিত সাড়ে তিন লাখ টাকা তোমাদের সমিতিকে...[২০১]

কৃষি পদ্ধতির নব রূপায়ণ আলোচ্য নাটকের মূল সুর। এমন একটি সরস বিষয়বস্তুকে এখানে যেভাবে রসগ্রাহী করে প্রকাশ করা হয়েছে তা আমাদের সাহিত্যে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ণাঙ্গ নাটকের শিল্পকৃতি হয়তো এখানে আশানুরূপ নেই, কারো কাছে একে একটি জীবন্তিকা বলেও মনে হতে পারে ; তবু চাষ পদ্ধতির যান্ত্রিকীকরণের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে যে সমাজচেতনা, যুগচিত্র ও রসবোধের পরিচয় লেখক দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ব্যাপার।[২০২]

২৬

আ.ন.ম. বজলুর রশীদের সুর ও ছন্দ[২০৩] নাটকটির মধ্যে নীতি ও আদর্শবাদ প্রচারিত হয়েছে। এতে জীবন সম্পর্কে নাট্যকারের যে ধারণা অল্প কথায় লীনার মুখে তা প্রকাশিত হয়েছে, 'জীবনের সত্যিকার আনন্দ মনের প্রশান্তিতে, সম্পদে নয়।[২০৪] নাটকটি বক্তব্য ও সংলাপ প্রধান, কাহিনী নিতান্ত গৌণ।

---

২০০. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, শিলা ও শৈলী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭, পৃ. ৬২

২০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

২০২. বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯

২০৩. আ.ন.ম. বজলুর রশীদের 'শিলা ও শৈলী' এবং 'সুর ও ছন্দ' নাটকদ্বয় গ্রন্থাকারে একত্রে প্রকাশিত হয়েছে (১৩৭৩)। 'সুর ও ছন্দ' নাটকের প্রথমে নামকরণ করা হয় 'যখন সন্ধ্যা তারা উঠবে' এই দুটি নাটক বাংলা একাডেমীর নাট্য মৌসুমে একাডেমীর সহযোগিতায় ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

২০৪. পূর্বোক্ত, সুর ও ছন্দ, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

এ নাটকে শিক্ষক মুনীর চৌধুরী ও তার কন্যা লীনার মধ্য দিয়ে আদর্শবাদ প্রচারিত হয়েছে। মুনীর সাহেব অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেন, নিজের সংসারে দারিদ্র্য অভাব অভিযোগ থাকলেও তিনি পরীক্ষার খাতা দেখার মাত্র ১৫০টি টাকা গরিব এবং মেধাবী ছাত্র কলিমের হাতে তুলে দিয়েছেন নিঃসঙ্কোচে। পৃথিবীর নানা সমস্যা, দেশের অজ্ঞতা সম্পর্কে লীনার সঙ্গে মুনীর সাহেব আলাপ করেন। একদিন পিতা-কন্যা আলাপরত, এমন সময় মুনীর সাহেবের সদ্য বিলাত ফেরত ছাত্র শরীফ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। সদ্য বিলাত থেকে আগত শরীফের মধ্যে পশ্চিমা সভ্যতার যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণই বিদ্যমান। শিক্ষকের সম্মুখে সে নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছে—

> ...আমার সেই বিলাতের বান্ধবী যখন রাম উয়থ বিটন যেগ খেয়ে লাল ঠোঁটের ফাঁকে আলগোছে একটি ক্রাভনয়ে ধরাতো, তখন ঠোঁটের লাল ও দুই গালের লালের সাথে সিগারেটের আগুন মিলে এক অপূর্ব রাগ রক্তিমা সৃষ্টি হতো স্যার, কোথায় লাগে সানসেট ব্লাশ...[২০৫]

শিক্ষকের সামনে এ ধরনের মন্তব্য কোনো সুস্থ, রুচিশীল মানসিকতার পরিচয়বাহী নয়। সে বিলাত থেকে বয়ে এনেছে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিশাপ, মদ্যপান, বিলাসিতা, কৃত্রিমতা, ভোগসর্বস্বতা এবং উৎকট ও কদর্য মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে, আদর্শ জীবনবোধের পরিচ্ছন্নতা তার মধ্যে লক্ষণীয় নয়। লীনাকে সে প্রেম নিবেদন করে লীনা তাকে পাত্তা দেয় না, সে পছন্দ করে গরিব, মেধাবী এবং আদর্শবাদী যুবক কলিমকে। লীনা শব্দচয়ন প্রতিযোগিতায় এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছে। তার আত্মীয়স্বজন পরিচিত ব্যক্তিরা এই সংবাদ শুনে তাদের বাড়িতে এসে ভীড় জমিয়েছে। সে সেই টাকা অন্য কারো হাতে তুলে না দিয়ে আদর্শবাদী পিতার হাতে তুলে দিয়েছে—'দুস্থ শিক্ষক কল্যাণ সমিতিকে' দান করার জন্য। কন্যার এই ঔদার্যে মুগ্ধ হয়ে পিতা বলেছেন—

> আমার সারাজীবনের স্বপ্ন আজ সফল হলো। যে নিরাসক্ত সহজ সরল জীবনের স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম, সে জীবন ত্যাগে, জ্ঞানের সাধনায় অক্লান্ত ও সম্ভবপর সেই জীবন আজ আমার আত্মজার মধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।[২০৬]

'সুর ও ছন্দ' আদর্শ প্রচারমূলক নাটক হলেও কাহিনীর গতি আছে, চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত, সংলাপ সুর ও ছন্দে ভরপুর, নাটকটি সফলতা অর্জনের শিল্পরীতি সমৃদ্ধ।

---

২০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
২০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

২৭

নুরুল মোমেনের 'আইনের অন্তরালে' সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। আইন ব্যবসা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যবসা, আদালত হচ্ছে ন্যায়-পরায়ণতা, নীতি ও নিয়ম নির্ধারণের সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠান। নাট্যকার পেশাজীবনের সূচনাপর্বে একজন আইনজ্ঞ ছিলেন যার কারণে আইন ব্যবসার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আইনকে সামনে রেখে মনুষ্য সমাজের যে অসদাচরণ, অসততা তাকে পীড়িত করে তুলেছিল তারই নাট্যরূপ আইনের অন্তরালে। আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত উকিলরা অসৎ উপায়ে মক্কেলদের কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছে। নিরীহ মক্কেলরা ন্যায় বিচার থেকেই শুধু বঞ্চিত হচ্ছে না—অসৎ উকিল, ধুরন্ধর মুহুরী, ধাপ্পাবাজ টাউটদের পলিটিকেসর শিকার হচ্ছে। এ নাটকে চারজন উকিলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একজন প্রতিভাবান নীতিসম্পন্ন, দৃঢ় চরিত্রের প্রবীণ উকিল, দ্বিতীয়জন প্রতিভাবান ও ন্যায়পরায়ণ নতুন উকিল, তৃতীয়জন প্রতিভাবান প্রবীণ উকিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নীতিজ্ঞান সম্পন্ন নন, চতুর্থজন মধ্যবয়সী উকিল চালিয়াৎ পর্যায়ের। নাট্যকার আলোচ্য চারজন উকিলের মাধ্যমে শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় এবং ভালো-মন্দের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার চিত্র তুলে ধরেছেন, পরিশেষে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে। আখতার হামিদ ও রফিকের পাশাপাশি আখন্দ ও আলফাজ-দু'টি চরিত্র সৃষ্টি করে সত্য ও অসত্য ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তরুণ আইনজীবী রফিকের সংলাপের মধ্য দিয়ে সমাজচিত্রটি সুন্দরভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন—

> করম আলী মিয়া, ক্লেদাক্ত পরিবেশ চারদিকে, এর মধ্যে এই ওকালতি ব্যবসায় থাক্‌বো নাকি এ পরিত্যাগ করবো বুঝতে পারছি না। তালগোল পাকানো আইনের এ রঙ্গমঞ্চে, উকিল-মোক্তার, সাক্ষী-কেরানী, টাউটদের ভীড়ে আইনের বেদীতে নিজেকে উৎসর্গ করেই যাব, নাকি এর থেকে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করবো এই হলো প্রশ্ন।[২০৭]

করম আলী একজন ঘুঘু ও বিচক্ষণ মুহুরী, বনজু মিয়ার সঙ্গে বচসাতে সেটি প্রমাণিত হয়েছে। চমৎকার শব্দ বলে মক্কেলদের ঘাবড়ে দিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে ফিস আদায় করে-

করম। মেমোর জন্যে ১৫/=, এফিডেভিটের জন্য ২/=, আর আমার জন্য ৫/=,

বনজু। আপনার জন্য ৫/= এটা নিশ্চয়ই বেশি

করম। তাহলে ৩ টাকা।

বনজু। দু' টাকা।

---

২০৭. নুরুল মোমেন, আইনের অন্তরালে, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

করম। বেশ দু'টাকাই সই। আমার দু'টাকা এবং আঠার টাকা ছ'আনা হলো পোপোকাটাপাটালের জন্য।[২০৮]

আদালত প্রাঙ্গণে এ দৃশ্য অত্যন্ত বাস্তব। আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বের সমাজব্যবস্থায় যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল আজও তারই প্রবাহ চলছে। হারুত, মারুত দুইজন টাউট—গ্রামের নিরীহ মক্কেলদের ফাঁকি দিয়ে যেভাবে উকিলের কাছে নিয়ে এসেছে, বর্তমান সমাজে আদালত প্রাঙ্গণে এ দৃশ্য বিরল নয়। গঞ্জর আলী একজন গ্রাম্য দালাল, সে নিজেকে খুব বিচক্ষণভাবে, গ্রামের নিরীহ লোকদের অসহায়তার সুযোগে ফায়দা লুটে নেয়। আইনের অন্তরালে নাটকে নুরুল মোমেন আইনের অন্তরালের অসততা ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেছেন।

২৮

'ক্রীতদাসের হাসি'[২০৯] শওকত ওসমান ও রামেন্দু মজুমদারের যৌথ নাট্যকর্ম। এটি শওকত ওসমানের বহুল আলোচিত ও পুরস্কৃত উপন্যাস ক্রীতদাসের হাসি'র নাট্যরূপ। অর্থ দিয়ে গোলাম বাঁদী কেনা গেলেও ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না—এটিই নাটকের মর্মবাণী। খলিফা হারুনর রশীদের শাসনামলে বাগদাদের একটি ঘটনাকে আশ্রয় করে নাটকের কাহিনী বিন্যাস। চরিত্রগুলো বিভিন্ন চিন্তা-চেতনার প্রতীক। খলিফা ও মশরুর ক্ষমতা অন্ধ, শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ ; আবদুল কুদ্দুস খলিফার আশ্রিত ও ধামাধরা এক আলেম, কবি ইসহাক বিবেকবান এক কবি, তাতারী ও মেহেরজান শাশ্বত মানবতার প্রতীক।

নাটকের নিবেদনে শওকত ওসমান উল্লেখ করেছেন—

> এই নাটক আদৌ ঐতিহাসিক নাটক নয়। তবে ইতিহাসের কিছু উপাদান লাগানো হয়েছে। ইতিবৃত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে পাঠক হতাশ হবেন। কাহিনী ইতিহাস নয়—সে কথা সকলকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।...এ বই কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন উপন্যাস, আবার কেউ মনে করেছেন নাটক। সেই সন্দেহ এতদিনে নিরসন করা গেল।[২১০]

স্বৈরাচারী বাদশাহ হারুনর রশীদ গোলাম বাদীর স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে মুগ্ধ হন। ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য, ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বাদশাহ তাতারী ও তার স্ত্রী মেহেরজানের প্রেম-ভালোবাসায় পূর্ণ জীবন, হাসি-আনন্দ

---

২০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

২০৯. ঢাকা থেকে পুঁথিঘর ১৯৬৮ সালে প্রথম নাটকটি প্রকাশ করে। দ্বিতীয় প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮০। ১৯৬৫ সালের ২রা ও ৩রা মে ঢাকার কার্জন হলে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী'র উদ্যোগে—রামেন্দু মজুমদারের প্রযোজনায় 'ক্রীতদাসের হাসি' প্রথম মঞ্চায়িত হয়। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন—ইকবাল বাহার চৌধুরী, আল মামুন, রেজা চৌধুরী, আবদুল্লাহ-আল মামুন, বদরুদ্দীন, দিলীপ দত্ত, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও রওশন নবী। ঢাকা টেলিভিশনে প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬৯ সালে।

২১০. শওকত ওসমান, 'ক্রীতদাসের হাসি' প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, নিবেদন দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

দেখে বিস্মিত হন। বাদশাহ তাতারীর স্ত্রী মেহেরজানকে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর গোলাম তাতারীর স্বতঃস্ফূর্ত হাসি হারিয়ে যায়। ধন-দৌলত, বিলাস, ভিন্ন নারীর যৌবন কোনটিই তাতারীর মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি—

> তাতারী। ...নারীর বিবসনা হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু সে কেবল প্রেমে। নারীর নির্লজ্জ হওয়ার অধিকার আছে। তাও শুধু প্রেমে। একটি মানুষ যার সান্নিধ্যে তার অস্তিত্ব অর্থবান হয়—তেমন মানুষের জন্যে। জমিন-দরদী দেহকান (চাষী) যেমন নহরের পানি নিজের জমির জন্য বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখে, প্রেমিক নারী তেমনই সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ একটি হৃদয়ের জন্য সঞ্চিত রাখে। তোমার দেহের দিকে তাকাও ও ত সওদাগরের দোকান, লেবাস আর জেওরে (অলংকার) ঠাসা। দীরহাম দিলেই পাওয়া যায়। নারীর মূল্য অত সস্তা নয়—যে নারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির শিশুকে পৃথিবীতে আমন্ত্রণ দিয়ে আনে—যে নারী শাশ্বত মানবতার জননী—বসুন্ধরার অনন্ত অঙ্গীকার, সে অত সস্তা হয় না... ।[২১১]

পরিশেষে বাদশাহের শত অত্যাচারও গোলাম তাতারীর মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি। তাতারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মৃত্যু পথযাত্রী গোলাম তাতারীর উক্তির মধ্য দিয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে--

> তাতারী। শোন, হারুনর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস, গোলাম কেনা চলে। বাঁদী কেনা সম্ভব। কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না।[২১২]

নাটকের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করে নাট্যকারদ্বয় বর্তমান সময়কে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। হারুনর রশীদের শাসনব্যবস্থায় গোলামের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, বাদশাহের হুকুম ছাড়া তাদের প্রেম ভালোবাসা বিবাহের অধিকার নেই। আলেম আবদুল কুদ্দুস খলিফার ইচ্ছানুযায়ী ফতোয়া জারি করতেও কুণ্ঠিত হননি—

> ...এই দ্যাখো, আলেম আবদুল কুদ্দুসের ফতোয়া। তিনি লিখেছেন, মেহেরজান কেনা বাঁদী। মালিকের হুকুম ছাড়া তার কোনো শাদী হতে পারে না। যদি হয়, তা না জায়েজ (শাস্ত্রসিদ্ধ নয়) মজকুর বাঁদী মেহেরজান ও গোলাম হাবসী তাতারীর শাদী না জায়েজ।[২১৩]

আলেম আবদুল কুদ্দুস খলিফার আশ্রিত গুণগ্রাহী। তাই অতি সহজেই তিনি মেহেরজান তাতারীর বিবাহকে অবৈধ বলে ফতোয়া জারি করেন। কিন্তু বিবেকবান কবি ইসহাক ফতোয়ার প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন :

---

২১১. ক্রীতদাসের হাসি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
২১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
২১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

> এই বাগদাদ শহরে তিন তিন খানা আলীশান মাকান ইমারৎ, বাগবাগিচা আর বছর বছর পাঁচ হাজার দীরহাম যায় খাজাঞ্চী খানা থেকে। তিনি এসব খোয়াতে যাবেন নাকি তোমার মত আক্কেল দেখাতে গিয়ে? আমি কি দিই তাও তিনি যেমন জানেন, আমি কি চাই, তাও তিনি তেমন বোঝেন।[২১৪]

সমাজ, রাষ্ট্রের এ চিত্র পুর্বেও যেমন ছিল—বর্তমান শতাব্দীতেও তা অনুপস্থিত নয়। ফতোয়া দানকারীর অভাব যেমন পূর্বেও ছিলনা, তেমনি আজও নেই।[২১৫]

'ক্রীতদাসের হাসি' নাটকে বাদশাহ হারুনর রশীদের শাসনামল স্বৈরাচারের চিত্র তুলে ধরে আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের প্রতিবাদী চেতনার রূপরেখা অঙ্কন করেছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। তৎকালীন সময়ে বাঙালিদের কোন স্বাধীনতা ছিল না, শৃঙ্খল বন্দি বাঙালিদের মর্মবেদনা উপলব্ধি করে নাট্যকার লিখেছেন—ক্রীতদাসের হাসি।

২৯

মুনীর চৌধুরীর 'পলাশী ব্যারাক' একাঙ্কিকার রচনাকাল ১৯৪৮ সাল। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর নব্যগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। কলকাতা থেকে আগত অসংখ্য কেরানীর বসবাসের জন্য সরকার পলাশী ব্যারাক ও নীলক্ষেত ব্যারাক স্থাপন করে দেন। কিন্তু এই ব্যারাকগুলি ছিল বসবাসের অযোগ্য, ফলে বসবাসকারীদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। এ সম্পর্কে ড. রফিকুল ইসলামের উক্তি উল্লেখযোগ্য—

> ... দ্বিতল ব্যারাকগুলোর এক তলার ছাদ আর দোতলার মেঝে ছিল কাঠের পাটাতন। পাটাতনের কাঠগুলোর মধ্যেও কিছু কিছু ফাঁক ছিল। যার মধ্য দিয়ে ওপর থেকে পানি, ময়লা স্বাচ্ছন্দ্যে নীচের বাসিন্দাদের ওপরে, তাদের বিছানাপত্রে পড়তো। এই নিয়ে উভয়তলার বাসিন্দাদের মধ্যে চলত বিসম্বাদ।[২১৬]

পলাশী ব্যারাকের অনতিদূরেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তিনি ছাত্রাবস্থায় ছিলেন। ব্যারাকের নিম্নবিত্ত মানুষের সমস্যা-সংকুল জীবনকে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাদের এই দুর্ভোগের জন্য তিনি তৎকালীন সরকারের রাষ্ট্রীয় অবস্থার প্রতি আঘাত হেনেছেন।[২১৭] এ নাটকের চরিত্র সংখ্যা সাতজন। একজন ডাক পিয়ন ব্যতিরেকে সবাই সরকারি অফিসের কেরানী। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই শুরু হয় জীবন যুদ্ধ। কেরানী হাবিবের ভাষায়—

---

২১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

২১৫. সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ৩৮৪

২১৬. রফিকুল ইসলাম, মুনীর চৌধুরীর জীবনকথা, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, 'মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা স্মারক গ্রন্থ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃ. ১৫

২১৭. মুনীর চৌধুরীর নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

...প্রতি ঘর প্রস্থে চৌদ্দ হাত দৈর্ঘ্যে পনর হাত, প্রতি ব্লকে পঁচিশটা ঘর, প্রতি ঘরে দশজন মানুষ, সবগুলো ব্যারাক মিলিয়ে এখানে থাকে চার হাজার কর্মচারী। এক একটা ব্লকের জন্য মাত্র একটা করে কল, তাতে পানি থাকবে সকাল সাতটা থেকে দশটা অবধি, কলের মুখে ব্যাস কোয়ার্টার ইঞ্চি, পানি পড়বে ঝির ঝির করে।[২১৮]

এই অবস্থায় প্রতিদিন সকলের পক্ষে মুখ ধোয়া এবং অন্যান্য প্রাত্যহিক কাজ করা সহজসাধ্য হয় না। ব্যারাকের বাসিন্দাদের সংলাপ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে কেরানীর দুরাবস্থা সহজেই অনুমেয়—

মফিজ। নইলে বিছানা ছাড় সোবেহ সাদেকের সময়, এস্তেঞ্জা কর কুলুখ দিয়ে, তারপর মুখে ব্রাশ পুঁতে মন্ত্রীর পেয়ারা কন্ট্রাক্টরের তৈরি ভাঙা কলতলায় এবাদত কর পানির কৌটার জন্য সারা সকাল। বাব্বা। আর দেরী করে উঠলে এস্তেঞ্জার কর কিউতে দাঁড়িয়ে, তারপর হাবিবের দশা হলে এন্তেকাল করা ছাড়া কোন পথই থাকবে না।[২১৯]

মফিজ। ...ঘরের পাটাতন নয়তো শালা হারমোনিয়ামের রীড বানিয়ে রেখেছে। দোতলার বারান্দায় এক ফালি করে তক্তায় পা পড়ছে আর ঘরের মধ্যেও অমনি অন্য প্রান্ত তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে সারি সারি।[২২০]

মারুফ। ...আমাদের ওপরের তালার মেঝের তক্তাগুলো, সোজা হিসেবেই, প্রত্যেকটা দু' ইঞ্চি চওড়া। বসানো হয়েছে আধ ইঞ্চি দূরে দূরে। বুঝলেন এতগুলো ফুটো, একটু হিসেব করে দেখলেই বুঝতে পারবেন।[২২১]

ফলে প্রায়ই উপর তলার মালামাল চুইয়ে পড়ে নীচতলার বাসিন্দাদের উপর, আর এ নিয়ে বাঁধে বিবাদ। নড়বড়ে কাঠামোর সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বিপজ্জনক, রোজই দু'চারটা সিঁড়ি, পার্টিশান, দরজা ভেঙ্গে পড়ে। ব্যবহারের অযোগ্য পায়খানার প্রতি দুটি খোপের জন্য মাত্র একটি করে দরজা অবশিষ্ট আছে। এখানে চলে রীতিমতো মুষ্টিযুদ্ধ। আহত কামালের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সরকারি কেরানীদের অবস্থার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন—

...দেড়শ লোক খুপরীগুলো এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে চাইলে, কত ডিগ্রি কোন করে তা কখন খুলবে? খোলার গতি ও কৌনিক অবস্থানের আনুপাতিক সম্পর্ক কি হবে? যাতে করে বিনাদোষে আমার নাকের ওপর অত্যন্ত বেকায়দায় বসে থাকা অবস্থায়, হঠাৎ এক পশলা ঘুঁশি এসে না পড়ে।[২২২]

---

২১৮. গ্রন্থটি তাঁর পঞ্চম নাট্যগ্রন্থ। ১৯৬৯ সালে মাওলা ব্রাদার্স থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। পলাশী ব্যারাক, পৃ. ৩০৬

২১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭

২২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

২২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

২২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

ড. আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেন, 'মুনীর চৌধুরীর নাট্য স্বভাবের অনেকখানি এই একাঙ্কিকায় উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর সমাজ চেতনার বিশিষ্ট প্রকাশ এখানে ঘটেছে রঙ্গ-ব্যঙ্গের আড়ালে।[২২৩] সমাজ-চেতনার পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতাও প্রকাশ পেয়েছে।[২২৪] কেরানীদের অসহায় করুণ অবস্থার জন্যে তিনি সরাসরি কন্ট্রাক্টর ও মন্ত্রীদের দোষারোপ করেছেন—

> হাবিব। ক্ষেপব না ! ভোরবেলা মুখ ধুতে পারি না কন্ট্রাক্টরের নাফরমানির জন্য। বেটাকে জেলে পুরতে পারছিনা মন্ত্রী শালার সঙ্গে ওর টাকার সম্বন্ধ বলে ; যা বেতন পাই তাতে বৌকে মেরে ফেলতে হবে গলা টিপে, বিষ কেনার বাড়তি পয়সা নেই বলে, পাকিস্তানের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারবনা দেহত্যাগ করতে হবে বলে।[২২৫]

হতভাগ্য. কেরানীদের কোন ব্যক্তিগত সাধ-আহলাদ নেই। বাড়িতে পরিবার আছে, তাদের দেখতে যাওয়ার বাড়তি পয়সা নেই। তবে মারুফ, যে জীবনকে গণিতের নিয়মে মেপে চলে, সে জীবন সম্পর্কে আশাবাদী। সে হিসেব করে দেখেছে—'বাসে চড়ব না। ধোপায় দুবার কম দেব। চুল ছাঁটাব না'।[২২৬] এতে করে প্রতিমাসে তার ১০ টাকা জমবে ৮ মাস পর ৮০ টাকা হবে। এই টাকা দিয়ে বৌ এর জন্য একজোড়া শাড়ি, বড় ছেলেটার জন্য জামা, ছোট মেয়েটার জন্য একটা কিছু কিনে বাড়ি যাবে। অঙ্কবাগীস হাফিজ, ছাত্রজীবনে অঙ্কে সে বরাবরই ভাল ফলাফল করেছে। অঙ্ক করে বাড়ি যাওয়ার পথ বাতলে সে মনে মনে সুখ স্বপ্ন দেখতে থাকে। তার সমস্ত স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিয়ে স্ত্রীর চিঠি এসেছে—

> ...বৌ মনে করিয়ে দিল যে, কাবিননামায় নাকি শর্ত দেয়া হয়েছিল যে দু'মাসে একবার বিবির মুখ দর্শন না করলে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমার তালাক মঞ্জুর করতে হবে। আমি অতটাকা কোথায় পাবো ?[২২৭]

মাত্র আশি টাকা জমাতে মারুফের আট মাস কেটে যাবে, সে কিভাবে স্ত্রীর শর্ত পূরণ করবে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রেম-ভালোবাসার দুঃখজনক পরিণতির চেয়ে কাবিননামার শর্ত পূরণই তার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে। এই বেদনাময় জীবনচিত্র প্রতিটি কেরানীর জীবনেই প্রতিফলিত হয়েছে। নাট্যকারের বক্তব্য সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে হতভাগ্য কেরানীদের ভাগ্যের পরিবর্তন সম্ভব নয়।

পলাশী ব্যারাক একাঙ্ক নাটকের কাহিনীতে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান এর যে প্রধান তিনটি সমস্যাকে ধারণ করেছে, তা হচ্ছে : আবাসিক সমস্যা, দেশের উর্ধ্বে ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্য তথা

---

২২৩. আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী, পৃ. ৪৫
২২৪. মুনীর চৌধুরীর নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬
২২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯
২২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২
২২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

আমলাতান্ত্রিক সুবিধাভোগ এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক বিপর্যয়। আবাসিক সমস্যা বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে, একদিকে গ্রাম প্রধান পূর্ব বাঙলার মানুষ চাকরির জন্যে ঢাকা শহরে ভিড় করেন, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ ঢাকায় ফিরে আসেন। অপর দুটি সমস্যা দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে উৎসারিত। সরকার বিশেষ করে নিম্নস্তরের কর্মচারীদের একক অবস্থানের জন্যে যে ব্যারাক স্থাপন করেন তার দুর্বল নির্মাণ কাঠামো, পানি সমস্যা, অপর্যাপ্ত পক্ষালনকক্ষ, খাদ্য এবং সর্বোপরি আর্থিক দুরবস্থার নাট্যিকরূপ দিয়েছেন বিদগ্ধমানবদরদি নাট্যকার মুনীর চৌধুরী।[২২৮]

৩০

মুনীর চৌধুরী'র 'ফিটকলাম' একাঙ্কিকা রচনাকাল ও ঘটনকাল ১৯৪৮ সাল। রাজনীতি সচেতন নাট্যকার গোয়েন্দা পুলিশের কার্যক্রম তৎপরতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে নাটিকার প্রেক্ষাপট সাজিয়েছেন। 'ফিফথ কলাম বা পঞ্চম বাহিনী' বলতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার-বিরোধী রাজনীতিকদের বোঝানো হয়েছে। মুসলিম লীগের সংকীর্ণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরে এসব প্রগতিপন্থী রাজনীতিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, গোয়েন্দা বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। এই 'ফিফথ কলাম'— এরই বিকৃত বা অপভ্রংশ রূপ ফিটকলাম।[২২৯]

একজন রাজনৈতিককর্মী পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলে, পলাতক রাজনৈতিককর্মী সন্দেহে রিকশায় উপবিষ্ট কোনো এক বোরখা পরিহিতার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করে গোয়েন্দা পুলিশের লোক। এখান থেকেই কাহিনীর সূত্রপাত। একে জটিল করে তুলেছে রাস্তার চারপাশের লোকজন। এদের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নাট্যকারের বক্তব্য।

উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নাট্য কাহিনীর শুরু হয়েছে—স্যুট টাই পরিহিত জনৈক ভদ্রলোক লুঙ্গি গেঞ্জি পরা লোককে আক্রমণ করেছে। রিকশার ওপর আগাগোড়া বোরখায় মুড়ি দেয়া একটি মানুষ মূর্তি--পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে আছে—

> হারামজাদকির জায়গা পাওনা আর। বোরখা পরা আওরতের মুখের সামনে বিড়ি উঁচিয়ে তুমি আমার কাছে আগুনের খোঁজ করেছিলে, না?[২৩০]

---

২২৮. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ৮০

২২৯. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ৮৩-৮৪

২৩০. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফিটকলাম, পৃ. ৩২১

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশ ঘটনাস্থলে এসে ভীড় করেছে দোকানী, মুছুল্লী, ফক্কর, রসিক, চশমাধারী। প্রহৃত লোকটি ও তার সঙ্গী নিজেদের সি.আই.ডি'র লোক বলে দাবি করে। শিশু রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নে তারা বোরখাধারীদের পঞ্চম বাহিনী বলে সন্দেহ করেছে—

> ...আপনি কি করে বুঝলেন যে ঐ বোরখাধারী রাষ্ট্রের দুশমন নয়, ছদ্মবেশধারী কোনো ফিফথ কলাম নয়?[২৩১]

এক পর্যায়ে তারা বোরখার মুখ উল্টিয়ে পরখ করতে চাইলে মুছুল্লী প্রতিবাদ করে ওঠে—

> সি.আই.ডি-র লোক বলেই তুমি তো আর হায়ওয়ান জানোয়ার নও। পর্দা, আব্রু সব দলে মাড়িয়ে চলবে তোমরা?[২৩২]

মুছুল্লীর মাঝে তৎকালীন মুসলিম লীগ পন্থীর রক্ষণশীল মানসিকতা ক্রিয়াশীল। সি.আই.ডি-র লোক বলে দাবিকৃত ফিরোজ সন্দেহ করেছে যে শরিয়তের খোলস পরে 'পঞ্চম বাহিনী' এভাবে জনতার চোখে ধুলা দেয়—

> ...আমরা সি.আই.ডি-র লোক—জাতির মেরুদণ্ড, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার, আমরা গোয়েন্দা পুলিশ। দেখুন, আপনাদের চোখের সামনে, এই পঞ্চম বাহিনী দল আমাদের পর্যন্ত কি রকম নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। নিজের চোখে ঠুলি খুলে ফেলুন, চিনে রাখুন এদেরকে।[২৩৩]

জনতার এই উত্তেজনার ফাঁকে বোরখা-পরিহিতা রিকশা থেকে অন্তর্ধান করে, গোয়েন্দা বাহিনীও কেটে পড়ে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেও সি.আই.ডি-র লোক দুটি সম্পর্কে অভিনেতার সন্দেহ থেকে যায়। তার প্রশ্নের উত্তরে দোকানী বলে—

> ক্যাম্বায় কমু। বোরখা পরলেই মরদ যদি আওরৎ হইবার পারে তবে আওরৎ দেখলে গুন্ডা, সি.আই.ডি. হইবার পারব না ক্যান? রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ বেচায়েন হয় না? সবই এক জাতের সাব—।[২৩৪]

নাটকে শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গোয়েন্দা পুলিশের নির্মম তৎপরতা, অপরদিকে মুছুল্লীর শরিয়তের বিধি নিষেধ প্রচারে কঠোর প্রবণতা এবং অন্যান্যদের নানা মন্তব্য, টীকা টিপ্পনী ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা আছে। গোয়েন্দা ফিরোজের সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সরকারের শেখানো বুলি ও শোষণের রূপটি তুলে ধরা হয়েছে—

---

২৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬
২৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪
২৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭
২৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের নেতা বলেছেন—ঐক্যই আমাদের রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদ।[২৩৫]

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতাদের বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে পাণ্ডার বক্তৃতায়—

> ...বেদ্রারাণে ইসলাম। এই চশমাধারী লোকটাকেও আপনারা চিনে রাখুন। এর কথার ঢং হিন্দুস্তানের কুচক্রী নেতাদের মতো। এ পাকিস্তানে অবিশ্বাসী, যুক্তবঙ্গের উপাসক। আমাদের রাষ্ট্রের কল্যাণকে এ যুবকরা মশ্‌করা করে।[২৩৬]

পুলিশের প্রতি মুনীর চৌধুরীর দৃষ্টি আজীবন তির্যক। 'নষ্টছেলে' থেকে এর সূত্রপাত, এরপর 'ফিটকলাম', 'কবর', 'আপনি কে' ইত্যাদি নাটকেও পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনীর স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। নাট্যকার এদের কখনো সরাসরি সমালোচনা করেছেন, কখনো বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন—

> ফক্কড়। তা গোয়েন্দা পুলিশের পো, বোরখার আড়ালে আবডালে ঘোরাফেরা করছিলে কিসের তরাশে, সেটা কি শুধু স্টেটের খাতিরে, না নিজেরও কিছু গরজ পড়েছিল?[২৩৭]

> পাণ্ডা। ...ধর্মাবেগে আপনি বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন মৌলবী সাহেব। ভুলে যাচ্ছেন নেতার বাণী : পঞ্চম বাহিনীর হাত থেকে রাষ্ট্রকে বাঁচাবার জন্য আমাদের নির্মম হতে হবে।[২৩৮]

> ....

> মুছুল্লী। এটা ইংলিস্তান নয়, পাকিস্তান। ইসলামিক স্টেট। যার খুশী সে মুখ বুক উরু দেখাক। কিন্তু যে চায়না, তার ঈমান আমি শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়ে রক্ষা করব।[২৩৯]

৩১

মুনীর চৌধুরীর 'আপনি কে' নাটিকার কাহিনী বিন্যাস গোয়েন্দা পুলিশকে কেন্দ্র করে। বিষয়বস্তু তুচ্ছ হলেও কৌতুকবরণে দেশ ও কাল সমুপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ ছাত্র-ছাত্রী শহর থেকে অনেক দূরে গেছে বনভোজনে। অতি উচ্ছ্বাসে তারা ভুলে খাদ্যদ্রব্যাদি ট্রেনে ফেলেই নেমে পড়েছিল। মধ্যাহ্নে যখন ক্ষুধার জ্বালা তুঙ্গে তখন তাদের খাবারের কথা মনে পড়ে। এমন সময় স্বর্গীয় দূতের মত খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ে উপস্থিত হয় এক আগন্তুক। এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে সকলে আগন্তুক ব্যক্তিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে ওঠে—

---

২৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮
২৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯
২৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩
২৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭
২৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

Dhaka University Institutional Repository

তন্বী। আপনি মহৎ, আপনি মহান। দেশের ও দশের কল্যাণ, জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ আপনার মতো বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির হাতে পড়লে দুঃখী ও নিরন্নজন নিশ্চিত হতে পারত।[২৪০]

তরুণ। আপনি আমাদের সংকট কালের মুক্তিদাতা, আপনিই আমাদের একমাত্র পরিত্রাণ কর্তা।[২৪১]

কুলসুম। আপনি দেবতা, ফেরেশতা, ফকীর, দেরবেশ, আউলিয়া, সেইন্ট–সব।[২৪২]

এরূপ সম্ভাষণে অভিষিক্ত করার পরও আগন্তুকের নির্লিপ্ততা তাদেরকে হতবাক করে, তখন সবাই এক সঙ্গে জানতে চায়—

...সত্যি আপনি কে? মর্তের না উর্দ্ধের? সব বিশ্বাস করতে রাজী আছি।[২৪৩]

অবশেষে আগন্তুক জানায়—

আমি সামান্য লোক।...সামান্য চাকুরী করি। কিছু অন্যরকম খবর ছিলো তাই আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলাম। বুঝলেন না, সঙ্গের জিনিসপত্রের ওপর কড়া নজর রাখা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আপনারা যখন হৈ চৈ করে কোনো জিনিস না নামিয়ে নিজেরা স্টেশনে নেমে পড়লেন, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আমি না পারলাম আপনাদের ডাকতে না পারলাম জিনিসগুলো ছেড়ে নেমে পড়তে। ফলভোগ করলাম। তিন স্টেশন পর ক্রসিং পেলাম, গাড়ী পাল্টে জিনিসপত্র সব নিয়ে এই এখন এলাম। ...আমি কিছু না, সামান্য চাকুরী করি। এই আই বি অফিসে। আপনাদের কোনো উপকারে এসে থাকলে সে মানে।[২৪৪]

তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ সরকারের গোয়েন্দা নিয়োজিত করা ছিল সাধারণ ঘটনা। কর্তৃপক্ষের ভীতি ও সতর্কতা এত বেশি ছিল যে ছাত্র–ছাত্রীদের নিছক বিনোদনমূলক বনভোজনের মধ্যেও তারা রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার লক্ষণ খুঁজে পেতো এই কারণেই বনভোজনে গোয়েন্দা পুলিশ প্রেরণ।[২৪৫] পাকিস্তানি প্রশাসন যন্ত্রের কর্মতৎপরতার চিত্র এখানে সুপরিস্ফুট।

...আপনার পরিচয় পেয়েছি আপনার কর্মে। উপলব্ধি করেছি যে আপনি সর্বদর্শী এবং সর্বত্রগামী। বুঝেছি আপনি বুদ্ধ–যিশু–কৃষ্ণের পরমাত্মীয়।[২৪৬]

২৪০. মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, আপনি কে, পৃ. ৩৪৬
২৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬
২৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬
২৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬
২৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৭
২৪৫. জিয়াউল হাসান, মুনীর চৌধুরীর নাটক, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ১১৯
২৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

৩২

বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ইতিহাসে 'একতলা-দোতলা' একাঙ্ক নাটকের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান টেলিভিশন থেকে প্রচারিত এটি প্রথম নাটক।[২৪৭] স্বল্পায়তনবিশিষ্ট এই নাটিকার মধ্যে নাট্যকার পূর্ব-পশ্চিম দুই মেরুর অধিবাসীকে এক বাড়িতে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন। নাটিকার চরিত্রসমূহ হলো--বশীর, দুলাভাই, আয়েশা এবং আপা। নাট্যকার কৌতুকাবরণে সমাজের অসঙ্গতিকে সমুপস্থিত করেছেন সুকৌশলে। তাঁর অধিকাংশ একাঙ্কিকাতেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অসঙ্গতি উপস্থাপিত হয়েছে। দোতলার অবাঙালি মেয়েটির সঙ্গে একতলার বাঙালি ডাক্তারের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। একদিন এক অপরিচিত পড়শী মিস আয়েশা গবেষণা কর্মের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ডাক্তারের কাছে এলে মেয়েটি ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠে। সে ওপর থেকে মুগুর, হামান দিস্তা, খড়ম ইত্যাদি সহকারে অসহনীয় শব্দ সৃষ্টি করতে থাকে। ডাক্তার এর পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্য প্রথমে টেপ রেকর্ডারে জীবজন্তুর চীৎকার বাজায়, পরে দুরমুজ দিয়ে নিচ থেকে ছাদে আওয়াজ করতে থাকে। কিন্তু এরপরও দোতলার শব্দ থেমে না গেলে ডাক্তার দুরমুজের মাথায় পটকা বসিয়ে ছাদ বরাবর তাক করে ফোটাতে থাকে। এক পর্যায়ে মৃদু সঙ্গীতধ্বনির মধ্য দিয়ে পর্দা নেমে আসে। দুই প্রদেশের বাসিন্দার প্রেম, আপাত বিরোধ, সংঘাত শেষ পর্যন্ত মিলনের মধ্য দিয়ে নাটিকাটির যবনিকাপাত হয়েছে।

মুনীর চৌধুরী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা সবসময় তার অন্তর্লোকে ক্রিয়াশীল ছিল। 'একতালা-দোতালা' একাঙ্কিকার স্বল্পপরিসরেও পূর্ব-পশ্চিমের সংঘাত ও বাঙালিদের বিজয়ের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে—

> দুলাভাই।। সাবাস, সাবাস জোয়ান। বাঙালির মুখ রক্ষা করেছে। এই ত চাই। কেবল মুখ বুঁজে সহ্য করো বলেই, ওদের সাহস এত বেড়ে গেছে।
>
> বশীর।। থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে আমরাও জানি।
>
> দুলাভাই।। জানতেই হবে। না জানলে টিকে থাকবে কি করে? চুপ করে সব মেনে নাও বলেই ওরা ভাবে আমরা ভীরু দুর্বল। রুখে দাঁড়াও দেখবে সব ঠাণ্ডা।[২৪৮]

এ সংলাপে ৭১-এর পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় বললে বোধহয় ভুল হবে না। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ স্পষ্ট রূপ নেয়। বলা বাহুল্য, মুনীর চৌধুরী এ-চেতনা ধারণ ও লালন করেছিলেন বললে অতুক্তি হবে না।[২৪৯]

---

২৪৭. একতালা-দোতালা নাটিকার রচনাকালও টেলিভিশনে প্রচারকাল ১৯৬৫ সালের মার্চ মাস। মুনীর চৌধুরী বিদেশে অধ্যয়নরত আনিসুজ্জামানকে এক চিঠিতে জানান, আমার একটি হাসির নাটিকা একতালা-দোতালা টেলিভিশনে হলো। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম টেলিভিশন নাটক। বেশ উপভোগ হয়েছিল। আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী, ১৯৭৫, পৃ. ২৭-২৮

২৪৮. মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, একতালা-দোতালা, পৃ. ৩৫৮

২৪৯. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৩৩

'মিলিটারী' একাঙ্কিকার রচনাকাল ১৯৫০ সাল। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে একাঙ্কিকার কাহিনী বিন্যাস। কারফিউ'র সুযোগে একদিকে মুসলমান গুণ্ডাদের অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, অপরদিকে হিন্দু তরুণী ও মুসলিম তরুণের হৃদয় বিনিময়ের রোমান্টিক কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

দাঙ্গা কবলিত শহরে সান্ধ্য আইন জারি করা হলেও এক মুসলমান তরুণ সাংবাদিক আসে তার প্রেমিকা হিন্দু তরুণীর বাড়িতে প্রেম নিবেদন করতে—

> তরুণ। দিক্ বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে।
>
> মেয়ে। ...তাই বলে এত রাতে? কারফিউর মধ্যে? দাঙ্গাকে ভয় পাওনা মানলাম—কিন্তু তাই বলে মিলিটারীকে? শুনেছি শহর এখন মিলিটারীর হাতে। কারফিউর পর রাস্তায় কাউকে নড়তে চড়তে দেখলে ওরা নাকি সঙ্গে সঙ্গে গুলী ছোড়ে।[২৫০]

দেশের এই সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দু তরুণী আর মুসলমান তরুণের হৃদয়-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। তরুণীটি তরুণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে—

> ...তোমার আমার সমাজ আলাদা, জগৎ আলাদা, স্বভাব, প্রবণতা সব আলাদা এসব কথা আমি কেন বুঝতে চাইব? ধীরে সুস্থে এগুলো দরকার, অপেক্ষা করা উচিত, নইলে কারো মঙ্গল নেই। আমার বাবা আত্মহত্যা করতে পারেন। তোমার চাকরি খোয়া যেতে পারে।[২৫১]

দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কারফিউ কোনোটিই তাদের সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি, তরুণীটি শেষ পর্যন্ত সান্ধ্য আইনের ভয়াবহতার মধ্যেও ঘর থেকে পালিয়ে যায়। তরুণীদের ঘরের পাশেই সবার অজান্তে আর একটি ঘটনা ঘটে চলে—দুই মুসলমান গুণ্ডা মিলিটারীর চোখে ধুলো দিয়ে হিন্দুর দোকানে অগ্নি সংযোগের চেষ্টায় লিপ্ত হয়—

> ...ল, দেশলাই, ঠিক বইরা ল। আমি দোকানের তিন মুড়া ত্যাল ঢাইলা বাইর অইয়া চইলা যামু। তুই লগে লগে আগুন লাগাইয়া কাইটা পড়বি।[২৫২]

দেয়াশলাইয়ের অভাবে অগ্নিসংযোগ সম্ভব হয় না, টহলরত পুলিশ এসে তেলের টিনটা নিয়ে যায়। মুসলমান গুণ্ডাদের কপালে করাঘাত করে বাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়েই একাঙ্কিকার যবনিকাপাত—

---

২৫০. আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড,মিলিটারী, পৃ. ৩৬৬

২৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭

২৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদ। শালারা কওমের খেদমত করবার দিল না।[২৫৩]

মিলিটারীতে কমিক রসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সমাজ, বিশেষত এক শ্রেণীর স্বার্থপর মুসলমানের হিংসাত্মক কার্যক্রম সম্পর্কে তির্যক সমালোচনা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার তৎপরতা। তবে এ একাঙ্কিকার মূলসুর বা প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে উদার মানবিকতা, যা হিন্দু-মুসলমান দুই যুবক-যুবতীর মিলন দৃশ্যের মাধ্যমে বিধৃত।[২৫৪]

৩৪

পলাশীর ব্যারাক ও অন্যান্য'র শেষ একাঙ্কিকা 'বংশধর'-এর রচনাকাল ১৯৬৭ সাল। মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন কাহিনী নিয়ে নাটকের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে। এই নাটিকার চরিত্রগুলি হচ্ছে—বাবা, তরুণ সাংবাদিক আশরাফ, পুলিশ অফিসার, দমকল বাহিনীর দু'জন কর্মী, মা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আমেনা। এ নাটকের প্রধান বিষয় হলো তরুণ সাংবাদিক আশরাফের সাথে প্রতিবেশী শিক্ষিতা আমেনার প্রণয় এবং পাশাপাশি আছে খাদ্যান্বেষী দুর্বৃত্ত এক বাঁদরের উৎপাত। নাটকের সমাপ্তিতে বাঁদর ধরা পড়ে, আশরাফ-আমেনার প্রেম পরিণতি লাভ করে।

কাহিনীর শুরুতেই গৃহকর্ত্রী স্বামীকে বাঁদরের আচার-আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন—

মা। সকালে-বিকালে-দুপুরে, যখন পারছে তখনই লাফিয়ে ঢুকে পড়ছে। ওই বজ্জাতের আবার সময়-অসময় আছে নাকি?[২৫৫]

বাবা বাঁদরের আচার-আচরণে ক্ষেপে ওঠেন দরজায় করাঘাত শুনে বাঁদর ভেবে লাঠি হাতে ছুটে যান, কিন্তু প্রবেশ করে আশরাফ—

আশরাফ। ঠিক এই রকম সম্বর্ধনা লাভের জন্য তৈরি ছিলাম না। খালুজান কি সত্যি-সত্যি আমাকে—

বাবা। না না তোমাকে নয়। আমি ভেবেছিলাম বাঁদর।

আশরাফ। বাঁদর। যাক বাঁচা গেল। তা বাঁদর না হই বাঁদরের বংশধর ত বটেই।[২৫৬]

মধ্যবিত্ত পরিবারের মা মেয়ের পছন্দকে মেনে নিলেও বাবা আশরাফের সাংবাদিকতা পেশাকে মেনে নিতে নারাজ। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত—

---

২৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪
২৫৪. পূর্বোক্ত, জয়নুদ্দীন, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, প. ৮৮
২৫৫. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড ১৯৮১, বাংলা একাডেমী, বংশধর, পৃ. ৩৭৮
২৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১

Dhaka University Institutional Repository

> সাংবাদিকের সাথে আমি আমার মেয়ে বিয়ে দেব? লেখাপড়া শিখে রাতদিন টো টো করে পরের হাঁড়ির খোঁজ-খবর করে বেড়াবে এ আমার পছন্দ নয়।[২৫৭]

সম্প্রতি বাঁদরটি এক ব্যবসায়ীর গতি থেকে হাজার টাকার বাণ্ডিল চুরি করে করে নিয়ে গেছে। আশরাফও তারই খোঁজে প্রেমিকার বাসায় এসে উপস্থিত হয়েছে—

> শুনতে প্রথম হয়ত খুব হাস্যকর শোনাবে। তবু সত্যি বলছি, বিশ্বেস করুণ আমিও একটা বাঁদরের খোঁজে এসেছি।[২৫৮]
>
> ....
>
> আশরাফ। ...সমস্ত শহরময় হৈ চৈ পড়ে গেছে। পুলিশের লোক, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি, জনতা সব ঐ বাঁদরের তল্লাশে বেরিয়ে পড়েছে।[২৫৯]

শেষ পর্যন্ত আশরাফের সহযোগিতায় তারা বাঁদরটিকে ধরতে সক্ষম হয়, কিন্তু তল্লাশকারী পুলিশ ও দমকল বাহিনীর লোক এসে ধৃত বাঁদরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আশরাফও সাহস করে আমেনার মা-বাবার কাছে মনের গোপন কথাটি ব্যক্ত করে—

> সত্যি কথা বলতে কি, রোজই প্রায় ঠিক করি আমি যে, আইজই বলব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি না। আমার কৈশোর থেকে অতি চেনা এই পরিবেশে, আপনাকে, খালুজানকে একটা প্রস্তাবের কথায় টেনে নিয়ে আসার সাহসই হতো না। কেমন যেন নাটুকে এবং অস্বাভাবিক মনে হতো। কিন্তু আজকের এই সম্পূর্ণ এক অবাস্তব পরিবেশের মধ্যে পড়ে আমার প্রত্যহের সংকোচ কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভেঙ্গে চুরে গেছে। মনে হচ্ছে, বললে এখনই বলা সংগত। ...খালাম্মা দোয়া করবেন। আপনার স্নেহ, ভালোবাসা থেকে যেন কোনো দিন বঞ্চিত না হই।[২৬০]

আশরাফের প্রস্তাবে বাবা-মার সম্মতি মেলে, কমেডি একাঙ্ক নাটকেরও সমাপ্তি ঘটে। একটি বাঁদরের উৎপাতে পুলিশ ফায়ার ব্রিগ্রেডের লোকজন, জনতা সবাই উত্যক্ত। কে এই বাঁদর? বাঁদরটির যথার্থ পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়নি। বাঁদরটি কি ছদ্মবেশধারী রাজনৈতিক কর্মী অথবা কেউ?

৩৫

হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে রচিত মুনীর চৌধুরীর ক্ষুদ্রতম একাঙ্কিকা 'একটি মশা'। নাট্যকার ভূমিকায় সময় সম্পর্কে বলেছেন--সে যুগের খবরের কাগজে সাধারণত মানুষের জন্য একটি খবরই সবচেয়ে

---

২৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯
২৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১
২৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৩
২৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

Dhaka University Institutional Repository

বেশি ছাপা হত—হিন্দু মানুষ আর মুসলমান মানুষ সুযোগ পেলেই পরস্পরের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত চুষছে।[২৬১] ঘটনাস্থল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা, বিষয়বস্তু কিছুটা রূপকধর্মী—একটি মশার দংশনকে সাম্প্রদায়িক অর্থে প্রয়োগের অদ্ভুত প্রবণতা।

নাট্যকার মশার রূপকের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার রূপটি তুলে ধরেছেন—

নবাব। ...এ মশাগুলো যে শুধু তোমার বাপের বাড়ির নয়, তাই নয়। এর বদ খাসলিয়তগুলো আরো গভীর কোনো কারণবশত জন্মেছে। এখানকার মশাগুলোর এই রক্ত চোষা মানুষ খেকো প্রবৃত্তিটা নিশ্চয়ই এখানকার স্থানীয় কোনো প্রাকৃতিক বিকৃতিরই রূপ।

ভাবী। তারপর?

নবাব। নিশ্চয়ই একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য এটা। বুঝলে ভাবী, আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম, তোমায় যে-মশাটা এমন একটা নৃশংস কুটুস কামড় দিয়েছিল, ওটা নিশ্চয় নিশ্চয় জাতে হিন্দু মশা হবে। হিন্দু না হলে তোমাকে ও-রকমভাবে কেউ আক্রমণ করে।[২৬২]

মিনু নবাবের কথায় হেসে কুটিকুটি হলে সে তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছে। নবাবের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার একজন মুসলমানকে হিন্দু মশা আক্রমণের তির্যক বিদ্রূপ করেছেন—

নবাব। ...মা হল প্রধাণত মুসলমান, তারপর মেয়েলোক, তারপর মানুষ, তারপর হ'ল কিনা মা। এই তো দেখ এখন, ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার হয়ে গেল, এখন আর আমার কথায় হাসি পাওয়া তোমার বাবার মতে উচিত নয়। হিদু মশা, তার জাত ভাই বলে পাশের বাড়ির ঐ চর্বির তৈয়ের বাড়ুয্যে গিন্নিকে রেহাই দিলেও তোমার মাকে আক্রমণ করতে কোনো কসুর করবে না। এটা একটা খুব বিপদ এবং ভয়ের কথা, হাসির কথা নয়, বুঝলি।[২৬৩]

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে দেবর-ভাবির সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা গোটা একাঙ্কিকায় বিদ্যমান থাকলেও নাট্যকারের গভীর মানবতাবাদী জীবনচেতনা প্রকাশে বিঘ্ন ঘটেনি।[২৬৪]

৩৬

'নেতা'[২৬৫] মুনীর চৌধুরীর গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত একাঙ্কিকাসমূহের অন্তর্গত একটি একাঙ্কিকা। ইতিপূর্বে তিনি 'কবর' নাটিকায় এ ধরনের বিবেক বর্জিত নেতাদের সাক্ষাৎ ঘটাবার সুযোগ দান করেছেন। নেতা' নাটিকার

---

২৬১. মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, একটি মশা, পৃ. ৩৯৫
২৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৬
২৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭
২৬৪. মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫
২৬৫. নেতা, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (১ম খণ্ডে) মুদ্রিত হয়। শিরোনাম যুক্ত প্রথম পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি বলে উক্ত রচনাবলীর সম্পাদক আনিসুজ্জামান-এর নামকরণ করেন নেতা

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তু মুসলিম লীগ নেতাদের অন্তর্বিবাদ ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ঘটনাকাল সম্ভবত পঞ্চাশের দশক। এর মধ্যে চিত্রিত হয়েছে পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দলীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সংক্রান্ত কোন্দল, অত্যধিক মদ্যপান ও নারী আসক্তি এবং এদের রাজনৈতিক অসারতা।

নেতা নাটিকায় কৌতুক ও ব্যঙ্গরসের মধ্য দিয়ে তাদের চরিত্রের কুরুচিপূর্ণ উৎকট আচরণ তুলে ধরেছেন—

রুহুল। তোমাদের এসব নয়া রাজনীতির হাদিস-ফেকা। আজকে কাউন্সিল মিটিং তাই আজকে আমার বরাদ্দ বোতল বন্ধ। কারণ, তোমার মতে কাউন্সিল মিটিং হলো সজাগ বুদ্ধির লড়াই-পরীক্ষা। কালকে জনসভা, কাজেই তোমার নির্দেশ হবে আজ রাতেও আমি যাকে খুশী তাকে ঘরে ডাকতে পারব না। কারণ তোমার মতে একা একা নিশি যাপন করলেই আমার নয়ন-বদন ফুঁড়ে নূরাণী রোশনাই বেরুবে যা দেখে বেকুব হয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলবে[২৬৬]

মুসলিম লীগ নেতাদের সভাপতি নিয়ে কোন্দল নাট্যকার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন—

রুহুল। একশবার আছে। তুমি আমায় চটিও না হক। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আমি হবু সভাপতি। সেই প্রতিষ্ঠানের মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট কোথায় রাত কাটায় সে খোঁজ নেয়ার অধিকার আমার আছে।[২৬৭]

হক ও রুহুলের সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের স্বরূপ তুলে ধরেছেন—

হক। নয়া রাজনীতি। আরম্ভেরও আগে আরম্ভ আছে। বিকেলে জনসভা, কিন্তু তার আগে রাতে কাউন্সিল মিটিং। তারও আগে বিশিষ্ট নেতৃবর্গের ঘরোয়া বৈঠক। তারও আগে এক এক করে নেতায় নেতায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিভৃত আলাপ। সেই কেস্‌সার একেবারে গোড়ায় মাওলানা কোরেশীর আবির্ভাব। বাকী সবাই নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে এসে জুটবেন।

রুহুল। সারারাত ধরে এ কাজেও সুতো টেনেছ নাকি?

হক। ... তবে বুনটের আসল নকশা আপনার হাতে। যেমন চালাবেন তেমনি হবে। মুন্সী কোরেশীর খুঁটি, প্রতিষ্ঠানের জন্ম থেকেই, উনি তার সভাপতি বলে বলে এতদূর এসেছেন। আর আপনার তরফে আসল জোড়ে আপনার হালের সরকারী ক্ষমতা। বুঝে শুনে মাকু চালাবেন। তবে আমার মনে হয় আগে-ভাগে কোরেশী সাহেবকে বুঝতে না দেয়া যে এইবার আপনি নিজেই সভাপতি পদের জন্য—[২৬৮]

নেতাদের মদ্যপান ও ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র তুলে ধরেছেন—

---

২৬৬. মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (১ম খণ্ড), নেতা, পৃ. ৪০৫

২৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৬

২৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৭

Dhaka University Institutional Repository

রুহুল। আপনার মুখ থেকে সে কথা উঠলে কারো মনেই আর কোন প্রশ্ন জাগবে না। আর আপনি যাতে মূল সভাপতি হন তার প্রচার আমি চালাব। তবে কাউন্সিল মিটিং-এর আগে পর্যন্ত প্রকাশ্যত আমরা পরস্পরের বিরোধী যেমন ছিলাম।

কোরেশী। বেশ তোমার সরকারী ক্ষমতা যাতে অটুট থাকে পার্টি থেকে তার ব্যবস্থা আমি করবো।[২৬৯]

....

রুহুল। ... শুকনো ভিটেতে পাকা কাজ হয় না। গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে কি খুব ক্ষতি হয়ে যাবে? এরকম একটা শুভ সংকল্পের মুখে না হয় একটু পুরোনো নিয়ম না হয় একটু ভাঙলে।

কোরেশী। আজ ভোর রাত থেকেই তুমি আমার নিয়ম সংযম ওলট-পালট করে দিচ্ছ। গত দশ বছরের মধ্যে সূর্যাস্তের আগে জোয়ান মেয়েছেলে নিয়ে কোনদিন এত আলোচনা করিনি।

রুহুল। ধুয়ে ফেলুন। এক গ্লাস ঢেলে দিয়ে একেবারে সাফ করে ফেলুন।

কোরেশী। সবটা গিয়ে জমবে পেটের মধ্যে। দাপাদাপি শুরু করবে সারা শরীরে। রাস্তায় বেরুব কোন সাহসে? যাকে তাকে যদি, হয় তখন?—কিম্বা ইরান-তুরানের হরিণ (দেখে) রঙ্গটাও বড় খাসা।[২৭০]

মিসেস ফিকরী খানমকে মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্য প্রতিষ্ঠানের নতুন নেতা হাফিজ সাহেবের প্রতিবাদ—

> আমি আমার এই মুষ্টিবদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে এই গৃহ ত্যাগ করছি। জবাব কাউন্সিল মিটিং-এ দেবো। কিন্তু মনে রাখবেন মিসেস ফিকরী খানমকে মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট আমি বানাবো, বানাবো, বানাবো।[২৭১]

'নেতা' পঞ্চাশ দশকে রচিত একাঙ্ক নাটক। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দুটি দলের যে বিবাদ, তাকে কটাক্ষ করেই মুনীর চৌধুরী নাটকটি লিখেছেন। নাটকটির চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সমসাময়িক মুসলিম লীগ নেতাদের স্মরণ করেছেন। হাজী রুহুল করিম (দেশবরেণ্য নেতা, মুল্লুকের একজন প্রধান চালক), নাজিমুল হক (রুহুল করিমের প্রাইভেট সেক্রেটারী), মুন্সী কোরেশী (দেশের বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট), হাফিজ সাহেব (উক্ত প্রতিষ্ঠানের নতুন নেতা), মিসেস ফিকরী খানম (উক্ত প্রতিষ্ঠানের মহিলা শাখার নতুন প্রেসিডেন্ট)। দেশ ও দশের কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে তৎকালীন নেতারা ব্যক্তিস্বার্থ ও লালসা চরিতার্থ করার নিমিত্তে সদাব্যস্ত ছিলেন। নাট্যকার 'নেতা' নাটকে এসব মুখোশধারী নেতা-

---

২৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১২
২৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১২
২৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৮

Dhaka University Institutional Repository

নেত্রীদের ভণ্ডামির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। কখনো বা তিনি সরাসরি এদের আক্রমণ করেছেন, আবার কখনো রূপকের মাধ্যমে এসব চরিত্রের অন্তরের সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

৩৭

'গুণ্ডা' নাটিকার প্রেক্ষাপট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্বাচন। কিন্তু এর নেপথ্যে রয়েছে এক জোড়া নর-নারীর হৃদয়ঘটিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত। একাঙ্কিকাটি পুরুষ চরিত্র বর্জিত, কেবলমাত্র পাঁচটি নারী চরিত্রের উপস্থিতি আছে। আনোয়ারা ওরফে আনুর সঙ্গে আলমের ভালোবাসার অভিমান বাসা বাঁধলে নির্বাচনে আলমকে ভোট না দেবার জন্য আনু হোস্টেলের ছাত্রীদের প্ররোচিত করে। এদিকে গুণ্ডা পরিচয়ধারী আলমের ছোটবোন আলমের ছদ্মবেশে আনুর কক্ষে প্রবেশ করে আনুর অভিমান ভঙ্গ করে এবং ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে—

আনু : বলেছিলেন আমার সুখ শালগমের মত—ঠোঁটকাতলা মাছের মত—মন গোখরা সাপের —

আলম : (দু' ধমক হেসে) আরে ওসব কথা এখনও মনে করে বসে আছ নাকি?

আনু : স্মরণ শক্তি আমার যখন তখন দুর্বল হয় না বলে মনে থেকে যায় ওসব কথা।

আলম : (কোন রকমে হাসি গিলে) ওসব কথা তুমি বিশ্বেস করলে?

আনু : তোমার কথা অবিশ্বাস করার অভ্যেস আমার নেই।

আলম : ছিঃ ছিঃ। ওসব কি আর তোমাকে বলেছিলাম নাকি? ওসব বলেছিলাম কতগুলো অন্য ছাত্রকে, যারা তোমাকে হয়ত কোন কারণে সহ্য করতে পারে না—যারা তোমার নিন্দা শুনলে খুশী, যারা তোমার নিন্দা আমার মুখে শুনলে আরো খুশী হয়—যারা খুশী হলে আমি ভোট আরো বেশি পাই।

(বলতে বলতে লোকটা হাসির আবেগে ঝুঁকে পড়ল)

আনু : সত্যি। সত্যি, তাহলে তুমি ওসব কথার একটু মন থেকে বল নি?

আলম : সত্যি নয়ত মিথ্যা না কি?[২৭২]

তারপর আলমরূপী গুণ্ডা হাসিতে ফেটে পড়ে। ছদ্মবেশ খুলে ফেলে আনুর হাতে আলমের চিঠি গুঁজে দেয়। আনু সব অবগত হয়ে লজ্জায় বালিশে মুখ লুকায় এবং নাটিকার সমাপ্তি ঘটে। মুনীর চৌধুরীর অধিকাংশ নাটকের প্রেক্ষাপটই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে।

---

২৭২. মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, গুণ্ডা, পৃ. ৪৩২-৪৩৩। গুণ্ডা, চল্লিশের দশকের রচনা। মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ডে এটি প্রথম মুদ্রিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮

তৎকালীন মুসলিম সমাজ-জীবনের অনগ্রসরতা, পর্দানশীলতা, পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে রক্ষণশীলতা নাট্যকার মুনীর চৌধুরী বেশরিয়তি[২৭৩] একাঙ্ক নাটকে তার প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। প্রাচীন প্রথাগত সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙ্গে তরুণ-তরুণীর হৃদয়বৃত্তির মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁর বেশরিয়তি রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ এবং এ নাটিকায় নতুন প্রজন্মের প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার বিজয় ঘোষিত হয়েছে।

বিত্তবান রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে লায়লাকে তার পিতা 'বেহায়া, বেআব্রু, বেশরম[২৭৪] না হওয়ার জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না পাঠিয়ে বিশেষভাবে পর্দার মধ্যে রেখে গৃহ শিক্ষক জাফরকে দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। জাফর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেধাবী তরুণ, প্রগতিশীল ও প্রাবন্ধিক। শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে পর্দার আবরণ থাকলেও একে অপরের হৃদয়ের উষ্ণ আবেগ মিশ্রিত ভালোবাসার দাবীকে অস্বীকার করতে পারেনি। কড়া মেজাজী সংকীর্ণ চিত্ত পিতার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে শরিয়তের দেয়াল ভেঙ্গে লায়লা-জাফর কাছাকাছি চলে এসেছে—

লায়লা। দৌড়ে ছুটে এলাম ঘরের বাইরের দরজায় পর্দার ফাঁক দিয়ে আপনাকে দেখবো বলে।

জাফর। গরাদের ফাঁক দিয়ে যেমন করে চিড়িয়াখানায় খাঁচাবন্দী বাঘ দেখ, তেমনি করে না?[২৭৫]

লায়লা। তাহলে আমাকে দেখতে হয় এক ফাঁকে লুকিয়ে দেখে নেবেন। আব্বার কাছে না বললেই আর ভয় নেই— চাকরি যাবে না।

জাফর। তোমাকে দেখতে হলে ফাঁকি দিয়ে চুপ করে এক নজর দেখে লুকিয়ে পড়ার মত ভীতু তোমার জাফর ভাই নয়। দু'হাত দিয়ে তোমার মুখ উঁচু করে দু' চোখ মেলে দেখবার মত সাহস তার আছে লায়লা।[২৭৬]

নাট্যকারের ব্যক্তি জীবনের প্রগতি-চেতনা, উদার-শিক্ষা ও শিল্পমানসের সাহসী প্রতিফলন বেশরিয়তিকে করেছে সমৃদ্ধ।[২৭৭]

---

২৭৩. বেশরিয়তির রচনাকাল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ, প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৫৪। দ্রষ্টব্য : মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১১

২৭৪. মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, বেশরিয়তি, পৃ. ৪৪১

২৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯

২৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪০

২৭৭. পূর্বোক্ত, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৩৯

আ. ন. ম. বজলুর রশীদের 'একে একে এক'[২৭৮] নাটকটি আধুনিক সমাজ জীবনের পটভূমিকায় রচিত। কাহিনী সংগ্রন্থনে কোনো নতুনত্ব নেই, একে একে এক 'ঝড়ের পাখী' নাটকেরই অনুবর্তন বলা যায়। আধুনিক সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও ভোগ বিলাসের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ নাটকে।

আদর্শবাদী রহমান সাহেব শিক্ষকতা আর জ্ঞানের চর্চা করে দিন কাটান, মাঝে মাঝে বই লিখে আত্মপ্রকাশ ঘটান। তার স্ত্রী নাজমা, দুই পুত্র ও কন্যা মীরা তার আদর্শকে অনুসরণ করেনি, তারা তথাকথিত সমাজ স্রোতে গা ভাসিয়ে আধুনিক জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে। স্ত্রী নাজমা স্বামীর এই সাধারণ জীবনযাত্রা মেনে নিতে পারেনি। প্রতিনিয়তই সংঘাত বেঁধেছে—

নাজমা: সেই আনন্দেই মেতে থাকো, আর প্রকাশকরা তোমার বই বিক্রি ক'রে লাল হোক, তুমি যে অন্ধকারে, সেই অন্ধকারেই...

রহমান। ... একে তুমি অন্ধকার বলো নাজমা? স্বচ্ছলভাবে সংসার চলে যাচ্ছে। প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে গেলেই সে অর্থ অনর্থের সৃষ্টি করে। সরল, সহজ এবং সাধারণ জীবনেই সে উচ্চ চিন্তা এবং ধ্যান-ধারণা সম্ভবপর। যে জীবন জটিল, বিলাসী, সে জীবন বন্ধ্যা এবং অলস।[২৭৯]

একমাত্র কন্যা মীরা সেও পিতার আদর্শকে গ্রহণ করেনি, বয়ফ্রেন্ড আমেদকে নিয়ে রুচিহীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আদর্শবাদী ডাক্তার করিমকে সে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি, বাসররাতেই স্বামীকে ছেড়ে ভোগসর্বস্ব বয়ফ্রেন্ড আমেদের কাছে ছুটে এসেছে—

মীরা। বাঁচলাম। কেন যে গিয়েছিলাম মরতে ঐ বদ্ধ পরিবেশে।

আমেদ। আমার কথা শুনলে তোমাকে আর রিপেন্ট করতে হতো না।

মীরা। কি করবো বলো। বাবা-মা উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। ভাল ঘর ভাল খানদান, ভাই রিভলভার উচিয়ে রইলো।

আমেদ। অল রাইট। খানদানি এখন এই সিগারেটে, চা'য়ে, ককটেইল ড্রিংকে আর তোমার রঙ-করা ঠোঁটে।[২৮০]

বহুবল্লভ আমেদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মীরার কাছে, আভিজাত্যের মোহ কেটে গেছে, চোখ থেকে আধুনিকতার রঙিন চশমা খুলে গেছে—

---

২৭৮. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, একে একে এক, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯। 'একে একে এক' আ. ন. ম বজলুর রশীদের পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। এ নাটকের একটি বিশেষত্ব এই যে, আধুনিক সমাজের উগ্র সভ্যতাকে উপজীব্য করে এখানে নাট্যকার ইরানী সূফী কবি শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তারের অন্তরতম জীবনের একটি রূপক কাহিনীর রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। 'প্রিয়তমের জন্য প্রেমিকের আত্মবিলোপ' মূর্ত কাহিনীর পটভূমিতে এ নাটক ব্যাখ্যাত হয়েছে। (ভূমিকা, একে একে এক)

২৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

২৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

মীরা। যে কালচারের গর্ব করেছি, তার বীভৎস রূপ চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

আমেদ। তুমি আর কচি খুকিটি নও। জেনে শুনেই এ পথে পা দিয়েছো। এ জীবনে তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই—আছে শুধু বাইরের চাকচিক্য, চাঞ্চল্য আর জোরে চলার নেশা।

মীরা। কি ভুল করেছি।

আমেদ। ভুল করেছো? তা ঠিক। ভুল করেই লোকে মদ খায়। তারপর নেশা একবার পেয়ে বসলে ভুল জেনেও ভুলের পথে সে চলতে থাকে অবাধে, সজ্ঞানে। কিন্তু এত শীগ্‌গিরই তোমার নেশা ছুটে গেল।[২৮১]

নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে স্বামীর কাছে ফিরে এসেছে, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকাপাত।

আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতা, বাইরের চাকচিক্য, শালীনতাহীনতা, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা—এগুলোকে নাট্যকার সুতীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্রূপ করে দেখিয়েছেন এতে কেবল অনিষ্টই হয় কোনো লাভ হয় না, নাট্যকার দবিরের মুখ দিয়ে চমৎকারভাবে সেই সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ তুলে ধরেছেন—

দবির। মন? মন আছে নাকি তোমাদের? জৌলুসই শুধু দেখে বেড়াও। মনের দিকে নজর দেবার ফুসরত আছে? এই যে আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে। ...বিয়ের রাতেই স্বামীকে ছেড়ে এসেছে। সারা শহর ছি ছি করছে। দোষ হয়েছে শিক্ষিতা মেয়েদের। শিক্ষার দোষ নেই, দোষ অবাধ মেলামেশার। অনায়াস নেশার আধিক্য,—নাইট ক্লাব, বিকৃত যৌনবোধের সস্তা আর চটুল আবেদন, আধুনিক সভ্যতার এই অভিশাপই এর জন্য দায়ী।[২৮২]

আধুনিক সমাজ জীবনের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে মানুষের জীবন কিভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে নাট্যকার 'একে একে এক' নাটকে তা' চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এ নাটকে আধুনিক সমাজ জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা—অতি আধুনিকতা—স্বেচ্ছাচারিতা সুপরিস্ফুট।[২৮৩]

এ নাটকে কাহিনীর দ্রুতগামিতায়, চরিত্রসৃষ্টিতে সফল হলেও নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত এখানে অনুপস্থিত। বস্তুত, নাটক হিসাবে 'একে একে এক' দুর্বল হলেও সামাজিক চিত্র পরিস্ফুটনে নাটকটি সার্থকতার দাবিদার।

৪০

নুরুল মোমেনের 'শতকরা আশি' নাটকটি নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর রচিত একাঙ্ক নাটক। সরকারি নিরক্ষরতা দূরীকরণ সপ্তাহ (১৯৬৭) উপলক্ষ করে এটি প্রণীত হয়েছে। এ নাটকে অধ্যাপক আলিম ও

---

২৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

২৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

২৮৩. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৯

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপিকা নাহার নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। নিরক্ষরতা প্রতি প্রদক্ষেপে মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তাই বিদ্যা এবং জ্ঞান প্রয়োজন। এ নাটকে নায়ক আলিম দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছে—

> আমাদের দেশে নিরক্ষর রয়েছে শতকরা আশি জন। অথচ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই শতকরা আশি জনের বেশি অক্ষরপ্রাপ্ত রয়েছে। আমাদের দেশে এই যে শতকরা মাত্র কুড়ি জন শিক্ষিত এটা আমাদের গভীর লজ্জার বিষয়. আরো লজ্জার কথা এই যে এই কুড়ি জনের মধ্যে চৌদ্দ–পনের জনই কোনোক্রমে নাম লিখতে পারে, বাকি কয়েকজন শুধু সত্যিকারভাবে লিখতে পড়তে জানে।
>
> ....
>
> শুধু তাই নয়. এমন লোকও আমাদের সমাজে রয়েছে, যারা বিত্তশালী অথচ নিরক্ষর, তারা আবার তা' নিয়ে বড়াইও করেন, মোকাম্মেল মোল্লার মত।[২৮৪]

নিরক্ষরতার উপর কাগজে লিখিত প্রতিবেদন শুনে মোকাম্মেল মোল্লা রুষ্ট হয়ে প্রতিবাদ জানান। তার মতে—

> লোকের নিরক্ষর থাকাটা এমনকি মন্দ কাজ যার জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইবে। আমি একজন গ্রাম্যলোক, আল্লার মরজীতে নিরক্ষর রহিয়াছি। আল্লার মরজীতে বলিলাম এই জন্যে যে আমি নিরক্ষর থাকায় আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আমি ঠিকভাবে ব্যবসা–বাণিজ্য করিতেছি, বাড়ীতে টিনের ঘর দিয়াছি, পুকুর কাটাইয়াছি। এবং ইন্‌শাআল্লাহ্‌ একটি মসজিদও দিব আশা রহিয়াছে।[২৮৫]

এই নিরক্ষরতা নিয়ে যে আন্দোলন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে প্রয়াস সে কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের দ্বিতীয় প্রকল্প হচ্ছে—

> যদি আপনারা আপনাদের নিরক্ষর চাকর ড্রাইভারকে বলেন, যে তারা যদি এক মাসের মধ্যেই লেখাপড়া শিখে ফেলে তাহলে মাইনে বাড়িয়ে দেবেন, তাহলে দেখবেন সেটা খুব কার্যকরী হচ্ছে এবং দুর্দ্দান্ত ফল লাভ হচ্ছে।[২৮৬]

এ নাটকের আখতার সাহেব একজন সমাজসেবী হিতৈষী ব্যক্তি। তার ছোট ভাই অধ্যাপক আলিম ও আখতার সাহেবের বন্ধু নাসের সবাই নিরক্ষরতা দূরীকরণে এগিয়ে এসেছে। অধ্যাপিকা নাহার এদের সাহায্য সহযোগিতা করেছে। কেবলমাত্র বিরোধিতা করেছে বিত্তবান মোকাম্মেল মোল্লা। সে নিরক্ষরতাকে দূষণীয়

---

২৮৪. নুরুল মোমেন, শতকরা আশি, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯, পৃ. ২–৩

২৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

কোনো কিছু মনে করে না। বরং সে নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন শুরু করেছে। নাট্যকার এই নিরক্ষর মোকাম্মেল মোল্লাকে চরম শিক্ষা দিয়েছেন—

মোকাম্মেল। আপনার এই হানে আসতি গিয়া ভুইল্যা যেমন পাশের বাসায় ঢুক্‌ছি, অমনি দুইডা কুত্তায় কুইদ্যা আইসা এমনভাবে ধরলো যে এই দ্যাহেন, পাঞ্জাবীর আতাডা ছিড়্যা ফেলাইছে। জানে মাইর‍্যা ফ্যালাইতো তয় কোনো রকম ছুটি পাইয়া আইসা গেটের দরজা লাগাইয়া বাঁচি।

আখতার। তা আপনি সেখানে ঢুকলেন কেন?

মোকাম্মেল। আমি কি কইর‍্যা জানবো যে ঐ বাড়িতি কুত্তা আছে।

আখতার। বাহঃ গেটের উপর বড় বড় করে লেখা আছে কুকুর হইতে সাবধান।

মোকাম্মেল। তাই লেহা আছে নাকি। কিন্তুক আমি কি কইর‍্যা জানবো যে ঐ কথা লেহা আছে। তয় এট্টা কিছু লেখা দেখছি।

আখতার। ওহ্ আপনিতো পড়তে পারেন না। তাহলে খোদাই আপনাকে বাঁচিয়েছে। তার শুকুর আদায় করুন। আসল খান্দানি অ্যালসেসিয়ান। ধরলে একেবারে ছিঁড়ে ফেলতো।[২৮৭]

মোকাম্মেল মোল্লা দ্বিতীয়বার শিক্ষা পেয়েছে ইলেকট্রিক শক পেয়ে। আখতার ও মোকাম্মেল মোল্লার কথোপকথনে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে নিরক্ষর মোকাম্মেল মোল্লার দুর্দশার চিত্র—

আখতার। বড় বড় করে লেখা ওদিকে যাবেন না, ইলেকট্রিক শক লাগ্‌তে পারে। দেখেন নিতো?

মোকাম্মেল। দেখছি তো কিন্তুক আমি তো লেখাপড়া জানিন্যা।[২৮৮]

মোকাম্মেল মোল্লা দু'বার বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েও তার ভুল ধারণা ভেঙ্গে যায়নি। এবারও সে শিক্ষা গ্রহণে উদ্যোগী হয়নি।

তৃতীয়বার বিপদে পড়েছে বার্ড কোম্পানির টিনের জন্য আর, ফারগুসান কোম্পানিকে চুক্তি করে। দুটো চুক্তিতে অন্তত পনের, বিশ হাজার টাকা লাভ থাকবে। সে নিরক্ষর সে বুদ্ধির জোরে দুটো চুক্তিপত্র খামে ভরে পাঠিয়েছে। তার বুদ্ধির কৌশল সে ব্যাখ্যা করেছে—

মোকাম্মেল। ... চুক্তিপত্র দুটোর মধ্যে বার্ড কোম্পানিরটায় এক দাগ দিয়ে এক নম্বর করলাম, আর ফারগুসান কোম্পানিরটায় দুই দাগ দিয়ে দুই নম্বর করলাম—তারপর এক দাগ ওয়ালা খামে, দুই দাগ দুই দাগ-ওয়ালা

---

২৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

২৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

খামে ভরে পাঠিয়ে দিলাম। লেখাপড়ার কাজ বুদ্ধি দিয়েও চালানো যায়। ঐ দেখুন চিঠির নকলগুলোর উপর তেমনি দাগ দেয়া রয়েছে।[২৮৯]

মোকাম্মেল মোল্লা যেহেতু নিরক্ষর সেহেতু সে ভুল করেছে।

আখতার। ... দেখুন, ফারগুসান কোম্পানির চিঠিটার উপর এক দাগ রয়েছে। আর বার্ড কোম্পানির চিঠিটার উপরে দুই দাগ।[২৯০]

মোকাম্মেল মোল্লা নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। নিরক্ষরতা তার জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। নিরক্ষর মোকাম্মেল মোল্লাকে দিয়ে নাট্যকার অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিণামের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। সমাজহিতৈষী আখতার সাহেব তার এই দুরাবস্থা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তার ভুল ভেঙ্গে গেছে, শিক্ষার মর্যাদা বুঝতে পেরেছে—রাব্বে জ্বিদ্‌নী এলমান্। হে খোদা আমার এলেম (জ্ঞান) বৃদ্ধি করো।[২৯১]

মোকাম্মেল মোল্লা এবার লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছে। শিক্ষার আলোকে তার হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তার সংলাপের মধ্য দিয়েই নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে—

মোকাম্মেল। দেশকে এভাবে ধোঁকা দেয়া যেতে পারে না। আমাদের কোমর বেঁধে নামতে হবে। আমার সোনার দেশ, তাকে তুলতে হবে। আমার মত লোক, যে নিরক্ষরতায় বিশ্বাসই শুধু করে নাই, তা নিয়ে বাহাদুরীও করেছে তারই যখন জ্ঞানের স্পৃহা জন্মেছে, তখন আর কোনো চিন্তা নেই, দেশের শতকরা আশিজনও সত্যিকারভাবে অক্ষরপ্রাপ্ত হবে। সেদিন সুদূর নয় যেদিন দেশ শিক্ষার আলোয় ভরে উঠবে। ..."রাব্বে জ্বিদ্‌নী এলমান"। তুমি অন্ধকার দূর করে দাও, জ্ঞানের আলোয় মন ভরে দাও, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করো।[২৯২]

এ নাটকে নাট্যকার বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র উপস্থাপিত করেছেন। সমাজহিতৈষী, অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তি, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, স্বচ্ছল অবস্থার নিরক্ষর গ্রাম্য ব্যক্তি, গৃহভৃত্য—সব ধরনের চরিত্রই তাঁর নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।

শতকরা আশি প্রচারধর্মী নাটক। বাংলাদেশের শতকরা আশিজনই অশিক্ষিত—নাট্যকার সেই মূক মুখে ভাষা দিতে চেয়েছেন—জ্বালাতে চেয়েছেন জ্ঞানের আলো। তার বক্তব্যকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

---

২৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
২৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
২৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
২৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান-দ্বীপ শিখা-সলিতার মত মানুষের বুকে জ্বলে এক দীপ হতে স্পর্শ লভিয়া অন্য দীপ ওঠে জ্বলে। তোমাদের চাইতে এই সোনাই—গোলাপজানই আমাদের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে দিতে পারবে বেশি করে।[২৯৩]

'শতকরা আশি' নাটকে নুরুল মোমেনের স্বদেশপ্রেম, নীতিবাদ ও আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। শতকরা আশি নাটকে নাট্যকারের বাসনা—দেশের উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, দেশকে সোনার দেশ রূপে গড়ে তুলতে হবে।

৪১

'রূপান্তর'[২৯৪] নাটকটিতে আ. ন. ম বজলুর রশীদ জগৎ ও জীবনের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী সেতু বা সম্বন্ধ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই সুন্দর পৃথিবী, মানব জীবনকে বাদ দিয়ে তত্ত্ব চিন্তায় মগ্ন থেকে কোনো আনন্দ নেই। জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির মধ্য দিয়েই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। এ নাটকে নাট্যকার বস্তুময় জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিও কটাক্ষপাত করেছেন।

এই নাটকে কামাল এবং মনি দুটি মুখ্য চরিত্র। এই দুটি চরিত্রই কাহিনীর গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই নাটকের নায়ক কামাল, ধনীর পুত্র, নিভৃত নিরালায় অঙ্ক ও বিজ্ঞান চর্চায় দিবারাত্র মশগুল থাকে। মানুষের সুখ-দুঃখ ও বহির্বিশ্বের কর্মকোলাহলের প্রতি তার কোনো দৃষ্টি নেই। ছোটবোন মনির সঙ্গে দাবা খেলে আর আইনস্টাইনের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে তার দিন কাটে। তালিমের পুত্র খুশীকে সে খুব স্নেহ করে তবে তত্ত্বজ্ঞান তাকে এমন স্তরে নিয়ে পৌঁছেছে যে পার্থিব জগৎ-জীবন তার কাছে তুচ্ছ—

কামাল – মানুষ মানে তো হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, লোলুপতা—নাঃ মানুষের সঙ্গে আমার কিছুতেই বনবেনা। আর আধুনিক মানুষের গড়ে তোলা গতি ও বস্তুময় সভ্যতার সমীকরণ অসম্ভব। ... তাদের সভ্যতা যতই প্রসার লাভ করছে, বৃক্ষ ও প্রাণী-জগৎ ততই লুপ্ত হতে চলেছে। এমনকি তোদের ঢাকা শহরে এমন একটি নিরালা জায়গা নেই, সেখানে গিয়ে আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি...।[২৯৫]

ছোটবোন 'মনি' অত্যাধুনিক 'মিস কলিকে' ভ্রাতৃবধূ নির্বাচন করেছে, কৌশলে কলিকে একদিন পার্টিতে দাওয়াত করে কামালের সামনে ডেকে এনেছে, কামাল নির্বিকার কোনো কথা না বলেই সে বিদায় নিয়েছে। মানব সংসার থেকে দূরে নিভৃতে প্রকৃতি চর্চা ও তত্ত্বপ্রীতি নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে।

---

২৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

২৯৪. ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৬৯ সালে নাটকটি প্রকাশ করে। বাংলা একাডেমী আয়োজিত নাট্য মৌসুম উপলক্ষে নাটকটি রচিত

২৯৫. আ. ন. ম বজলুর রশীদ, রূপান্তর, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

হঠাৎ একদিন তালিমের পুত্র খুশী হারিয়ে যাওয়ায় তার চিত্ত অধীর হয়ে উঠেছে, নিরালা প্রকৃতি-জগৎ থেকে সে মানবজীবনের কাছাকাছি ফিরে এসেছে। সে তার পিতার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে দুস্থ আর্ত বুভুক্ষু মানুষের জন্য সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। কামাল তার জীবনের গভীর পরিবর্তনের কথা মনিকে জানায়--

কামাল - এতদিন নির্জন প্রকৃতিকে ভালোবেসেছি, এখন সে চারদিকে আর্ত মানুষের দাবী প্রবল হয়ে উঠেছে.....তাদের ভালোবাসলেই আমার জীবনের সমীকরণ পূর্ণ হবে।... জানিস মনি, একদিন বলেছিলাম চাঁদে মানুষ গেলেও সেখানে তার বসবাস করা অসম্ভব। তবু শূন্যে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা মানুষের অদম্য হয়ে উঠেছে। ১৯৬৯ সালে চাঁদে মানুষ পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু তার জন্য খরচ হয়েছে কতো? ষট মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ হাজার কোটি টাকা। অথচ মহাশূন্যে যাত্রার পরিকল্পনায় এ পর্যন্ত যত কোটি টাকা খরচ হয়েছে তার অর্ধেক হলেও পৃথিবীর পঞ্চাশ কোটি লোক একেবারে না খেয়ে থাকতো না, গোটা সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত উর্বর হয়ে উঠতো।[২৯৮]

মানুষের জন্য কামালের প্রাণে যে দরদ জেগেছে তা' আকস্মিক হলেও সুতীব্র। মানুষের প্রতি অবিশ্বাস ও ঔদাসীন্য তাকে মানবতা বিমুখ করে রেখেছিলো। আজ সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানবতার কল্যাণে। উগ্র আধুনিকা মিস কলিও জীবনের সমস্ত বিলাস পরিত্যাগ করে কামালের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ সেবায় এগিয়ে এসেছে।

'রূপান্তর' নাটকে লেখক আদর্শ ও নীতি প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে সামাজিক সমস্যার চিত্রও তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন ছায়া মূর্তির মুখ দিয়ে নাট্যকার বিভিন্ন সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন। এই নাটকে মনি নারী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। কলির চরিত্রে সমকালীন আধুনিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

'রূপান্তর' নাটকে প্রথম থেকে চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত কামাল চরিত্রটি গতানুগতিক পঞ্চম অঙ্কে খুশী হারিয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে রূপান্তর ঘটেছে ; আর্তপীড়িত মানুষের আর্তনাদ যে কান পেতে শুনেছে—তার হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে গেছে, মানবতার সেবায় সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কাহিনীর বৃত্ত গঠন ও নির্মাণশৈলীতে নাট্যকার দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপের নিপুনতায় নাটকটি সার্থকতার দাবিদার।

---

২৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪২

আ. ন. ম. বজলুর রশীদের 'ধানকমল' নাটকটি গ্রাম বাঙলার সহজ সরল মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার পটভূমিকায় রচিত। চাষাবাদের যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলন ও সমবায় খামার ব্যবস্থায় ফসল বৃদ্ধির প্রেরণা এ নাটকের মূল উদ্দেশ্য। রোদ বৃষ্টি মাথায় করে যারা ক্ষেতে সোনার ফসল ফলায়, যাদের রক্ত ঘাম অর্জিত ফসল এদেশের মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে তারাই আজ সমাজের কাছে অবহেলিত, উপেক্ষিত। সমাজের উচ্চতলার তথাকথিত খান্দানীরা সেই মাটির মানুষদের অপাংক্তেয় বলে মনে করে। নাট্যকার এই সমস্ত কৃষকদের যথাযোগ্য মূল্য ও মর্যাদাদানের প্রয়াস পেয়েছেন 'ধানকমল' নাটকে।

এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র জামাল গ্রাম্য চাষী এবং কামাল কৃষিবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত বিলাত ফেরত কাজী বাড়ির ছেলে। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রামের মধ্যে সোনা ফলেছে। এদের সহায়তা করেছে জামালের বোন জহুরুন নূরী, সে বিজ্ঞানের সেরা ছাত্রী। সে গ্রামের অশিক্ষিত, বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা আর জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিয়েছে। গ্রামের লোকেরা সবাই তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে এতে মিয়া সাহেবের আক্রোশ আরও বেড়ে যায়। তিনি জামালকে জব্দ করার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন এবং নূরীর উপর তার লোলুপ দৃষ্টি, তাকে চতুর্থ স্ত্রী করার জন্য কলাকৌশল প্রয়োগ করেন। গ্রামের লোকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও মিয়া সাহেবের তৃতীয় স্ত্রীর সহায়তায় তার এই অপপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কাজী বাড়ির কালামের সঙ্গে নূরীর এবং কালামের বোন মুনীরার সঙ্গে জামালের পরিণয়ের মধ্য দিয়েই গুণাই গ্রামে একটি নবযুগের সূচনা হলো। জামাল জননী আমিনা সবাইকে দোয়া করলেন--

> তোরা যেন মাটির খুব কাছে থাকিস, এই মাটির দানে সোনার ফসলে দেশ যেন ভরে ওঠে।[২৯৭]

'ধানকমল' নাটকের কাহিনীতে কোনো উচ্চাঙ্গের মনোবীক্ষণ, নির্মিতিতে প্রকৌশল বা বর্ণাঢ্যতা নেই। গ্রাম জীবনের সহজ সবুজ আলেখ্য অতি স্বাভাবিক রসে-রূপে বিকশিত হয়েছে। গ্রাম্যজীবনের সরল অনাড়ম্বর চিত্র যেমন এতে আছে তেমনি আছে কুটিল, স্বার্থান্ধ লম্পটের চিত্রও আদিকালের অবহেলিত গ্রাম বাংলায় আজ জাগরণ আসছে, চাষ পদ্ধতির নবরূপায়ণের মাধ্যমে সোনার ফসলে ভরে উঠবে আমাদের জীবন, শিক্ষার আলোয় গ্রামের নারী-পুরুষের মন হবে আলোকিত মিথ্যা অহমিকা ও হিংসা দূর হয়ে ধ্বনিত হবে মৈত্রী ও মিলনের সুর। নাট্যকার এই সুন্দর সুদিনের স্বপ্ন আয়োজনে উন্মুখ।[২৯৮]

'ধানকমল' নাটকে কামালের একটি সংলাপের মধ্য দিয়েই নাটকটির তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—

---

২৯৭. আ. ন. ম. ফজলুর রশীদ, ধানকমল, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৬, পৃ. ৭৪

২৯৮. বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

> মানুষ যখন মহামানুষ হয় তখন সে নিজেই একটি মুক্তা হয়ে যায়। যারা মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে পারে না, তারা কি মানুষ? আমাদের ভিটের বাতি আমরা দু'জনেই শুধু আছি। অতীতের মিথ্যা গর্বের গণ্ডী আমরা ভেঙ্গে ফেলবো। দেশের মানুষের সাথে মিশে অনেক সূর্যের আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবো।[২৯৯]

মাটির মানুষের প্রতি, পল্লীর সাধারণ ভাইবোনদের প্রতি তাদের শ্রমের প্রতি এই মর্যাদাবোধ ধানকমলের সৌন্দর্য-সার এবং জীবন দর্শন। নাটকীয় কলাকৌশল এর সাধারণ কিন্তু অনুভূতি অসাধারণ আন্তরিক। অবশ্যি কাহিনী নির্মাণে, চরিত্র চিত্রণে এবং পরিবেশ উপস্থাপনে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় আছে, সংলাপ রচনাতেও আছে একটি অনায়াস সুলভ দক্ষতা।[৩০০]

৪৩

নুরুল মোমেনের 'যেমন ইচ্ছা তেমন' একটি সামাজিক নাটক। একজোড়া নর ও এক জোড়া নারীর প্রেমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। নাটকটি স্বল্পায়তন বিশিষ্ট, বিষয়বস্তু হাল্কা হলেও শিল্পচাতুর্য ও উপস্থাপনার দক্ষতায় নাটকটি উপভোগ্য হয়েছে। এনায়েত ও এবরান দুই বন্ধু। এনায়েত পাঁচ শ' টাকা বেতনের কর্মচারী। বিলকিস ধনীর দুলালী। আলেয়া বিলকিসের চাচাতো বোন। আলেয়া পিতৃমাতৃহীন ও দরিদ্র। সে পিতৃব্যের (বিলকিসের পিতার) সংসারে আশ্রিতা হিসাবে বাস করছে।

এবরান ধনী সে ড্রাইভার সেজেছে, আর এনায়েত গাড়ির মালিক সেজে ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা বিলকিসের মনোহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এবরান বিলকিসেরই চাচাতো বোন আলেয়ার প্রেমে পড়েছে, আলেয়া প্রথমে ড্রাইভার ভেবে পাত্তা দেয়নি, ঘটনাচক্রে এবরানের আসল পরিচয় জেনে গেছে এবং প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। এ নাটকের মূল সমস্যা হচ্ছে—উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সমস্যা। ধনীর দুলালী বিলকিস climax-এ পৌঁছে যখন পুরো ব্যাপারটা জানতে পেরেছে তখন সে ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি—

> তুমি পাঁচ শ' টাকা বেতন পাও, ... আমি টাকার কাঙাল নই কিন্তু বড়লোক না হলে হ্যাংলী মনে হবে যাকে, সেই তুমি শেষ পর্যন্ত সত্যি গরীব, তাতো আমি সহ্যও করতে পারছিনা।[৩০১]

অন্যদিকে বিলকিসের চাচাতো বোন আলেয়াও এবরানকে ঐশ্বর্যশালী ভেবেই তাকে ভালোবেসেছে। অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে নাট্যকার দু'জন নারীর চিত্তবৃত্তির বিচিত্র প্রকাশ তুলে ধরেছেন। যেমন ইচ্ছা তেমন নাটক প্রসঙ্গে সুকুমার বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন, প্রকৃতপক্ষে 'যেমন ইচ্ছা তেমন' নাট্যকারের দুর্বল

---

২৯৯. 'ধানকমল', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৩০০. বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭

৩০১. নুরুল মোমেন, যেমন ইচ্ছা তেমন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি।[৩০২] এ নাটকে নুরুল মোমেনের বিদগ্ধ প্রজ্ঞা, নাটকীয় কলাকৌশলের অভাব পরিলক্ষিত হলেও রোমান্টিক কমেডি হিসাবে নাটকটি সার্থক হয়েছে। আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের অর্থ এবং বিত্তের প্রতি যে মোহ সেটা সংসার জীবনে যেমন ভয়াবহ অশান্তির সৃষ্টি করেছে তেমনি সমাজ জীবনেও অভিশাপ বয়ে এনেছে।

৪৪

নাট্যকার নুরুল মোমেনের 'রূপলেখা' '১৯৭০ সালের শিক্ষা সপ্তাহের জন্য লিখিত এবং শিক্ষা সপ্তাহে মঞ্চস্থিত হয়।'[৩০৩] নাটকটি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোনো পদ্ধতি অধিক উপযোগী— বিষয়মূলক না নৈর্ব্যত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির শিক্ষা প্রচলন? এ দু'পক্ষেই যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে। মঞ্চে ছাত্র, শিক্ষক, জ্ঞানী-গুণী ও সমাজকর্মীদের সমাবেশ ঘটিয়ে এই শিক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রসঙ্গটি বিশ্লেষিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নাট্যকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, পদ্ধতি যাই হোক না কেন শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে—

> হিউম্যানিটিজ, বিজ্ঞান, ধর্মীয় জ্ঞান, যেটাই বলুন কিংবা বিষয়মূলক, উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতির কথা যেটাই ধরুন, গোড়াতেই যে আপনি মাত্র কোনো একটির উপর জোর দিয়ে সুবিধে করতে পারবেন, তা নয়। সবগুলি ক্ষেত্র অনুসারে বিভিন্ন পরিমানে মিশিয়ে তা' পরিবেশন করতে হবে। কারণ শিক্ষাই মুক্তি। যে কোনো মূল্যে তা অর্জন করতে হবে।[৩০৪]

রূপলেখা নাটকে শিক্ষার পাশাপাশি ডাক্তার সুকরাতের মুখ দিয়ে শ্রমের মর্যাদার প্রতিও আলোকপাত করেছেন নাট্যকার—

> ... কারণ আপনি আমাদের মত শ্রমের মর্যাদার বিশ্বাস করেন না। বড় ঘরের ছেলে ছিলেন আপনি, শ্রমে পরাঙমুখ ছিলেন। সুতরাং এক শিক্ষাই আপনাকে শ্রমের মর্যাদায় বিশ্বাসী করতে পারতো। কিন্তু আপনি সে শিক্ষা নিশ্চয়ই পাননি। পেলে নিশ্চয়ই আপনি এ কারবার করতে আপত্তি করতেন না। বর্তমান উচ্চ শিক্ষার ঐ কুফল; মাটির থেকে শিকড় উপড়ে ফেলা হয় তাতে।[৩০৫]

শুধুমাত্র নিরক্ষরতা সমস্যা নিয়েই নুরুল মোমেন চিন্তা-ভাবনা করতেন তা' নয় আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারেও তিনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন।

---

৩০২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৭

৩০৩. নুরুল মোমেন, রূপলেখা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০, পৃ. প্রারম্ভ

৩০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

৩০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৪৫

নুরুল মোমেনের 'হোসেন সফদারের উইল' পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট সামাজিক নাটক। নাটকটি একটি পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইশতিয়াক ও নায়িকা কায়সারী। হোসেন সফদারের পিতা তার ছোট ভাইয়ের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মস্মাৎ করায় তার গ্লানিবোধ জন্মে। এই গ্লানিবোধ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ভ্রাতুষ্পুত্র ইশতিয়াককে সন্তানস্নেহে লেখাপড়া শেখান ও সুযোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলেন। সন্তানদের অজ্ঞাতসারে ইশতিয়াকের ন্যায্য পাওনা একটি পোস্টকার্ডে উইল করে জুতার মধ্যে রেখে যান। হোসেন সফদারের মৃত্যুর পর ইশতিয়াক বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শ্রম ও মেধা বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, উইল উদ্ধার করেছে এবং কায়সারীর সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

একটি উইলকে কেন্দ্র করে হোসেন সফদারের উইল নাটকের কাহিনী আবর্তিত। পারিবারিক হিংসা, বিদ্বেষ ও সম্পত্তি নিয়ে বিভ্রাটের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকের সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত চরিত্র ইশতিয়াক। বস্তিতে বসবাস করে সে শূন্য থেকে জীবন শুরু করেছে। ন্যায়-নীতি, ধৈর্য নিষ্ঠা দিয়ে সে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উন্নীত হয়েছে। বুদ্ধি এবং শ্রমের সমন্বয় ঘটলেই জীবনে উন্নতি সম্ভব বলে নাট্যকার মনে করেছেন। আদর্শের প্রতীক ইশতিয়াক উল্লেখ করেছেন—

> আমি যেমন হোসেন সফদারের উইল তলা ছিদ্র জুতার মারফত পেয়েছিলাম, ওদেরও তেমনি করে পেতে হবে। এর পিছনে খাটতে হবে। দেখুন ভাবী, সারা জাতিটা যেন হাঁ করে চেয়ে রয়েছে হোসেন সফদারের উইলের জন্যে, সহজভাবে অর্থ ও ঐশ্বর্য লাভের প্রত্যাশায়।[৩০৬]

একদিকে যেমন ইশতিয়াক, কায়সারীর মধ্য দিয়ে আদর্শ ও নীতিবোধ প্রচারিত হয়েছে অন্যদিকে আনিস, আমিন, আফসার, গোল আব্বাস প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে কর্মবিমুখ, ধুরন্ধর, অসৎ ও নীতিবর্জিত মানুষের রূপটি ফুটে উঠেছে। এ নাটকের পাত্র-পাত্রীরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি। সমাজ জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েই নাট্যকাহিনী সমাপ্ত হয়নি, নীতি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে।

একদিকে অর্থবিত্ত ও ঐশ্বর্যের প্রতি লালসা, অন্যদিকে অন্যের সম্পত্তি গ্রাসের প্রচেষ্টা নাটকটির মূল বক্তব্য বিষয়। এ ধরনের অবিচার, অন্যায়, অত্যাচার আমাদের সমাজের চারপাশে নিত্যই ঘটেছে। অর্থনৈতিক কারণেই শ্রেণী বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। নাট্যকার নুরুল মোমেনের হোসেন সফদারের বিবেক চেতনা—অন্যায়, অবিচার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কণ্ঠস্বর।

---

৩০৬. নুরুল মোমেন, হোসেন সফদারের উইল, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

৪৬

আসকার ইবনে শাইখের 'শেষ অধ্যায়'[৩০৭] নাটকে জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের পাশাপাশি তরুণদের সমাজবাদী স্বপ্নের বাস্তব আলেখ্য ফুটে উঠেছে। জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন হলেও জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিলো, তাদের শোষণের শিকার হয়েছিলো নিরীহ জনসাধারণ। জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের কবল থেকে জনসাধারণকে মুক্তি দেয়ার প্রয়াসেই সমাজ থেকে জমিদারি প্রথা উৎখাত করা হয়েছিলো। 'শেষ অধ্যায়' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'রেজা সাহেব' জমিদার বংশের শেষ বংশধর, তার জমিদারি, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্যের জৌলুস নিঃশেষিত প্রায়। তার পূর্ববর্তী বংশধররা প্রবল প্রতাপে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে তাদের গর্বোদ্ধ্যত মুখচ্ছবি। সেই সমস্ত ছবির এক একটি মুখ, সেই স্মৃতিময় দিনগুলি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিনি পুরোনো ভাঙ্গা বাড়িতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। অতীতে তিনি বংশ মর্যাদার বশবর্তী হয়ে তার ভালোবাসার পাত্রীকে গাজী বাড়ির বধূ হওয়ার মর্যাদা দেননি, তারই ঔরশজাত একমাত্র বংশধরকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন। রাতের অন্ধকারে শিশুটিকে নিয়ে তার মা পালিয়ে গেছে। সেই থেকে তার জীবনে এক করুণ অধ্যায় সূচিত হয়েছে, একের পর এক রক্ষিতা রেখেছেন, মদ ধরেছেন, তবুও শান্তি পাননি। সময়ের পরিবর্তনে তার জমিজমা, প্রভাব প্রতিপত্তি শেষ হয়ে এসেছে। অন্যদিকে তাদের আশ্রিত প্রজা রুস্তম ব্যাপারীর জামাই বিত্তবান হয়ে উঠেছে, কৃষিকাজ ছেড়ে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছে। তরুণ যুবক হেলাল বি, এ পরীক্ষা দিয়েছে। গ্রামের লোকজনদের নিয়ে সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে চায়—

> হেলাল : মানে এখানকার শ্রমিকরা শুধু শ্রমিকই নয়। সামান্য চাষের ব্যবস্থাও তাদের রয়েছে। কিন্তু তাতে আয় হয় সামান্যই। চাষের জমি বাড়লে আয়ও বাড়বে।
>
> রেজা : কিন্তু একই লোক কারখানায় কাজ করবে, আর চাষও করবে?
>
> হেলাল : তাই তো সমবায় পদ্ধতিতে চাষের প্রয়োজন। যন্ত্রের সাহায্যে চাষের কাজ চলবে। তাতে শ্রম বেঁচে যাবে অনেকটা। কাজেই কারখানা আর চাষাবাদ দুটোই ওরা চালিয়ে নিতে পারবে।[৩০৮]

পুরোনো ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে, শিল্পযুগের সূত্রপাত ঘটেছে। হকের মুখেই তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

---

৩০৭. আসকার ইবনে শাইখের 'শেষ অধ্যায়' নাটকটি ১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আসকার রচনাবলীর (২য় খণ্ডের) অন্তর্ভুক্ত করা হয়

৩০৮. আসকার রচনাবলী (২য় খণ্ড) শেষ অধ্যায়, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

হক : .... দিন বদলাছে, এটা শিল্পের যুগ।[৩০৯]

রেজা সাহেব পুরোনো ধারণাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। হক, হেলালের মত যুবকরা শিল্পযুগের প্রতিনিধিত্ব করছে। রেজা সাহেব নবীনদের স্বাগত জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত। প্রাচীনপন্থী আর নব্যপন্থীর চরম সংঘাত শুরু হয়েছে, পরিশেষে রেজা সাহেব নিঃস্তব্ধ হয়ে গেছেন। খান্দানের প্রতি তিনিও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন—

বুড়ো হয়ে পড়েছি আরফান। সাত পুরুষের খান্দানী গাজীদের আওলাদ। ভাংগনের শেষ স্তরে এসে দাঁড়িয়েছি। ধন নেই, জন নেই, একা আমি। ভাংগা বাড়ির ফাটল থেকে অজগর মাথা বের করে আমাকে ভয় দেখায়। রুস্তম ব্যাপারী স্মৃতিভরা জ্বালার দিনে হাজার লোক নিয়ে উৎসব করে। এ বিরান বাড়ির হাহাকার আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। আরফান, মদ আমাকে খেতে হবেই।[৩১০]

সুদীর্ঘ একুশ বছর পর তার ভালোবাসার পাত্রী জরিনার সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে, তাকে তিনি অভিযুক্ত করেছেন—

রেজা : ... আমি নির্মম বলেই তুমি মা হয়ে একাজ করতে দিলে কি করে? আজ যে যাবার বেলায় দেখতে পাচ্ছি, চারদিকে সব অন্ধকার। কোনো পথে এতটুকু আলো নেই। ...মদ খেয়েও আমি ভুলতে পারি না সেই কচি মুখ। ঘুম ঘোরে সে আমায় ডাক দিয়ে যায়, জেগে দেখি, চারদিকে শুধু অন্ধকার। জমাট অন্ধকার।[৩১১]

নাটকের শেষে খোকার পরিচয় পেয়ে তার পিতৃ হৃদয় আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছে—

আমার খোকা আসছে ... জানিস খোকা, আজকের ভোর, আমার কাছে নতুন আলোর সওগাত নিয়ে এসেছে, আমি স্পষ্ট দেখলাম আধার রাত্রি কেটে এসেছে আলোর বন্যা।[৩১২]

রেজা সাহেবের ব্যক্তিত্বের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে। পুরোনো সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। কৃষিব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, শিল্প যুগের উদ্বোধন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্য—

পূর্ব বাঙলার জমিদারী প্রথা তখন উচ্ছেদের পথে। শিল্প যুগ উঁকি দিচ্ছে একটু-আধটু। তাও প্রধানত ইট খোলাতেই প্রায় সীমিত। সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের চোখে সমাজবাদী স্বপ্ন। বলা যায়, এসবের ত্রি-মোহনায় রচিত এই শেষ অধ্যায়।[৩১৩]

---

৩০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১
৩১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
৩১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
৩১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮
৩১৩. শেষ অধ্যায়, নাট্যকারের নিবেদন দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

হকের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার নতুন যুগের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন—

> হক : আমাদের এই ম্যান ফ্যাক্টরী, এই ইটের কারখানা খোলার উদ্দেশ্য তোমরা জান। জান যে এসব কারখানা আমরা শহরেও করতে পারতাম। কিন্তু তাতে তোমাদের কোনো উপকার হতো না। চাষাবাস করে তোমাদের চলে না, আজকের যুগে চলতেও পারে না।[৩১৪]

আভিজাত্য ও খান্দানের মোহে রেজা সাহেব তার স্ত্রী পুত্রকে একদিন ত্যাগ করেছিলেন, ২১ বছর পরে তাদেরকেই তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী প্রথার শেষ অধ্যায় নিয়ে আসকার ইবনে শাইখ লিখেছেন 'শেষ অধ্যায়'। জরিনা ও হেলাল চরিত্র দুটি সার্থক। রচনাশৈলীর দক্ষতা, সুনিপুণ কাহিনী বিন্যাস ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণধর্মী চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি সার্থকতার দাবিদার।

৪৭

আসকার ইবনে শাইখের সামাজিক নাটক 'প্রচ্ছদপট' আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে রচিত। তিন অঙ্ক বিশিষ্ট এ নাটকে কোনো দৃশ্য সংযোজন নেই। নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য স্মরণযোগ্য—

> আধুনিক নগরী। গত তেইশ বছরে গড়ে ওঠা এক অভিজাত সমাজ। প্রাসাদের পর প্রাসাদ। নানা রং–এর, নানা ঢং–এর সমাজের প্রচ্ছদপট। চমৎকার। এ প্রচ্ছদপটের অভ্যন্তরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার দৃষ্টিতে দেখা সমাজের ইতিহাসকে।[৩১৫]

নাট্যকারের দেখা তেইশ বছরের নাগরিক সমাজ জীবনকে নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। এ সমাজে মানুষের কোনো মূল্য নেই, আছে শুধু অর্থের চাকচিক্য, বিত্তের সমারোহ। ন্যায়, আদর্শ নেই, আছে শুধু ভোগসর্বস্বতা। ধনীরা বিত্তের পাহাড় গড়ে, সেই পাহাড়ের উপর বসে দরিদ্র ব্যক্তিদের উপর চালিয়েছে শোষণের সুকঠিন যন্ত্র, তাদের দুর্বলতাকে নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে উঠেছে। এমন এক সমাজব্যবস্থা এবং এ সমাজের মানুষের কথা নাট্যকার এই কাহিনীতে চিত্রিত করেছেন। এ প্রচ্ছদপটের অভ্যন্তরে রয়েছেন—শওকত খানের মত মুখোশধারী ব্যক্তিত্ব, দরিদ্র হাসান মাস্টার, নিরীহ তৌফিক, এদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন খান সাহেব। নিজে তৌফিককে খুন করে হাসান মাস্টারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে উন্মাদ বলে উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়েছেন। অর্থের সাধনায় প্রথম জীবনে স্ত্রীকে অবহেলা করেছেন, সে পরপারে চলে গেছে। ছেলের

---

৩১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৩১৫. ঢাকা থেকে সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ ১৯৭০ সালে নাটকটি প্রকাশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হলের বার্ষিক নাট্যাভিনয়ের জন্যে ১৯৫৮ সালে 'প্রচ্ছদপট' রচিত হয়। পরবর্তীকালে নাট্যকার এটি আসকার রচনাবলী (২য় খণ্ড)-তে সংযোজন করেন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, ভূমিকা, প্রচ্ছদপট, দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে নিজেই তাকে বিয়ে করেছেন। বড় মেয়ে ফারজানাকে বিয়ে দেয়ার পর পরই শ্বশুর পক্ষের সঙ্গে বিবাদ করে তার তালাক নিয়ে নিয়েছেন। একমাত্র বংশ প্রদীপ জাহেদ উচ্ছৃঙ্খলতার চরম শিখরে পৌঁছেছে সেদিকেও তার লক্ষ্য নেই। নাট্যকাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে কোনো বেদনাবোধ বা অনুশোচনার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

'প্রচ্ছদপট' নাটকটি রচনার প্রেরণা সম্পর্কে নাট্যকার লিখেছেন—

> —সাতচল্লিশের পর সমাজে দেখা দিয়েছে এক নতুন অভিজাত গোষ্ঠী। তাদের প্রাসাদোপম বাসভবনে সেই আভিজাত্যের জৌলুস, যাকে আপাত দৃষ্টিতে সমাজের এক উন্নীত রূপ বলে প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু আমার তা ছিলো সমাজের ওই একাংশের জন্য এক মনোহর প্রচ্ছদপট মাত্র। কিভাবে সমাজের এই একাংশটি তাদের মনোহর প্রচ্ছদপটটি লাভ করেছে, কিসের বিনিময়ে তারা তাদের নবলব্ধ আভিজাত্যকে রক্ষা করতে চাইছেন, প্রচ্ছদপটটি অনাবৃত করলেই তার সঠিক চিত্র ধরা পড়বে বলেই ছিলো আমার প্রচ্ছদপট রচনার মূলগত প্রেরণা।[৩১৬]

নাট্যকারের সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আর গভীর উপলব্ধি দিয়ে প্রচ্ছদপট নাটকের কাহিনী সাজিয়েছেন। জাহেদ চরিত্র চিত্রণে দক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট। অভিজাত সমাজের ধনীর দুলাল অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। সে জীবনে সর্বস্ব পেয়েও সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছে। বর্তমানে অতি সভ্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যুবক সম্প্রদায় যেমন ঐশ্বর্য ছেড়ে গুহায় আশ্রয় নিতে চাইছে কারণ ভোগেরও সীমা আছে। এর পরিতৃপ্তিও মাত্রাহীন অন্ধকারের আরেকরূপ। জাহেদ তার পারিপার্শ্বিকতায় ক্লান্ত, বিপর্যস্ত—

> জাহেদ : ... শওকত খানের রক্তের অধিকারী আমি। অর্থ, মান, প্রতিপত্তি সবই আমাদের আছে। রমজান। মাকড়সা দেখেছ? দেখেছ, নিজের জাল যে সে নিজেই বুনে চলে। তারপর তার নিজের জালেই সে একদিন আঁটকা পড়ে যায়।[৩১৭]

জাহেদ খান অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত চরিত্র। তার সংলাপের মধ্য দিয়ে সমকালীন জীবন, যুগ-যন্ত্রণা প্রতিফলিত হয়েছে—

> জাহেদ : ... এই বাড়ির পর বাড়ি, সুন্দর প্রাসাদ, এই সমাজ-জীবনকে পাব বলে তিলে তিলে করে গেছি ক্ষয়, কুকুর উল্লাসে সবে হাড়ে মেখে জীবন শোণিত সানন্দে করেছি পান। চারদিকে আজ অন্তহীন অন্ধকার শুধু। ব্যথার ক্রন্দন। শূন্য হাহাকার।[৩১৮]

---

৩১৬. আজকার রচনাবলী (২য় খণ্ড) আমার জীবন কথার কিছু কথা, পৃ. ১৩৮

৩১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

৩১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক নাগরিক জীবনের জটিলতায় আবদ্ধ জাহেদ নাট্যকারের সার্থক শিল্পায়ণ। টনি হোসেন নীতিহীন, উচ্ছৃঙ্খল যুবক, যার কোনো ভূত-ভবিষ্যৎ নেই, সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহে গা' ভাসিয়ে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। নিরীহ দরিদ্র হাসান মাস্টার জমিদার শওকত খানের অত্যাচারের শিকার হয়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন। বিনা অপরাধে স্ত্রী-কন্যা রেখে দীর্ঘদিন পাগলা গারদে অবস্থান করেছেন, ঘরে ফিরে স্ত্রী কন্যা কাউকেই তিনি খুঁজে পাননি —

হাসান : পাগল আর মাস্টার, দুই জীবন। দুই জীবনের মাঝে রয়েছে রহস্যের অন্ধকার। ওপারের জীবনে যেতে হলে এই অন্ধকার ভেদ করে যেতে হবে। হয়তো সে জীবন আজ স্বপ্নের মত ধরা দেবে।[৩১৯]

হাসান মাস্টারের করুণ আর্তনাদ শওকত খানকে পীড়িত করেনি কিন্তু জাহেদের বিবেকবোধ তাকে দংশন করেছে, পিতার আভিজাত্যে গড়া অট্টালিকায় বাস করে সে নিজেকে বড় অসহায় মনে করেছে—

হাসান : ... আলহাজ্ব শওকত হোসেন খান সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি। ধনী, মানী, গুণী —

জাহেদ : তাঁরই ছেলে আমি লোফার, মাতাল, মূর্খ —

হাসান : দেশের তিনি বরেণ্য, দয়ালু, ধর্মপ্রাণ —

জাহেদ : আর আমি অপদার্থ, নিষ্ঠুর, মহাপাপী —

হাসান : কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনি এখনও মানুষ।[৩২০]

চরিত্র-চিত্রণ ও সংলাপের দক্ষতায় 'প্রচ্ছদপট' সার্থক সৃষ্টি। বড়বোন হিসাবে ফারজানার উপস্থিতি চিরন্তন, শাশ্বত ও কল্যাণীয়। কাহিনীর গতি ও পরিণতি, চরিত্রসৃষ্টি, সর্বত্র নাট্যকারের সংযত মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটিকে আধুনিক জীবন চেতনার বাস্তব প্রচ্ছদপট বলা যায়।

৪৮

সাঈদ আহমদ-এর 'মাইলপোস্ট' নাটকটি দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত। অ্যাবসার্ড রীতির এই নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজপথের দিক নির্দেশকারী জড়বস্তু 'মাইলপোস্ট'। নাটকটি প্রসঙ্গে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন—

---

৩১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
৩২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

> ... এই নাটকের পটভূমি দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ যে শুধু নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার সংকটের এক তীব্র আর্তনাদও এই সত্য প্রকাশের তাগিদে 'মাইলপোস্ট' লেখা হয়।[৩২১]

'মাইলপোস্ট' নাটকে একটি অঙ্ক ও তিনটি দৃশ্য বর্তমান। চরিত্রসমূহ হলো—চৌকিদার, গোরখোদক, ডাকপিয়ন, সঙ, বড়ভাই, ছোটভাই এবং মা। নাটকটি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক আতাউর রহমান লিখেছেন–
–

> সাঈদ আহমদের নাটকের বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন কিছু নয়। তাঁর নাটক বাংলাদেশের নিত্য সহচর তুফান, বন্যা ইত্যাদি সমস্যাকে নিয়েই। তবে তাঁর উপস্থাপনা পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু থেকে নাটকীয় চরিত্রসমূহের ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি সব ট্রাডিশনাল অর্থে প্রাচ্যের বা বাংলাদেশের নয়। তাঁর নাটকের দ্বন্দ্বে, চরিত্রসমূহের ইন্টার‌্যাকশান, ট্রিটমেন্ট অপরিহার্যভাবেই পাশ্চাত্যধর্মী।[৩২২]

নাটকের সূচনাতে মাইলপোস্টকে ঘিরে একটি তাৎপর্যময় ইঙ্গিত রয়েছে। রাজপথের চৌকিদার প্রায়শই মাইলপোস্টের দিক নির্দেশকারী গন্তব্য ফলকগুলোকে তার ইচ্ছামত বদল করে দেয়। এটি প্রচলিত নিয়ম ও নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। বস্তুত এই মাইলপোস্ট একটি জড় পদার্থ, যাকে ঘিরে আবর্তিত নাটকের চরিত্রগুলি আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় জীবন-মৃত্যু, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ঘূর্ণায়মান। ঘটনার সংযোগস্থল একটি রাজপথ, যেখানে 'বিচিত্রধর্মী মানুষের আনাগোনা তা আরেক অর্থে হয়ে দাঁড়ায় চলমান জীবনের গতিশীল প্রেক্ষাপট।'[৩২৩] চলমান জীবনের এই গতিশীলতা ও প্রথাসিদ্ধ নিয়ম-নীতির প্রতি গন্তব্যহীন মানুষের নিয়ম ভাঙ্গার দার্শনিক সত্যের রূপটি নাট্যকার প্রচ্ছন্ন করে তুলেছেন 'মাইলপোস্ট' নাটকের অ্যাবসার্ডধর্মী আঙ্গিকে।

আধুনিক রুচি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চেতনায় লালিত নাট্যকার সাঈদ আহমদের 'মাইলপোস্ট' নাটকে যেমন দেশীয় লোকজ উপাদানের ব্যবহার দেখা যায়—তেমনি পাশ্চাত্য চেতনাজাত ভাব ও রূপকল্পের সফল আত্মীকরণও দুর্লক্ষ্য নয়। বাংলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অত্যাচারিত হতাশাগ্রস্ত বেদনাক্লিষ্ট মাকে নাট্যকার

---

৩২১. নাটকটি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়। আতাউর রহমান অনূদিত মাইলপোস্ট প্রথম প্রকাশিত হয় 'মাসিক মোহাম্মদী' ৬৭শ বর্ষ ; ২য়-৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃ. ১০৯-৪৪; রচনাকাল ১৯৬২-১৯৬৪। নাটকটির বাংলা রূপ বাংলা একাডেমী আয়োজিত নাট্য মৌসুম উপলক্ষে ১৯৬৫ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ মে একাডেমী মিলনায়তনে সাত রং নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন—সৈয়দ আহসান আলী, আবদুল্লাহ আল মামুন, আতাউর রহমান, দীন মুহাম্মদ খান, আবদুল জলিল, ইনামুল হক এবং সাবেরা মুস্তফা। নির্দেশনা—আসকার ইবনে শাইখ। ভূমিকা, দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪৭

৩২২. মাইলপোস্ট, সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬ ভূমিকা, দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪৯

৩২৩. মেহের নিগার, সাঈদ আহমদের নাটকে অ্যাবসার্ড ধর্ম, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এক চল্লিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।। আষাঢ় ১৪০৫, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন করেছেন আধুনিক জীবন চেতনায়। আতাউর রহমানের বর্ণনায় 'মাইলপোস্ট' নাটকের মা চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে —

> তার বাংলা মা উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের, নিটোল পয়োধরা, উর্বরা কোনো নারী নয়—এ বাংলা মা শীর্ণ, বিশুষ্ক, লোলচর্ম স্খলিত স্তনা, বিধ্বস্ত এক নারী। সমগ্র মুখাবয়বে তাঁর বন্যা, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর বলিরেখা। অক্ষমতার হতাশা তার দু'চোখ জুড়ে, যে মা তাঁর সন্তানকে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাতে পারে না। রূপকথার বাংলা মায়ের মুখোশ ছিন্ন করে সাঈদ আহমদ আমাদের উপহার দিলের এ সত্যিকার বাংলা মাকে।[৩২৪]

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গোরখোদক ও চৌকিদারের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ ও সর্বগ্রাসী রূপের চিত্র তুলে ধরেছেন —

গোরখোদক : দুর্ভিক্ষ এসেছে আশীর্বাদের মতো, প্রচুর ফসল ওঠাতে হবে এখন ঘরে। আশে পাশের গ্রামে আর গোরখোদক নেই।

চৌকিদার : তুমি কি মনে করো ব্যাপারটা অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে?

গোরখোদক : অসীম তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ, অন্তহীন সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার। আকণ্ঠ পান করেও তার পিপাসা মিটছে না। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে গিলে ফেলছে সে। শত শত গ্রাম গোরস্থানে পরিণত হচ্ছে। গ্রামের পথে আজ আর কেউ হাঁটে না। একটি পাতাও নড়ে না। দুর্ভিক্ষের তাড়া খেয়ে মানুষ প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ওদের ছাড়বে না, ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে তার গতি। গত রাত্রে কয়েক মাইল দূরে ছিলো। আজ সকালে হয়তো পাশের দরজায় ঘা মারছে। তুমি কিন্তু ভুল বুঝোনা।

চৌকিদার : ঘোড়ার ডিম কিছুই বুঝিনা। দুর্ভিক্ষকে তোমার তো ভাল লাগবেই। কারণ এর বদৌলতে তুমি প্রচুর খেতে ও জমাতে পারছো।

গোরখোদক : সোজাসুজি দুর্ভিক্ষকে তুমি এজন্য দায়ী করতে পার না। সময়ের ব্যবধান যতই কম হোক না কেন, কোনো কিছুই সংকেত না দিয়ে আসে না। শতবর্ষ চিন্তার পর সে মনস্থির করে। আর মনস্থির হয়ে গেলেই সে ছুটতে আরম্ভ করে বিদ্যুৎ গতিতে, মানুষকে গ্রাস করে অজগরের মতোই, সহজে।[৩২৫]

....

চৌকিদার : সত্যি করে বল দেখি এটা কি নতুন দুর্ভিক্ষ? নাকি পুরোনোটাই ঘুরে ঘুরে আসছে।

---

৩২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

৩২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

গোরখোদক : এর আবার নতুন পুরোনো কি? আগেও ছিলো, এখনও আছে বলা যায় সর্বকালীন। বল দেখি, কখন তুমি এর কথা শোননি? চোখ খুলে দেখেছে সে আছে, চোখ বন্ধ করেও দেখেছে সে আছে। ক্ষুধার্ত শয়তান সব কিছু গ্রাস করছে। অসহ্য।[৩২৬]

দুর্ভিক্ষের হিংস্রতার শিকার হয়েও বাংলা মায়ের সন্তানেরা এক দুঃসাহসী প্রত্যয় নিয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে—

চৌকিদার : বন্ধ করো এসব ব্যক্তিগত সমস্যার আলোচনা, এক বিরাট দুঃখের মধ্যে আমরা আছি। আহত গোখরোর ফণা মেলে দুর্ভিক্ষ ছুটে আসছে আমাদের দিকে, আসছে পিশাচের লোভী ক্ষুধা নিয়ে।

ডাকপিয়ন : তাহলে বাঁচার কোনো উপায় নেই?

গোরখোদক : লাখে একজনও বাঁচবে না?

ডাকপিয়ন : আমরা কারাগারে আঁটকা পড়েছি।

গোরখোদক : হ্যাঁ, এবং সে কারাগারও নীরন্ধ্র।[৩২৭]

জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সমস্ত দুর্ভোগ, মানসিক যন্ত্রণাকে মেনে নিয়ে ওরা অসীম ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে, আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করার জন্য—

সঙ : আমরা কেবল টিকে থাকার জন্য লড়াই করছি। দুর্ভিক্ষ নিশ্চয় এ গ্রামটিকেও গ্রাস করতে চলেছে। হতে পারে এখানেই আমাদের গোর তৈরি হবে। দুর্ভিক্ষ না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করব। তারপর দুর্ভিক্ষ এসে দেখবে আমাদের জীর্ণশীর্ণ শরীরগুলো। এটা অবশ্যম্ভাবী। এ সংগ্রাম নিশ্চিত। এখানে, ওখানে, সবখানে। এ শুধু পালার ব্যাপার। কেউ রক্ষা করতে পারবে না। প্রলয় নাচের মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এখানে মমতা নেই, যুক্তি নেই, বিচার নেই, কিছুই নেই। এই চরম সত্য।[৩২৮]

নাটকের চরিত্রসমূহের বৈরাগ্যধর্মী অসংলগ্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে কঠোর বাস্তবতাকে নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরা হয়েছে—

চৌকিদার : আল্লার কি মেহেরবাণী। ইতিহাস শ্রদ্ধার সাথে আমাদের সময়কে মনে রাখবে। কেউ লিখবে—এক জটিল শতাব্দীতে সবচেয়ে সাহসী লোকেরা বাস করতো। সীমাহীন সমুদ্রে যারা পাল তুলেছিলো, সে সব ঘোড়া সওয়ারেরা যারা ঘোড়া ছুটিয়েছিলো উদ্বেল তরঙ্গমালায় এক গাঢ় কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতে, সেখানে সূর্যোদয়ের প্রায় কোনো আশাই ছিলো না।

---

৩২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
৩২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
৩২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ডাকপিয়ন : তোমাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। আমি নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলাম।

বড়ভাই : আমরা আমাদের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত নই। একথা সত্যি যে আমরা যেতে চেয়েছিলাম, যে দিক দু'চোখ যায়। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া থেকে, মহামারী থেকে, ক্ষুধার তাড়না থেকে।

ছোটভাই : আমরা ভেবেছিলাম পরে গ্রামে, পরের গলিতে, অন্য শহরে বা অন্য মোড়ে অবস্থা কিছুটা ভাল হবে। কিন্তু এ বর্ণনাতীত। এদেশ হতাশার দেশ, কল্পনার দেশ, রূপকথার দেশ।

ডাকপিয়ন : তোমরা নিশ্চয় উত্তর দিকে গিয়েছিলে? অন্য কোনো রাস্তা ধরলে হয়তো তোমরা একটু ভাল অবস্থা সন্ধান পেতে।

বড়ভাই : এখানে কোনো উত্তর নেই, দক্ষিণ নেই। পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, নৈঋত সবাই সমান। এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি শুধু। এখানে কোনো কিছুই অঙ্কুরিত হতে পারে না, কেউ এখানে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, কিছুই প্রস্ফুটিত হতে পারে না।[৩২৯]

ইব্রাহিমের সন্তান উৎসর্গের ছায়া অনুসারে মাইলপোস্ট-এর মা চরিত্রের স্বপ্ন সংকেতটির সাহায্যে নাট্যকার অর্ন্তসত্তার গভীরে অবচেতন স্তরের চিন্তাস্রোত, বিশ্বাস ও সংস্কারকে উন্মোচিত করেছেন। এই স্বপ্ন সংকেত পক্ষান্তরে পরিবর্তিত বাস্তব সংকটের বিপরীতে অনড় প্রাচীন প্রথাসিদ্ধ সমাধানের অসারতা ও যুগ অনুপযোগী সীমাবদ্ধতাকে সনাক্ত করে।[৩৩০] সমালোচক সিকানদার আবু জাফরের অভিমত—'মাইলপোস্টের স্বপ্ন সংকেতটি যেন একথাই মূর্ত করে যে, ত্যাগ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা উম্মাদনার সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি ত্যাগ বাস্তবে ঘটে না।[৩৩১]

আসন্ন দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে হতাশাগ্রস্ত চৌকিদার মাইলপোস্টের দিক ফলক বদলের খেলায় মেতে উঠেছে। তার উদ্ভাবিত খেলা দিয়ে তার বাসনাকে চরিতার্থ করতে চেয়েছে—

চৌকিদার : এ দুর্ভিক্ষ কখনও আমাদের ছাড়বে না। লক্ষ লক্ষ বছর আগে সে তার উল্লাসময় জয়যাত্রা শুরু করেছে। সে লুকিয়ে থাকে, জড় অবস্থায় কালাতিপাত করে, ভূগর্ভে বিচরণ করে নিজের খুশিমতো। আমাদের আশা জাগে। ঠিক সেই মুহূর্তে ড্রাগন তার উষ্ণ নিঃশ্বাস আছড়ে দেয়, প্রোজ্জ্বলিত অগ্নিদাহ পৃথিবীর গায়ে ফোস্কা ফেলে দেয়। দৈবাৎ যারা বেঁচে যায় তারা লেগে যায় নীড় বাঁধার চেষ্টায়। একবার স্থান নির্ধারিত হয়ে গেলেই

---

৩২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২-৯৩

৩৩০. মেহের নিগার, সাঈদ আহমদের নাটকে অ্যাবসার্ড ধর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৩৩১. হাসান হাফিজুর রহমান, 'সাঈদ আহমদের নাটক' ১৯৭৫, ঢাকা, দ্রষ্টব্য—প্রতিদিন একদিন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

> অজগর তার তন্দ্রা থেকে নড়ে ওঠে। কোনো বাঁচোয়া নেই। দেহমন প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কিত। তবুও আমি আমার মাইলপোস্ট বদলাতে থাকব। আমার একমাত্র উদ্ভাবিত খেলা যা দিয়ে খেয়াল চরিতার্থ করতে হবে।[৩৩২]

কঠোর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে কঠিন জীবন সংগ্রামের অনিবার্য পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মা তার সন্তানদের আশার বাণী শুনিয়েছেন—

> আমার সোনা মানিকেরা, সাহস ধর। বাংলা মা'র মুখে হাসি ফোটাতেই হবে। নতুন ভোরের আলোর রশ্মি চারদিকে ছিটকে পড়ছে। এখন থেকে সোনালী ইতিহাস শুরু হবে।[৩৩৩]

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি জড় বস্তু—মাইলপোস্ট। এই 'মাইলপোস্ট' হলো নিশ্চয়তার প্রতীক। দেশ, সমাজ ও সভ্যতাই আমাদের জীবনকে নির্ঞ্ঝাট করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে এইসব নিশ্চয়তা উদ্ভাবন করেছে। এইসব নিশ্চয়তা নিয়মের গণ্ডীভূত আর এক নিয়মেরই নামান্তর। তাই ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহ এ নিয়মের বিরুদ্ধে, নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে যা তার জীবনকে সীমাবদ্ধতার বৃত্তে বন্দি করে, মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশচারী হতে দেয় না। তাই নাটকের শেষে, নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র চৌকিদার মাইলপোস্টটির ঘাড় ভেঙ্গে দিয়ে নিশ্চয়তার প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয় এবং তার সঙ্গী সবাইকেও মুক্ত করে।[৩৩৪] বন্যা, তুফান, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বাংলাদেশের মানুষের জীবনে যে ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করে সেই প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রামরত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা-নিরাশার শিল্পভাষ্য সাঈদ আহমেদের 'মাইলপোস্ট'। নাটকের শেষে সঠিক দিক নির্দেশনায় ব্যর্থ মাইলপোস্টটির ঘাড় ভেঙ্গে দিয়ে অসহায় মানুষগুলি নিজেদের গন্তব্যপথ অনুসন্ধান করেছে। স্যামুয়েল বেকেট, ইউজিন ওনেস্কো, জেন পল সেটার প্রমুখ নাট্যকারদের ধারা অনুবর্তনে সাঈদ আহমেদ তাঁর নাট্যসমূহে পাশ্চাত্য নব নাট্যধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে আধুনিক নাট্যরীতির প্রবর্তন করেছেন।

৪৯

প্রচলিত লোককাহিনীকে সমকালীন জীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত করে সাঈদ আহমদ লিখেছেন 'তৃষ্ণায়'। নিরীক্ষা ধর্মী এই নাটক যথার্থই বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। দেশজ লোককাহিনীর

---

৩৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

৩৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৩৩৪. আতাউর রহমান, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য 'মাইলপোস্ট' নাটকের শিরোনামহীন ভূমিকা, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরালে উপস্থাপিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী চেতনা। তৃষ্ণায় নাটকের 'শেয়াল ও কুমীর ছানা' গল্পের রূপকীয় আবরণে নাট্যকার একটি চিরন্তন সত্যকে নবরূপে উপস্থাপন করেছেন। নাটকটি সম্পর্কে নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্য—

> 'তৃষ্ণায়' নাটকের রচনাকাল ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬। পাশাপাশি নাটকটি ইংরেজিতেও লিখি। 'The Survival' নামে নাটকটি এ সময় ইংরেজি সাপ্তাহিক Holiday-তে প্রকাশিত হয়। 'তৃষ্ণায়' এর উপজীব্য বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোককাহিনী শিয়াল ও কুমীর ছানার গল্পকে নিয়েই। আমার ধারণা কোনো রূপকথা বা লোককাহিনী সমকালীন সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে না যদি না সে গল্প সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক বা অর্থবহ হয়ে ওঠে। সে সময়ে দেশ, সমাজ এমনকি আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও চিরন্তন প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত একটি সমস্যার প্রেক্ষিতে শিয়াল ও কুমীর ছানার গল্প আমার কাছে ভীষণ জীবন্ত বলে মনে হয়েছে। এ সমস্যা হলো মানুষের অস্তিত্বের এবং টিকে থাকার সমস্যা। বড় মাছ ছোট মাছকে উদরস্মাৎ করে, বৃহৎশক্তি ক্ষুদ্র শক্তিকে ধ্বংস করে, এই তো স্বাভাবিক এবং চিরন্তন সত্য। ডারউইনও তাই Survival of fittest-এর থিয়োরী দিয়েছেন। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো সত্যি কি তাই? শিয়াল পণ্ডিত ও কুমীরের সাতটি ছানাকে আমাদের জীবন নাট্যের অঙ্গনে আমি যেন এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পেলাম। ক্ষিপ্র বুদ্ধির অধিকারী এবং টিকে থাকার সংগ্রামে পৃথিবীর সুযোগ্য সন্তান শিয়াল কি এমনি করে কুমীরের অসহায় শিশুদের উদরস্মাৎ করে যাবে, নাকি মা কুমীর তার প্রজনন যন্ত্রাগারে সাত নয়, সত্তর নয়, হাজার হাজার সন্তানদের জন্ম দিয়ে শিয়ালের মোকাবিলা করবে। শিয়াল আর কত খাবে, একদিন নিশ্চয়ই বিতৃষ্ণা আসবে, খেতে খেতে অসুস্থ হয়ে পড়বে।
>
> শিয়াল ও কুমীর ছানার গল্পকে অপরিবর্তিত রেখে আমার নিজস্ব ব্যাখ্যায় ও দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নাটক লেখার তাগিদ অনুভব করলাম, ফল—তৃষ্ণায়।[৩৩৫]

নাটকের ভূমিকায় নাট্যকারের দর্শন সুস্পষ্ট। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকার সমস্যা চিরন্তন। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব জাতি নানা অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থেকেছে। ক্ষুদ্রশক্তি সব সময়ই বৃহত্তর শক্তির করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছে। গাধার সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন—

> গাধা : এই ত কেবল সেদিন, এক মাকড়সা এক পিপঁড়ে খেলো। সেই মাকড়সাকে বিড়াল খেলো, বিড়ালটাকে কুকুর খেলো, আর কুকুর গেলো হায়েনার মুখে, সর্বশেষে হায়েনা সাবাড় হল বিরাট এক বাঘের পেটে।[৩৩৬]

লোককাহিনী ভিত্তিক এ নাটকে তিনি সাফল্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য ফর্মের দৃঢ় পিনবদ্ধতার সঙ্গে প্রাচ্যধারার দেশীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের নাট্যসৃষ্টি ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। দেশজ

---

৩৩৫. সাঈদ আহমদ, তৃষ্ণায়, রচনাকাল ১৯৬৪—১৯৬৬। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ : বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯ পরবর্তীতে তৃষ্ণায়, 'সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভূমিকা, দ্রষ্টব্য

৩৩৬. তৃষ্ণায়, সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

লোক-কাহিনীর যথাযথ ব্যবহারে তিনি সফল কাম। দেশজ লোক কাহিনীর ব্যবহারে নাট্যকার তাঁর আধুনিক চেতনাজাত বোধ ও বোধির স্বার্থকতম প্রয়োগ করেছেন।[৩৩৭]

'তৃষ্ণায়' নাটকে সাঈদ আহমেদ অস্তিত্ববাদ ও অধিবাস্তববাদের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। শিয়াল ও ফুকরো দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের জৈবিক, অন্ধকারময় অধ্যায়গুলো প্রতিভাসিত হয়েছে। ক্ষমতালোভী, আত্মপ্রতিষ্ঠায় অভিলাসী স্বার্থান্ধ মানুষের মনোজগতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রূপকে তিনি ইউরোপীয় অ্যাবসার্ডধর্মী আঙ্গিকে মূর্ত করে তুলেছেন—

শেয়াল : (বৃক্ষের প্রতি) ... তাহলে বল আমার কেন এত ক্ষুধা? কেন পারি না লোভ সংবরণ করতে? জবাব দাও, ঐ বাচ্চাদের মাংস এতো সুস্বাদু কেন? হয়তো বলবে আমার প্রবৃত্তি অতি নীচু। সত্যি বলছি প্রকৃতিকে জয় করা দুরূহ। ...কোনোদিন কি পেরেছ এই প্রকৃতির মোহন ফাঁদ আর শঠতাকে বানচাল করতে? বাচ্চাদের দিকে তাকালে চোখে পানি আসে। গোটা শরীর হিম হয়ে যায়। তাদের দূরে ঠেলে দিই। আমার সোনা মানিকের দল। হঠাৎ কখন দানবটা জেগে ওঠে। ক্ষুরের ধার আসে দাঁতে, দুরন্ত জঠর কাঁচা মাংসের নেশায় হয় উন্মত্ত। (ফুকরোর প্রবেশ) ওদের জীবন যে কত তুচ্ছ তা' ত জানিই। নির্বোধদের কোনো অধিকার নেই জঙ্গলে ভিড় বাড়ানো। যত সব বোকারা কেন আমাকে ছেঁকে ধরেছে?

ফুকরো : মৌন থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। তবে মান্যবর ওস্তাদ যদি আদেশ করেন মুখ খুলতে পারি। পরিষ্কার বলবো যে ঐ বোবা, কালা স্থবির বোধিবৃক্ষ থেকে কেউ কোনো জবাব পায়নি।

শেয়াল : তুমি কি আড়াল থেকে আমার কথা শুনেছিলে?

ফুকরো : ওটা বর্বরদের কাজ। ভাবের যোগাযোগ আরও অনেক ভাবে হ'তে পারে। তোমার অস্তিত্বের মহৎ ছায়ায় আমি এতো সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছি যে দূরে থাকলেও তোমার গতির, চিন্তার, ভাবের স্পন্দন আমার দেহে লাগে।

শেয়াল : বল ত এই মুহূর্তে আমি কি ভাবছি?

ফুকরো : ছাইভস্ম।

শেয়াল : বৎস কঠোর হয়ো না। আমি এক মারাত্মক আতঙ্কে ভুগছি। কোনো সোজাপথ চোখে ঠেকছে না। সত্যের উৎস খুঁজছি। ভয় হয়, পান করলে নিদারুণ বিষবৎ লাগবে।

ফুকরো : কেবল নিজেই নিজেকে সাহায্য করতে পার। যা করে ফেলেছ তা' কেউ বদলাতে পারে না। তোমার কর্মভাগ্য কারো সঙ্গে বিনিময় করা অসম্ভব।[৩৩৮]

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন লোভী শৃগাল ছলনার আশ্রয় নিয়ে নির্বোধ কুমীর মাকে শোষণ করে ছয়টি শাবককেই উদরস্মাৎ করেছে। কিন্তু সপ্তম শাবকটি শিয়ালের অপকম সম্পর্কে অবগত হয়েও শিক্ষাগুরু শিয়ালকে রক্ষা

---

৩৩৭. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭
৩৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮

Dhaka University Institutional Repository

করতে চায়। ফুকরো চরিত্রের ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সমকালীন স্বদেশ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট স্মরণ করেছেন। ধূর্ত শৃগালের সাহচর্যে কুমীর শাবকের যে ক্রম রূপান্তর ঘটেছে নাট্যকার তা তুলে ধরেছেন ফুকরো ও কুমীর মা'র আলাপচারিতায়—

ফুকরো : তোমার কথাবার্তায় প্রমাণ হচ্ছে যে তুমি উচ্চশিক্ষার অলৌকিক মহিমা মোটেই বুঝতে পারনি।

মা : কেমন করে?

ফুকরো : তুমি উপলব্ধি করতে পারছ না যে আমরা যা ছিলাম তা আর নেই। আমাদের স্বভাব আর মণীষা দুই অসাধারণভাবে বদলে গেছে।

....

ফুকরো : ... কিন্তু সেটা তোমার দুনিয়া। আমাদের পৃথিবী অন্য। তোমাদের ওখানে একেবারে বেখাপ্পা মনে হবে। কি কথা বলব ওদের সঙ্গে 'আপনি কেমন আছেন, কখন এসেছেন, কোথায় থাকেন, কখন যাবেন, শুধু এইই। কত অর্থহীন। আমি নির্জনতা বেছে নিয়েছি।

মা : বাছা আমার, তুমি সত্যিই অনেক বদলে গেছ। তোমার আত্মীয় খেলার সঙ্গী আর মুরুব্বীদের জন্য একটুও মন টানেনা?

ফুকরো : সেখানে জ্ঞানালোকের কোনো বন্ধন নেই অনুভূতি সেখানে প্রহসনের নামান্তর। আমি তাদের জন্যে আমার সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারি, বড়জোর করুণা করতে পারি তাদের। তুমি তোমার চেনা জগতে ফিরে যাও, আমাদের থাকতে দাও আমাদের পৃথিবীতে।

মা : এত নিষ্ঠুরতা। আমার ছেলেরা একেবারে বদলে গেছে। ওরা আমার সন্তান নয়। কি পাপ করেছি, কেন এমন দিন দেখতে হলো?

ফুকরো : দুঃখ করো না মা আমার। হাসিমুখে সব কিছু মেনে নেও। তোমার ছেলেরা দানবের সঙ্গে লড়ছে, এক বিরাট রোদঝলসানো মরুভূমি পার হয়েছে। এখন তারা হিমশৈলের মহাসাগরে স্নান করে পবিত্র হবে। ওদের একা ছেড়ে দাও।

....

মা : ... সবকিছুর কি এই ফল? অবিশ্বাস্য। শিক্ষা মানুষের মন থেকে ভালোবাসা শুভাকাঙ্ক্ষা আর বিবেচনা বুদ্ধি মুছে দিতে পারে না।

ফুকরো : শেয়াল আমাদের রূপান্তর ঘটিয়েছে। আমরা এক অলৌকিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পেরিয়ে এসেছি। একবার পরীক্ষায় উতরেছ কি আর আগের মতো হওয়া অসম্ভব।[৩৩৯]

---

৩৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্ব রক্ষার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় মানুষ অতীত বিস্মৃত হয় নির্বিবাদে, আধুনিক জীবনের জটিলতা, অন্তহীন সংগ্রাম মানুষকে অনুভূতিহীন, জড় পদার্থ করে তোলে। প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থার শিকার হয়ে জীবনের করুণ বাস্তবতা ও নিষ্ঠুর সত্যকে উপলব্ধি করেছে অসহায় কুমীর মা ও তার নব দীক্ষাপ্রাপ্ত শাবকটি। পুরোনো লোকজ ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ডধর্মী আঙ্গিকে নাট্যরূপ দিয়ে সাঈদ আহমদ নাট্য সাহিত্যে এক অভিনব মাত্রা সংযোজন করেছেন।

তিন অঙ্কক বিশিষ্ট এই রূপক নাটকের ভাষা আশ্চর্য রকম নিবিড় ও সংবেদনশীল। অত্যাচারিত কুমীর মা তার সমস্ত শক্তি আর সাহস সঞ্চয় করে একদিন জেগে উঠবে প্রবঞ্চক শেয়ালের বিরুদ্ধে। নাটকের শেষে মা কুমীর-এর সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সংক্ষিপ্ত ভাষায় সেই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন—

> মা : ... আমি যাচ্ছি, তোমার পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আবার আসব। সঙ্গে থাকবে সাত নয়, সতের নয়, কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশু। ওরা এখন নদীর ধারেই সোনালী রোদে স্নান করছে। রঙিন স্বপ্নে বিভোর। মায়েদের উষ্ণ বুক থেকে বাচ্চা কেড়ে নেব, প্রলোভন দেখিয়ে গর্ত থেকে বের করে আনবো। ওদের বলব ঠিক যা যা শুনেছি। তোমার দয়া, ভালোবাসা আর দরদী মনের কিস্‌সা কাহিনী দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়বে। আমি গোষ্ঠীকে নিয়ে আসছি।[৩৪০]

All-rounder with style—শিরোনামে পত্রিকায় সাঈদ আহমদ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> Bangladesh playwright and critic Sayeed Ahmed is a picture of urbanity in his four plays, which have revolutionished theater on the sub-continent, the philosophy is very firmly based in the mysticism, and the traditions of the Bengali heritage....One of them, 'Survival', is based on a traditional fairy tale and is presented in the masked folk form.[৩৪১]

সাঈদ আহমেদ 'তৃষ্ণায়' নাটকে মানব জীবনের বাস্তব সমস্যার উপস্থাপন করেছেন। 'বাংলাদেশের চির পরিচিত শেয়াল-কুমীর ছানার গল্প বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক মাত্রিকতার অনুমোদন লাভ করেছে।'[৩৪২] 'মানুষের অস্তিত্ব এবং টিকে থাকার সমস্যা' চিরন্তন। আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবজাতি তার অস্তিত্বের লড়াই-এ বেঁচে থাকার প্রশ্নে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বাংলাদেশের নাটকে এ জাতীয় চেতনা খুব সম্ভবত ব্রজগোপাল দাসের 'মেশিন ও মানুষ' নাটকে প্রথম লক্ষ্যগোচর হয়।[৩৪৩] ব্রজগোপাল দাসের এ নাটকে

---

৩৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

৩৪১. South China Morning Post Hongkong, 27th October, 1978, সংগ্রহ, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ৩৯৭

৩৪২. আবুল কাশেম, সাঈদ আহমদের নাটকে ঐতিহ্যের ব্যবহার, দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ১৩ই বৈশাখ, ১৩৮৮, সংগ্রহ, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ৩৯৭

৩৪৩. সত্যেন সেন, ঢাকা শহরের নাট্য-আন্দোলন, 'শহরের ইতিকথা' স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ১৯৭৪, পৃ. ৩২, সংগ্রহ, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

রূপকাবরণে Survival of fittest চেতনা এবং তার প্রতিকারের ইঙ্গিতও বর্তমান ছিলো। পরবর্তীকালে ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত সিকানদার আবু জাফরের একাঙ্কক নাটক মাকড়সায় এ চেতনা বর্তমান।[৩৪৪] 'তৃষ্ণায়' নাটক প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষের বক্তব্য স্মরণযোগ্য—

> 'তৃষ্ণায়' যথার্থ অর্থেই বাংলাদেশের একটি পালা বদলকারী নাটক। শিয়াল এবং কুমীরের লোককাহিনীর আড়ালে আলোচ্য নাটকে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষা। রূপকথার মাধ্যমে আধুনিক জীবন যন্ত্রণা ও শ্রেণী সংগ্রাম উপস্থাপন করে সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের নাটকের ধারায় সংযোজন করেছেন একটি নতুন মাত্রা।[৩৪৫]

'তৃষ্ণায়' সাঈদ আহমদ-এর সফল নাট্যপ্রয়াস। রূপকীয় আবরণে সমকালীন বাস্তব সত্য প্রকাশের দৃঢ় প্রদক্ষেপ।

৫০

বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে 'শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ'[৩৪৬] একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। দুটি অঙ্কে বিভক্ত নাটকটি একটি প্রতীকধর্মী নাটক। এই নাটকের চরিত্রাবলী—শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী, আনন্দ, পয়েন্টসম্যান ও স্টেশন মাস্টার।

এ-নাটক সম্পর্কে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন—

> ১৯৬৭-এর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীল ছাত্র সংস্থা SDS নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া য়ুনির্ভার্সিটিতে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিষয়ে একটি র‍্যালী ও সেমিনারের আয়োজন করে। সেই সেমিনারের মূল শ্লোগান ছিলো বিশ্বব্যাপী শান্তি। শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিলো। সেমিনার শেষে আমরা ক'জন ছাত্রছাত্রী আড্ডা দিতে বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। সে আলোচনায় পৃথিবীতে কোনো দিন শান্তি আসেনি এবং আসবেও না—এ ধরনের একটি মন্তব্য নিতান্তই হাল্কাভাবে আমি করেছিলাম। আমার বক্তব্যের সূত্র ধরে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের একজন ছাত্রী শান্তি শব্দটি স্রেফ Myth-এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তার অভিমতটি আমার চিন্তাকে আলোড়িত করে এবং পরবর্তী দু'মাসের ভেতরে আমি বর্তমান নাটকটির প্রাথমিক খসড়া তৈরি করি। অবশেষে ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বরে বর্তমান রূপ

---

৩৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

৩৪৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, নাট্যসাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫), রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, বাংলাদেশের নাট্যচচার তিন দশক, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ. ১৯৬-৯৭

৩৪৬. ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৭০ সালে নাটকটি প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালের ২৭ এপ্রিল প্রথম ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নাটকটি প্রচারিত হয়। নাটকটি চট্টগ্রামের আমেরিকান কালচারাল সেন্টার মঞ্চে থিয়েটার '৭৩ কর্তৃক ১৯৭৩ সালের ২৩ শে নভেম্বর প্রথম মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীতে 'শতবর্ষের নাটক' গ্রন্থে (২য় খণ্ড) 'শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ' নাটকটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে নাটকটি শেষ হয়। নাটকটির রচনাশৈলীতে কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য কবি ও নাট্যকার দ্বারা আমি সজ্ঞানে প্রভাবিত হয়েছি।[৩৪৭]

নাটকটি একটি মাত্র দৃশ্যে পরিকল্পিত। সুবর্ণ গ্রামের একটি ছোট জংশন স্টেশনের ছোট্ট ওয়েটিং রুমের অন্ধকারে অপেক্ষমান চারজন যাত্রী, এরা সবাই শান্তিগড়ের যাত্রী। 'যে শান্তিগড় বা শান্তি অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত, অনিকেত, হয়তো বা অভৌগোলিক। ....সুবর্ণগ্রাম নামটা বোধহয় ধন বা সেমনের প্রতীক।[৩৪৮] এই শান্তিগড় সম্পর্কে যাত্রীদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই—

আনন্দ : শান্তিগড় জায়গাটা কেমন সে বিষয়ে নিশ্চয় তোমার ধারণা আছে।

কল্যাণী : জানবো কি করে, আগে তো যাইনি কখনো।

সুন্দর : নিশ্চয়ই সুন্দর, শান্তিময়।

শুভ্রা : নিশ্চয়ই স্নিগ্ধতার আলোকে শুভ্র।

কল্যাণী : নিশ্চয় কল্যাণময় আশীবাদে প্রাণবন্ত।

আনন্দ : আশ্চর্য।

কল্যাণী : কেন !

আনন্দ : তোমরা, মানে আমরা শান্তিগড়ে চলেছি। অথচ সে জায়গা সম্পর্কে কোনো ধারণা বা জ্ঞান কোনো কিছুই আমাদের নেই। যেন অন্ধের মতো পথ হাতড়িয়ে চলা আমাদের।

কল্যাণী : আমাদের ইচ্ছাই আমাদের পথপ্রদর্শক।

সুন্দর : আমাদের এই মহৎ ইচ্ছার জয় হবেই।

শুভ্রা : ছোট্ট হলেও স্টেশনটির নাম কিন্তু বড়ো সুন্দর—সুবর্ণ গ্রাম। কোনোদিন, অনেককাল আগে এখানে সোনা ফলতো অজস্র।[৩৪৯]

চরিত্রগুলো প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। ছোট্ট একটি ওয়েটিং রুমে বসে চারজন নিজেদের অতীত ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে মুক্তি প্রার্থনা করেছে। মাঝে মাঝে পয়েন্টসম্যানের গল্প বলা তাদের অন্তহীন প্রতীক্ষার মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ এনেছে। এই গল্পের সত্যাসত্য যে জানেনা, সে বহুদিন ধরে বাপদাদার মুখে শুনে এসেছে, গ্রামের এক বুড়ি ধানশীষ আর পায়রার সন্ধানে দীর্ঘদিন ধরে কৌটার মুখ খোলার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শান্তি রাণীমার আত্মহত্যার গল্প, পঞ্চবটির কোটরে লুকিয়ে থাকা অত্যাচারী ছয়টি ইঁদুরের গল্প, একশো চব্বিশ হাজার মহাজনের শান্তিগড়ের ট্রেন ধরার অপেক্ষা—শান্তিগড়ের যাত্রীদের মনে নানা ভাবের সৃষ্টি করেছে।

---

৩৪৭. নিবেদন, শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ দ্রষ্টব্য

৩৪৮. আবু ফজল, একটি প্রতীকী নাটক, 'শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ' দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১লা নভেম্বর ১৯৭০, সংগ্রহ, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, পৃ. ৩৯৮

৩৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬০

Dhaka University Institutional Repository

শান্তির রাজ্যে পৌছুতে পবিত্রতার প্রয়োজন। অথচ যাত্রীরা কেউ নিষ্কলঙ্ক নয়। শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ নামের রূপকল্প বহন করলেও তাদের চরিত্রে তা অনুপস্থিত। তাই তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত গ্রাম শান্তিগড়ে পৌছুতে পারেনি। ওয়েটিং রুমের অন্ধকারে তারা চারজন অপেক্ষমান—

শুভ্রা : ... যেন অনন্ত কাল থেকে।

সুন্দর : ... যেন অন্তহীন কাল থেকে।

কল্যাণী : ... যেন অনাদি কাল থেকে।

আনন্দ : ... যেন নিরবধি কাল থেকে।[৩৫০]

সুবর্ণগ্রাম রেলস্টেশনের ছোট্ট ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমান চারজন যাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের শুরু এবং অপেক্ষমান চারজনের সংলাপের মধ্য দিয়েই নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে।

প্রতীকধর্মী এ নাটকে 'সুলিখিত সাহিত্য পাঠের অনাবিল স্বাদ ও আনন্দ'[৩৫১] বর্তমান। জিয়া হায়দারের 'শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ' সংলাপ রচনার দক্ষতায় হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

ভাষা আন্দোলনের পর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে বাষট্টিতে। স্বৈরাচার বিরোধী এ আন্দোলন ধীরে ধীরে ছাত্রজনতার বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত হয়। পাশাপাশি পাক-শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপও অব্যাহত ছিলো। শাসকশ্রেণী তাদের অবাধ শাসন ও শোষণের লক্ষ্যে তাদের কিছু কিছু আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আংশিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দেয়। আধুনিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ প্রাগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মকাণ্ডে তারা নানাভাবে বাধা প্রদান করতে থাকে, তবুও ছাত্র-জনতার আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ষাটের দশকের পুরো সময়টাই ছিলো ছাত্র-জনতার আন্দোলনের তরঙ্গিত অধ্যায়। এই সময়ে সামরিক শাসনে অবরুদ্ধ থেকে গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী প্রগতিশীল মধ্যশ্রেণীর নাট্যকর্মীরা সামাজিক ন্যায় বিচার ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবিতে যতটা উচ্চকিত ছিলেন তাদের সেই রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রতিবাদের ধারায় কিছুটা ভাটা পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় ভাবচেতনা ও নাট্যকৌশল প্রবর্তন করতে তারা অধিক উৎসাহী হয়ে ওঠেন। কেউ বা রূপকের আশ্রয় নিলেন, কেউ বা ইউরোপীয় নাট্যাঙ্গিকে তাদের নাটকের কাহিনী সাজিয়েছেন, আবার কেউ কেউ ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রেক্ষাপটে সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়কে তুলে ধরেছেন। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটকে দেশকাল, রাজনৈতিক সংঘাত ও সমাজ জীবনের বিচিত্র চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, এ সময়ে রচিত নাট্যসমূহ বাঙালি জাতির জীবনালেখ্য হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

৩৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০৬

৩৫১. একটি প্রতীকী নাটক, শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১লা নভেম্বর ১৯৭০, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ

পাকিস্তানি শাসকবর্গের শাসন-শোষণে সমাজের নানা স্তরের মানুষের জীবনে নেমে আসে চরম সঙ্কট। এই নির্মম অসহায়তার শিকার হয় শহরের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শ্রমজীবী শ্রেণীর দল। রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শহর-গঞ্জ-গ্রাম সর্বত্র জনজীবনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, গড়ে ওঠে বিভিন্ন সংগঠন। দেশবাসীর স্বার্থকে সামনে রেখে জন্ম নেয় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, গড়ে ওঠে আন্দোলন, সংগ্রাম। এই সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই রাজনৈতিক সংগঠনকে ছাড়িয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আওয়ামী লীগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা পেশ করলে দ্রুত আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। এ নির্বাচনে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ব বাঙলার জনগণের আস্থা শেষ হয়ে যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের কথা হলেও ভুট্টোর পরামর্শে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরের তাল বাহানা শুরু করেন। এতে পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই ঝড় শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে--যার ফলশ্রুতিতে ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগের পূর্বে সেনাবাহিনীকে এদেশের জনসাধারণের উপর লেলিয়ে দিয়ে যান। শুরু হয় ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়—অমানবিক নির্যাতন, নারীধর্ষণ আর হত্যাযজ্ঞ। প্রায় এক কোটি মানুষের দেশত্যাগ ও উদ্বাস্তু জীবন আর ছয় কোটি মানুষের নিজ দেশে পরবাস। বাঙালির তীব্র প্রতিরোধ সংগ্রাম, সম্মুখ সমরে বাঙালির অমিতবিক্রম, আত্মত্যাগের অপরিসীম মহিমা নিয়ে সমকালে কিছু কিছু মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের লোমহর্ষক ঘটনা ও পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী সাহিত্যের পাতায় স্থান পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত নাটক 'জল্লাদের দরবার' স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে। চট্টগ্রাম কলেজ মঞ্চে লাল দীঘির মাঠে ও প্যারেড ময়দানে যথাক্রমে 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'এবারের সংগ্রাম' নাটক দু'টি মঞ্চস্থ করা হয়। এই রূপকাশ্রয়ী নাটকের বিষয় হয়েছে তৎকালীন অবাঙালি শাসকদের অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মানুষের চেতনা। মমতাজ উদ্‌দীনের এ নাট্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে মুহম্মদ জাহাঙ্গীর লিখেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> স্বাধীনতা আন্দোলনের অব্যবহিত আগে, যথাক্রমে ১৪ ও ২১ মার্চ ১৯৭১, মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ রচিত নাটক দুটির শিল্পমূল্য যাই হোক না কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনাবাহী নাটকের পথিকৃৎ হিসাবে ঐতিহাসিক মূল্যের দাবী রাখে।
>
> এখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বললে হয়তো তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই নাটক দুটি চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দান ও লালদীঘি ময়দানে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে অভিনীত হতে দেখেছিলাম। নাটক যে গণ-আন্দোলনকে কীভাবে সরাসরি উদ্দীপ্ত করতে পারে তা আমার মতো অনেকেরই প্রথম ধারণা হয়েছিল সেদিন।[১]

মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে কল্যাণ মিত্র লিখলেন—একটি জাতি একটি ইতিহাস। বাংলাদেশ বেতার থেকে ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাত পৌনে দশটায় আলাউদ্দিন আল আজাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক 'নিঃশব্দ যাত্রা' প্রচারিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ লিখলেন 'বর্ণচোরা' নাটকটি। ২৩ জুলাই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত হয় আলাউদ্দিন আল আজাদের বেতার নাটক 'নরকে লাল গোলাপ'। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নিগৃহীতা নারীদের নিয়ে নাটকটি রচিত। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে ১৯৭৪ সালে সৈয়দ শামসুল হকের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কাব্যনাট্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব থেকে মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত কাল পরবর্তী সময়ের মধ্যে রচিত নাট্যসমূহে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে—মুক্তিযুদ্ধের নাটক আলোচনায় সেটি তুলে ধরা সম্ভব।

১

'স্বাধীনতার আমার স্বাধীনতা' মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রচিত নাটক। নাট্যকার মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ একাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে এই নাটকটি রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য—

> স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের হাতিয়ার ছিল নাটক। খোলা মাঠের উদোম মঞ্চে স্বাধীনতার জন্য নাটক। মঞ্চের তিন দেয়াল, আলোর ঝকমকানি, অভিনয়ের সুধা তখন বাঞ্ছিত ছিল না, নাটককে সরাসরি মাঠে নামতে হয়েছে ফাল্গুনের খোলা বাতাসের মতো, গ্রীষ্মের নিকটবর্তী সূর্যের মতো। ছলাকলা দিয়ে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এবং বৈশাখের খরতাপকে তো সম্মোহিত করা যায় না।[২]

---

১. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ। নাটক বিষয়ক পঠিত প্রবন্ধের ওপর-আলোচনা। একুশের প্রবন্ধ ১৯৮৮, পৃ. ১২৭-১২৮

২. মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম তিনটি নাটিকা একত্রিত করে 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাম দিয়ে বাংলা একাডেমী গ্রন্থটি প্রকাশ করে। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৭, গ্রন্থ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামের রক্তাক্ত পোস্টার 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'। নাটকটি ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম কলেজ মঞ্চে মঞ্চস্থ করা হয়েছে। নাটকটির কাহিনী নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা লেডী গ্রেগরীর রাইজিং অব দি মুন অবলম্বনে রচিত। রূপান্তর নির্বিচার স্বাধীনতা নিয়ে নাটককে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্পৃহায় সংস্থাপন করতে চেয়েছি।[৩]

নাটকটিতে চারটি চরিত্র সংযোজন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের এ নাটকটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সামান্য বেতনভুক্ত ছোট দারোগা নূর মোহাম্মদ সরকারের নির্দেশে বিপ্লবী নেতা, গরিবুল্লাহর ছদ্মবেশধারী মোয়াজ্জেম হোসেনকে ধরার জন্য রাত্রে ফেরীঘাটে টহল দিচ্ছিল। সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। নূর মোহাম্মদ একটানা চব্বিশ বছর ধরে চাকরি করে চলেছে, কোনো প্রমোশন পর্যন্ত হয়নি। নাট্যকার নূর মোহাম্মদের একটি সংলাপের মধ্য দিয়ে তার দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন—

> লোক ॥ মালিক, আপনার মতোন দুঃখী মানুষ কম দেখেছি।
>
> নূর ॥ তুমি খুব রসের কথা বলতে পার গরিবুল্লাহ। কিন্তু পাবলিকের ধারণা পুলিশের চাকরি খুব সুখের চাকরি। আমার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। একটাও লায়েক হয়নি। বড় মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে কমসে কম দু'তিন হাজার টাকা খরচ হবে।[৪]

বিপ্লবী নেতাকে ধরার জন্য নূর মোহাম্মদ তার দু'জন সহযোগী দলিলুর রহমান ও আবদুল বারেক মণ্ডলকে নিয়ে ফেরীঘাটে অপেক্ষা করতে থাকে। তার দু'জন সহযোগী পোস্টার লাগায় তেলের পিঁপেতে। পাহারারত অবস্থায় তারা বিপ্লবী নেতা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে—

> দলিল ॥ লোকটার মধ্যে যে কোন জাদু আছে, মরা মানুষ পর্যন্ত কবর থেকে উঠে আসে, রাষ্ট্রভাষা আর গণতন্ত্রের নামে পুলিশের গুলীর সামনে খাড়া হয়ে যায়।
>
> নূর ॥ গুলী করবার হুকুম থাকলে দেখতে কত লাশ বানিয়ে দিতাম। কী যে সব পলিসি। দেশের ছেলেপেলেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ব্রেন খালি হয়ে গেল এসব কার ক্ষতি? আমার ছেলে যদি এসব ধর্মঘট করে ঘরে ঢোকে, কুত্তার বাচ্চাকে জবাই করে ফেলব। তোমাদের ছেলেমেয়েদের এসব ঝামেলার মধ্যে ঘেষতে দিও না। বুঝলে, আমার এক কথা।[৫]

---

৩. পূর্বোক্ত, গ্রন্থ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

৪. স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, পৃ. ১৩

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

....

নূর।। বিপ্লবী? তুমিও শিখে নিয়েছ বিপ্লবী। পুলিশের মগজে বিপ্লবী ঢুকে গেছে। দলিলুর রহমান তোমার কেস তুমি নিজেই কামড়ে খাচ্ছ। ওসব ভুলে যাও। বিপ্লবী নয়, বল বিদেশী চর, দেশের দুশমন, জাতির শত্রু। পুলিশের লাইনে থাকলে ফর্মা মাফিক কথা বলবে, অর্ডার মাফিক লাঠি ঘুরাবে, বুঝলে?[৬]

....

বারেক।। আমাদের সবদিকেই বিপদ। ছাত্র-ফাত্র ধরলে পুলিশকে পাথর মারবে, দেশের দুশমনকে ধরতে না পারলে সরকারকে জবাবদিহি কর—পুলিশের চাকরি একটা হারামী চাকরি স্যার।

নূর।। মণ্ডল, তোমার কথাতে বদগন্ধ ঢুকেছে। বুকে সাহস রেখে ঈমানের সঙ্গে কাজ কর। আমরা হলাম হুকুমের টহলদার। আইন আদালতের হেফাজতি পুলিশের ঈমানের কাছে। এই গুলীভরা রাইফেল তোমার ঘাড়ে ঝুলছে কেন? ডিউটি কর। পরিষ্কার মন নিয়ে আমরা যদি ডিউটি না করি তাহলে দেশটার কি হবে মণ্ডল। এদেশে যারা হুকুম আহকামের মালিক, ধন দৌলত কল কারখানার মালিক, তারা যে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে সে তো আমরা ডিউটি করছি বলে। এসব হলো সৃষ্টি কর্তার বিধান। ধনী আর গরিব। সব তকদীর। গরিব কখনও ধনী হতে পারে না। দেশের ইজ্জত রাখবার জন্যই ধনীর কাছে ধন থাকা দরকার। পুলিশের উপর হুকুম আছে ধনীর ধন সামলাও, জোতদারের গোলা পাহারা দাও। বহুৎ দিনের আইন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার বাপ এই আইন চালু করেছে। এসব ইতিহাস তোমরা বুঝবে না মণ্ডল। না, তোমরা আর দেরী করনা, কাগজ নিয়ে চলে যাও। এই গঞ্জের হাটের গাছে গাছে ভাল করে বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে দাও। বড় বড় দোকানের দেয়ালে সেঁটে দিও। জলদি কর। দেশের নিরীহ আহম্মক জনসাধারণ জানে না আমাদের সরকারকে কত দিকে নজর রাখতে হয়। এদেশে ওসব চ্যাংড়ামি ছোকরামি চলবে না। সরকার বাহাদুর বিপ্লব টিপ্লব হতে দিবে না। দরকার হলে লাখ মানুষের জীবন যাবে কিন্তু দেশের ভাগাভাগি চলবে না। যাও। জলদি জলদি ফিরে আসবে।

[বারেক আর দলিল পোস্টার ও আঠা নিয়ে চলে গেল]

দু' হাজার টাকা পুরস্কার। কম কি। আজ যদি লোকটাকে ধরতে পারি, প্রমোশন হবেই। এক ধাক্কাতে ইন্সপেক্টর। শেষ বয়সে একটুকু শান্তি পাব। কোনো দিন তো ভস্ করে মরে যাব। আমার কাছে ওসব দেশপ্রেম, দেশের মনি বলে পার পাবে না সে। চাচা আপন জান বাঁচা। শুনলাম তুমি দেশের মানুষের জন্য কাজ করছ, কর। আমি আমার কাজ করছি। তোমর দেশপ্রেম করলে আমার ছেলেমেয়ে না খেয়ে মরবে।[৭]

---

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবী নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন গায়েন গরিবুল্লার ছদ্মবেশে ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সুকৌশলে নূর মোহাম্মদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। নিজেকে একজন গায়েনের পরিচয় দিয়ে এদেশের মানুষের সুখ-দুঃখের কথা নূর মোহাম্মদের কাছে ব্যক্ত করেছেন—

লোক॥ হামার বাপজান বলতো গরিবুল্লাহ, বেটা অনাহক যারা তাল ঠুকে, তারা খুব বড় কিসিমের গায়েন নয়। কথাটা ঠিক না বেঠিক একবার পরখ করবেন মালিক। হামাদের এই ভাঙা ফুটা শরীল নিয়ে তামাম মানুষ যদি এক জায়গাতে হাজির হতে পারতাম, একবার যদি জালেমের লোভের কব্জিতে দাঁত বসাতে পারতাম, রক্তের নেশাতে গজরাতে পারতাম, তখন বুঝা যেত কারা বিলাই আর কারা বাঘ। যুদ্ধই তো হয় না মালিক, মরণ বাঁচনর লড়াই। হামারা এই নদীর দেশের মানুষ একটা যুদ্ধ চাই মালিক, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ।[৮]

নূর মোহাম্মদ ব্রিটিশ আমলের ছাত্র, ইংরেজ তাড়াবার জন্য সেও সংগ্রাম করেছে, বর্তমানে সে পাকিস্তান সরকারের গোলাম। সে সবকিছু বোঝে কিন্তু কঠিন শৃঙ্খলে তার হাত পা বাঁধা। তার একটি সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার নূর মোহাম্মদের স্বদেশ প্রেমের চিত্র তুলে ধরেছেন—

নূর॥ ...যদ্দিন বাঁচব দেশের জন্য কাঁদব। দেশকে ভালবাসাতো পাপ নয়। যারা স্বাধীনতা, তোমার আমার স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে তাদেরকে আমিও ভালবাসি গরিবুল্লাহ।[৯]

গরিবুল্লাহ নূর মোহাম্মদকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন সে যে মোয়াজ্জেম হোসেনকে ধরবার জন্য রাত্রি জেগে টহল দিচ্ছে সে আসলে একজন বাঙালি, সরকার কৌশলে একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে মরণঘাতী সংগ্রামে লেলিয়ে দিয়েছে। নূর মোহাম্মদ নিজেও সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছে—'তুমি আমি একটা জাতি আর তোমার সরকার আর একটা ভিন্ন জাতি।[১০]

নূর মোহাম্মদ এদেশের সন্তান, সে সরকারের চক্রান্ত বোঝে, পেটের দায়ে সারাজীবন ধরে সরকারের গোলামি করে চলেছে। সে একজন দেশপ্রেমিক, কিন্তু বাস্তবের কঠিন সংঘাতে তার সেই অন্তরের আগুন এতদিন চাপা পড়েছিল, বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে সে চিনতে পেরেছে। তাকে হাতে পেয়েও সে তাকে ছেড়ে দিয়ে তার চলার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে—

...তুমি বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেন, স্বাধীনতার সৈনিক।

নাটকের শেষে নূর মোহাম্মদের সংলাপের মধ্য দিয়ে জনমনে যে বিপ্লবী চেতনার সঞ্চার হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে—

---

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

> ...আমি নিজেই বড় সাহেবের কাছে হাজির হব মিঞা। বড় সাহেবকে বলব, জ্বি হ্যাঁ আমি নূর মোহাম্মদ ছোট দারোগা, বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে ছেড়ে দিয়েছি আর আমার সিপাহী দলিলুর রহমানকে গুলী করেছি। আর কী বলব? আমি শালা আবার কে যে আমাকে এত কতা বলতে হবে? ঐ যে চাঁদটা জানে আমার আর কোনো কথা বলার দরকার নাই। ডিউটি ইজ ডিউটি।[১১]

বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেন আর কেউ নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার বজ্রকণ্ঠের ডাকে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালি।

২

'এবারের সংগ্রাম' ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চে রচিত। ৭ মার্চ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রস্তুতি নেবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। সেই ঐতিহাসিক ভাষণেই তিনি বলেছিলেন—'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' যুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে, পথে পথে জনতার মিছিল। মিছিলের শ্লোগান ছিল, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

মমতাজ উদ্দীনের 'এবারের সংগ্রাম' নাটকটি ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ, চট্টগ্রাম লালদীঘির মাঠে মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটকের মধ্য দিয়ে তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। ক্ষমতা লাভের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেন। দেশবাসীর কাছে জনদরদি নেতা হিসাবে পরিচয় দিতে চেষ্টা করলেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে তিনি যে ভাষণ দিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হলো—

> My Dear countrymen,
>
> I addressed you last on July 28. Since then a number of developments have taken by my Government to lead the country forward towards the main objectives that I had out lined in that address.
>
> ....

---

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

> Now I come to the political and constitutional problems facing this country. In my last address, I had expressed the hope that the political leaders of the country would come up with a consensus on certain major issues relating to our future constitution. It is regrettable that they have not been able to do so, but one can understand and appreciate their difficulties. I had, however, continued with my discussions with individual political leaders and other concerned with these problems since I spoke to you last and while no formed consensus has been produced, I am now fully aware of the views that various people held on these important matters.[১২]

এবারের সংগ্রাম নাটকে বাদশাহের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মমতাজ উদদীন ইয়াহিয়া খানের সেই ভাষণের ব্যাঙ্গাত্মক রূপ তুলে ধরেছেন—

বাদশাহ॥ আস্সালামু, আলাইকুম। প্রিয় দেশবাসী, ভাইয়ো, আউর বহিনো। আমি কে? আমি হলাম এই দেশের বাদশাহ। এই যে মস্ত বড় দেশের লম্বা-চওড়া দেখছ, আমি এর তামাম জানমালের মালিক। আমি কী করতে পারি? আমি সবকিছু করতে পারি। যদি বলি তোমরা চুপ করে আমার হুকুমে বসে থাক, তোমরা বসে থাকবে, আর যদি বলি খাড়া হো যাও, তোমরা খাড়া হয়ে যাবে। যদি খাড়া না হও তাহলে? তাহলে আমার সিপাহ সালারকে বলবো ডাণ্ডা লাগাও। ব্যাস, ডাণ্ডা দিয়ে তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা বানিয়ে দেবে। তখন কী হবে? লহুর দরিয়া বহে যাবে। সেটা কি ভালো হবে? কভি নাহি। আমি খুব খুব জ্ঞানী বাদশাহ্। আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা, সুবে সাঁঝে কদুর তেল ঢালি, তামাম আগুন বাহির হয়ে যায়। আমি যদিও বাদশাহ্, তবুও দিল আমার খুব সাফ। কোন ময়লা নাই। আমি সেই পাক দিলে তোমাদের বলেছিলাম, হে পেয়ারা দেশবাসী, তোমরা কিছু কাজ নিজেরা কর। আমার রাজ্যের মধ্যে কোন হৈ চৈ করো না। সাবাস। আমার দেশবাসী, তোমরা আমার কথা শুনেছ আমি তোমাদের দরাজদিলে দোয়া করছি।[১৩]

বাদশাহ্রূপী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মুখোশ খুলে গেছে, তার সমস্ত ছলচাতুরী পূর্ববাঙলার মানুষের কাছে গোপন থাকেনি। 'এবারের সংগ্রাম' নাটকের উজীর-এর সংলাপে সেটির কদর্যরূপ ধরা পড়েছে—

উজীর॥ বহুত দিন আগেই টের পেয়েছে মালিক। পূর্বদেশে ঝড় তুফানে যখন দশলাখ লোক সমুদ্দুরের পানিতে মরে গেল, আমরা কেউ দেখতে যাইনি, ওদের পেটে খাবার নাই, আমরা খেতে দেইনি, ওদের ছাত্রদের গুলী করে

---

১২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (২য় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৬

১৩. মমতাজ উদদীন, এবারের সংগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

> মেরেছি। ওদেশে কলকারখানা করিনি, বন্যাতে সয়লাব হয়ে গেল, আমরা এখানে শুকনাতে বসে ফিক ফিক করে হেসেছি হুজুরে হামরাহি। এই এমন সব ইলজাম দিল যে, লা জবাব হয়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি শুকিয়ে হাড়ডি হয়ে গেল।[১৪]

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ১২ নভেম্বর রাত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের উপকূলে এক ভয়াবহ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। এ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১০ লক্ষাধিক লোকের (মতান্তরে ১৫/২০ লক্ষ) সলিল সমাধি হয় এবং বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষতি সাধনসহ প্রায় ৩০ লক্ষ লোক ছিন্নমূল হয়ে পড়ে। এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগণিত মানুষের মৃত্যুর জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতা ছিল অনেকাংশে দায়ী। আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে বাহু মানব দরদি ছুটে আসেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল নেতাই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে নীরব থাকেন।[১৫]

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে আসছিল। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়েছে, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। 'এবারের সংগ্রাম' নাটকে উজীরের সংলাপে সেই বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠেছে—

> ...আমাদের এক একটা উদভূট্টি গাঁও গেরাম রাজধানী বানাবার নাম করে আমরা রাতারাতি আজদাহা শহর আর বন্দর বানিয়ে তুলছি, আমরা শুধু এখানে মিল কারখানা গড়ছি, সব অচল হয়ে যাবে মালিক।[১৬]

পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত মুনাফা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বড় বড় কলকারখানা গড়ে ওঠে। এবারের সংগ্রাম নাটকে বাদশাহের ধামাধরা উজিরের সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন শাসক বর্গের শোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে—

> ...ধন-দৌলত, তেজারত বাণিজ্য, রাজধানী সৈন্য সিপাহী সব তো আমাদের এখানে আমরা হলাম বাদশাহ্, আমরা মালিক। ঐসব গরিব ন্যাংটা বদবুওয়ালা প্রজাদের কাছে গেলে দুনিয়ার আর বাদশাহ্রা আমার মুখে লানৎ দিবে, থুথু ছিটাবে।[১৭]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ ঘোষণা করেন, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। এই একই দিনে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে নতুন সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নর নিযুক্ত করার কথা ঘোষিত

---

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১৫. কে. এম রাইছউদ্দিন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৯৪, পৃ. ৬৬৯

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

হয়। বেলুচি-নিধনকারী হিসেবে টিক্কা খানের কুখ্যাতি ছিল। সেই টিক্কা খানের উপর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। 'এবারের সংগ্রাম' নাটকেও দেখা যায় বাদশাহ্ সিপাহসালার এর হাতে পূর্বরাজ্যের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন—

> তুমি আমার আন্ধার ঘরের চেরাগে রৌশন যাও আমার পূর্বরাজ্যের মালিক। আজীজ দোস্ত আমার। এক্ষুনি এলান করে দিচ্ছি। তুমি আমার প্রতিনিধি। আমার দোস্ত দুশমন সবাই তোমাকে কুর্ণিশ করবে। তুমি যা কিছু আদেশ করবে পূর্বরাজ্যের তামাম জীবকে সেই আদেশ বিনা ওজরে মানতে হবে। যদি না মানে, তাহলে তোমার যখন যাকে ইচ্ছা, যেমন করে ইচ্ছে জবেহ করে দাও, চাবুক লাগাও।[১৮]

১৬ মার্চ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার প্রারম্ভে ইয়াহিয়া খান সংঘটিত সকল ঘটনাবলীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উদ্ভুত রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্যে আগ্রহ দেখান। কিন্তু আলোচনার গতি সন্তোষজনক নয় মনে করে ঐদিন রাত্রে তিনি লেফটান্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। ঐ আলোচনা বৈঠক ১০ দিন ধরে চলতে থাকে। আলোচনার নামে চলে সময়ের অবক্ষয় ও প্রহসন। আলোচনার শেষ দিকে প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে ভূট্টোও এ ষড়যন্ত্রে শরিক হন। কড়া সামরিক প্রহরাধীনে ঢাকা বিমান বন্দরে, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে নতুন নতুন পাকিস্তানি সৈন্য ও অস্ত্র শস্ত্র আনা হচ্ছিল। সকল প্রস্তুতি পর্ব শেষ হওয়ার পর ২৫ মার্চ তারিখে আলোচনা সমাপ্তি ঘোষণা না করেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর দলবলসহ রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেন। পালিয়ে যাবার প্রাক্কালে তিনি পাক হানাদার বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে যান নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। ২৫ মার্চ মধ্য রাত্রি থেকে শুরু হয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্মম গণহত্যা অভিযান।

নিরস্ত্র বাঙালিও চুপ করে বসে থাকেনি। পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এতে অংশগ্রহণ করেছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্, পুলিশ, আনসার, যুব সম্প্রদায় ও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। 'এবারের সংগ্রাম' নাটকে 'মানুষ' চরিত্রটি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ এদেশের লাখো লাখো মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর—

> ...আমার ছেলের কাঁচা রক্তে যে দেশ ভেসে যাচ্ছে, সেই রক্তের উপর জালেমের বুট রেখে তুমি মালিক হতে এসেছ? না। আমার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে এ আকাশ এ মাঠ আর সমুদ্রকে বলে দিচ্ছি, ভাইসব, এদের চিনে রাখ, এরা ধর্মের নামে, সংহতির নামে, নানা ফন্দির জাল বিস্তার করে আমাদের শোষণ করছে। আর এদের ছেড়ে দিও না। এবার এরা ঘরে ঘরে ঢুকে প্রত্যেকের সন্তানকে হত্যা করবে। এরা খুনী। মানুষের রক্তের বিনিময়ে এরা সাম্রাজ্যবাদীদের ডেকে আনে, তোমরা এদের নির্মূল কর।[১৯]

---

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে পরবর্তী নয় মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। বাঙালিদের তীব্র প্রতিরোধের কাছে পাকিস্তানি শাসকবর্গ টিকে থাকতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত এদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। 'এবারের সংগ্রাম' নাটকের শেষে 'মানুষ' চরিত্রের সংলাপের মধ্যে নাট্যকার বাঙালিদের দৃঢ় মনোবল ও আত্মপ্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

মানুষ।। পালিয়ে যাবে কোথায়? এদেশের কোন ঘরে তার আশ্রয় জুটবেনা। মাইলকে মাইল মানুষের মিছিল নিয়ে এদেশের সবখানে ওর তল্লাশী চালাবে। খুঁজে বের করবই জুলুমবাজকে। আমার ছেলের রক্তের দাম আমি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেব। ভাইসব, সূর্যের আগুনে শরীরকে তাতিয়ে নাও। এস, ঘর ছেড়ে বাইরে এস, শ্যামল ঘাসের দেশে।[২০]

ঐক্যবদ্ধকণ্ঠ।। এবারের সংগ্রাম

স্বাধীনতার সংগ্রাম।[২১]

৩

'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটকটির রচনাকাল ২১ মার্চ, ১৯৭১ সাল। এই নাটকে নাট্যকার একদিকে যেমন পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন অন্যদিকে বাঙালিদের প্রতিবাদের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায়—

বর্গী : দ্যাখনিতো খুব মরদের কাজ করেছ। কারফিউর মধ্যে দুশমন এসে মনের সুখে দেয়ালে পোস্টার সেঁটে গেল, আর তুমি দ্যাখনি? যেখানেই নজর পড়ছে, একই লেখা এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, স্বাধীনতা মাঙছে। কেন? আমরা কি স্বাধীন না? কি দুখু মিয়া স্বাধীনতা কেন?

দুখু : আমি জানিনা বর্গীওয়ালাজী।

বর্গী : তা জানবে কেন? সব তো আমাদের জানতে হবে। এ মুল্লুকে বন্যার পানি রুখা গেলনা কেন, দায়ী এই বর্গীওয়ালা। সাইক্লোন তুফানে দশ লাখ মানুষ মরে গেল, দায়ী কে? এই বর্গীওয়ালা। তোমার সাড়ে সাত কোটি আদমের আওলা খেতে পায়না, আমি দায়ী? But why? আমি কেনরে দাদা? আমার কলকারখানা আছে, ব্যাঙ্ক ইন্স্যুরেন্স করেছি সেকি তুমি টাকা দিয়েছ? আমার মাথার মগজ খাটিয়ে, আল্লাহর মেহেরবাণীতে টাকা করেছি, পুঁজি বানিয়েছি—করেছি তো তোমার বাপের কি? উঃ তামাশা দেখ! বেশ আমি পুঁজিপতি। কিন্তু তাতেই সব দোষ আমার হয়ে গেল। আমি কি তোদের মত দিনে রাতে দু'সের চাউলের ভাত খাই? খাই তো আধপোয়া আটার রুটি আর স্রেফ দুটো আণ্ডা, রাতে আধা সের গরুর দুধ। আর

---

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

> তোরা স্বাধীনতাওয়ালারা বস্তা বস্তা ভাত, মাছ, নুন, তেল, মরিচ, খেয়ে দেশটাকে ছোবড়া ছোবড়া করে দিলি, সেদিকে তো নজর নাই। বলে কিনা, আমরা সম্পদ চুয়ে খাচ্ছি। হুকমত খাঁ, দুশমনদের শায়েস্তা করতে হবে।[২২]

বর্গীর সংলাপের মধ্য দিয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ভাষা ও সংস্কৃতির উপর যে আঘাত হেনেছিল, সেটি তুলে ধরেছেন—

> ...তোমার ভালোবাসার ভাইরা তো টাঙিয়েছে। ছিঁড়ে ফেলে পাপ ক্ষয় কর। লেখার নকশা দেখ? অ, আ, ক, খ উর্দু জবান শেখব না শিখ না। যখন দোজখের আগুনে জ্বলবি তখন বুঝবি কায়েদে আজম সাহেবের ব্রেন কত ঝকঝকে ছিল।[২৩]

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, বিনা অপরাধে শত শত লোককে গুলী করে হত্যা করেছে—

> ঝগড়ু : গুণতে গুণতে ভুলে গেলাম। একশোটা হবে। আর একশোটা পড়ে আছে।
>
> হুকমত : তো দু'শোটা। বারো ঘণ্টাতে মাত্র দু'শোটা দুশমনকে গুলী? হামার মুল্লুকের নওজোয়ানরা করছে কি! এত কম করে মারলে সাত কোটি দুশমন মারতে সতেশো সাল লেগে যাবে। পাখির বাচ্চার মতো ঠুস ঠুস করে মারবি তবে তো! আজাদী লিবে? যা ঝগড়ু বাকি লাশ ট্রাকে তুলে লাইনে চলে যা।[২৪]

ঝগড়ুর একটি সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সেই পাশবিক অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন—

> দু বোতল দারু টেনে লাশ তোলা কাজে নেমেছিনু মালিক। একটা লাশ, দশটা লাশ এমনি করে নব্বইটা লাশ উঠিয়েছি। এক বাড়িতে ঢুকে দেখি, তিনটা লাশ রক্তের মধ্যে ভাসছে। বাপটাকে তুললাম, একটা জোয়ান বেটাকে তুললাম, ফের ঘরে ঢুকলাম, দেখলাম কি মায়ের সিনা ফাটিয়ে গুলী চলে গেছে। মা জননী শুয়ে আছে, আর বাচ্চাটা মায়ের দুধে ঠোঁট লাগিয়ে লহুর মধ্যে পড়ে আছে। বাচ্চাটা তখনও ছটফট করছে। আমি পারলাম না, পালিয়ে এলাম। এমন লহু, এমন ছেলে, এমন মাকে গায়েব করতে পারব না। মালিক হামি পারব নাই। হামার দারুর নেশা কেটে গেল, মায়ের লহুতে লাল এ হাত দুটা অবশ হয়ে গেল।[২৫]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রারম্ভেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাঙলার মানুষদের নিরস্ত্র করে রেখেছে—

---

২২. স্বাধীনতার সংগ্রাম, পৃ. ৪৩
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

> রাইফেল? অস্ত্র দেব নিমকহারামের হাতে। তোমার মুল্লুক থেকে সব নিয়ে চলে যাব। দাও, চাক্‌কু সব চলে যাবে পশ্চিমে। তারপর ঘরে ঘরে ঢুকে তোদের জানমাল, ইজ্জত সব কেড়ে লিব। লাশ টেনে রাস্তায় ফেলে দেব, গিধধর কুত্তাতে খাবে তোদের মা বহিনকে আর আমরা কী করব?[২৬]

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর-এর বৃদ্ধ পিতাকে অপমান করেছে। ওদের চপেটাঘাত খেয়েও তিনি মুখ বন্ধ করে থাকেন নি—

> আর কত কাল চুপ করে থাকব। ধর্ম, একতা আর তোদের কায়েদে আজমের নামে তেইশ বছর চুপ করে ছিলাম, আর নয়। যত জুলুমই করিস না কেন, আর নয়। আর চুপ করে থাকব না।[২৭]

অসুস্থ মাকে ঘরে রেখে বৃদ্ধ বাবার খোঁজে এসে ফারুক পাকিস্তানিদের গুলীতে নিহত হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে, নাট্যকার গভীর রাতে বধ্যভূমির চিত্র তুলে ধরেছেন। পাক সেনাবাহিনীরা এদেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, গায়ক, শ্রমজীবী নির্বিশেষে হত্যা করে বধ্যভূমিতে ফেলে দিত। তাদের কোনো দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হতো না। বর্গীর সংলাপের মধ্য দিয়ে পাক সেনাবাহিনীর অপকীর্তির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে—

> আমাদের পিয়ারা ওয়াতানকে ঝড় ঝাপটা আর আবোল তাবোল হৈ হুল্লোড় থেকে বাঁচবার জন্য জান খাতরা করে হুকমত খাঁ আর তার সাথীরা যা যা করছে, সব ঠিক করছে। না হলে এ পিয়ারা ওয়াতান পায়মাল হয়ে যাবে। তোমরা কী বল! আমি সাফ দিলের মানুষ, সোজা সরলভাবে বুঝি। আর তোমরা হলে বেকুব, আহাম্মক, হল্লামাচানে ওয়ালা। তোমাদের মুল্লুকের ভাই বেরাদর জান দিল, তাতে কার কী হল? কারো কিছু হল না। বিশ্বাস কর, তোমাদের আহাম্মকী দেখে আমি দিনরাত চোখের আঁসু ফেলেছি। এত কেঁদেছি যে আমার বিবি ব্লাড পেসারের রোগী, আমার দুঃখ দেখে রক্তের চাপে বেহুঁশ হয়ে গেল। আমার বিবির জীবন এখন খয়রাতে। ভাল লাগে না ভাই, কুচ্ছু ভাল লাগে না। এসব ভাল কথা নয়। তবে তোমরা কিছু ভেব না ভাই, তোমাদের আত্মীয়স্বজনকে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দাফন করেছি। সুন্দর সাদা কাপড়ে কাফন দিয়ে আস্তে আস্তে তাজিমের সঙ্গে গোরের মধ্যে শুইয়ে দিয়েছি। সেই কাফনের কাপড় নিজের টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছি, লোবান বাত্তি ভি কিনেছি।[২৮]

পাকবাহিনীরা এদেশের নিরীহ শিল্পী, গায়ক বুদ্ধিজীবী কবিদের উপর অত্যাচার করেছে। জহুরুল তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—

> আমার আঙুলের মধ্যে চারটা করে মোটা সুঁই গলগল করে ভরে দিয়েছে। দশ হাজার পাওয়ারের লাইটের নিচে চোখ খুলে তিন দিন তিন রাত বসেছিলাম দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছে। আমার বুকে আর পিঠে তোমার

---

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫০

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

> সিপাহীরা শঙ্খ মাছের চাবুক মেরেছে, তবুও আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবো, বাঙলার স্বাধীনতার জন্য বেঁচে থাকব।[২৯]

বর্গী ও তার সহচর হুকমত খাঁ বাঙালিদের একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে লেলিয়ে দিয়েছে। পাকসেনারা নিরীহ বাঙালিদের গুলী করে হত্যা করে ঝগড়ুকে দিয়ে সেই লাশ ট্রাকে তুলে বধ্যভূমিতে ফেলে দেয়। এর জন্য ঝগড়ুকে মোটা অঙ্কের টাকা দেয়া হয়। ঝগড়ু মদ খেয়ে নেশা করে, মদের নেশায় সে রক্তাক্ত লাশগুলো ট্রাকে তুলে দেয়। কিন্তু একদিন এক মর্মস্পর্শী, হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে সে কিছুতেই লাশ উঠাতে রাজি হয় না। সে একজন বাঙালি, বাঙালি হয়ে অন্য একজন বাঙালির লাশ সে কিছুতেই ট্রাকে উঠাতে রাজি হয়নি। সে প্রতিবাদ করেছে, ক্ষিপ্র বাঘের মতো হুকমতকে জাপটে ধরে চিৎকার করে বলেছে—জয়বাংলা। দুখুভাই, আমি হুকমতকে ধরেছি, তুমি বর্গীকে ধর।[৩০]

বর্গী ঝগড়ুকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়েছে, কিন্তু ঝগড়ু তা প্রত্যাখান করেছে—

> টাকা দিয়ে আমার ঈমান নিতে পারবি না বর্গী। এই হুকমত, অস্ত্র ছেড়ে দে। না হলে এই দ্যাখ। মুখ দিয়ে রক্ত এসে যাবে। ছাড়। ছাড় হা! দুখুভাই অস্ত্র লিয়ে নাও।[৩১]

দুখু বর্গীকে জাপটে ধরে বলেছে—

> তেইশ বছর সহ্য করেছি, ভালোবেসেছি, দয়া করেছি। কিন্তু তোমরা ভাল হবার নও। এখন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তোমাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেব। তোমাদের পালাবার পথ গুড়ো করে দেব আমরা সাড়ে সাতকোটি মানুষ। লজ্জায় অপমানে আর পরাজয়ের যন্ত্রণায় তোমাদের সৈন্যবাহিনী পাগল হয়ে যাবে। এবার যুদ্ধ।
>
> (গ্রেনেড ও গুলীর শব্দ)
>
> দুখু॥ এবারের সংগ্রাম : স্বাধীনতার সংগ্রাম।[৩২]

৪

কল্যাণ মিত্রের 'জল্লাদের দরবার' নাটকটি স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম প্রচারিত হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে 'জল্লাদের দরবার' নাটকটি জনগণের মধ্যে সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ১৯৭২ সালে

---

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যকার দুটি খণ্ড একত্রিত করে 'জল্লাদের দরবার' নামে প্রকাশ করেন। নাটকটির উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন—'বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদানের উদ্দেশ্যে আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

এ নাটকের প্রথম খণ্ডকে তিনি ৮টি ভাগে বিভাক্ত করেছেন, তবে নাটকে কোনো অঙ্কবিভাগ বা দৃশ্য সংযোজন নেই। এই নাটক প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> সব বাধাকে তুচ্ছ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ দিনটি পর্যন্ত আমরা আঘাত করেছি পাক ফ্যাসিস্ট জঙ্গীচক্রের তাসের দুর্গকে। এই টুকুই আমাদের আত্মতৃপ্তি সে, মাতৃভূমির দুর্দ্দিনে আমরা নিষ্ক্রিয় থাকিনী। রক্তলোলুপ শার্দ্দুলের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। বাংলার মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা কিছুটা উদ্বুদ্ধ করেছি। আমাদের কলম বেয়নেটের সুতীক্ষ্ণ ফলক হয়ে পিণ্ডির দরবারকে যে সামান্যতম আঘাত করতে পেরেছিল, এ আমার সৌভাগ্য।[৩৩]

'জল্লাদের দরবার' নাটকের প্রথমেই দেখা যায়, অত্যাচারী শাসক ফতে খান এক দুঃস্বপ্ন দেখেছেন—এই স্বপ্নের ভিতর দিয়েই নাট্যকাহিনীর সূত্রপাত। এ নাটকের দুর্মুখ খান সত্য ও ন্যায়ের ধারক ও বাহক, কেল্লা ফতে খান পিণ্ডির বাদশা, তাকে জনতার আদালতে বিচারের জন্য শৃঙ্খলবদ্ধ করে কারারক্ষীগণ আদালত কক্ষে প্রবেশ করল। আদালতে বিচারকের আসনে দুর্মুখ খান উপবিষ্ট।

> ফতে খান। না-না- আমি আসামী নয়—আমি আসামীর কাঠগড়ায় উঠবো না। আমি বাদশা কেল্লা ফতে খান। আমি পাক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি।
>
> জনতা। তুমি জল্লাদ—তুমি জালিম—তুমি গর্দার। আমরা বিচার চাই।
>
> ফতে খান। বিচার। বাদশা কেল্লা ফতে খানের বিচার। হা-হা-হা। কে আমার বিচার করবে?
>
> জনতা। ওই বিচারকের আসনে যিনি বসে আছেন—উনি তোমার বিচার করবেন।[৩৪]

'জল্লাদের দরবার' নাটকে কেল্লা ফতে খান তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসক ইয়াহিয়া খানের প্রতিনিধিত্ব করছেন। নাট্যকার দুর্মুখ খানের সংলাপের মধ্য দিয়ে ফতে খানের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন—

> কেল্লা ফতে খান, তুমি বাংলার তিরিশ লক্ষ বঙ্গসন্তানের বুকের রক্তে বাংলার মাটি লাল করেছো। তুমি বাংলার মায়েদের বুক থেকে শিশু ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করেছো, নারীর ইজ্জত লুট করেছো। গোটা বাংলাকে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছো।[৩৫]

---

৩৩. কল্যাণ মিত্র, বক্তব্য, জল্লাদের দরবার, প্রথম প্রকাশ ১৯৭২

৩৪. কল্যাণ মিত্র, জল্লাদের দরবার, প্রথম প্রকাশ ১৯৭২, পৃ. ১

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

ফতে খান তার বিবেক বিসর্জন দিয়ে একের পর এক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন, দুর্মুখ খানের সংলাপে তার প্রকাশ ঘটেছে—

> কেল্লা ফতে খান, অত্যাচারের শেষ আছে। বলেছিলাম না তোমাকে, জনতার আদালতে মিথ্যা, গুণাহ একদিন মাথা নত করে দাঁড়ায়। এইটাই ঈশ্বরের অমোঘ বিধান। শক্তির আতিশয্যে, কায়েমী স্বার্থের খাতিরে তুমি বিবেক ; মনুষ্যত্বকে হত্যা করেছো—নির্বাসন দিয়েছো সভ্য হৃদয়টাকে। কিন্তু সত্যের জয়—জনতার জয় সূর্যের মতোই দীপ্ত—চির ভাস্বর। তাই নিষ্পাপ, নিরীহ বঙ্গ সন্তানদের বক্ষ রক্ত—তাদের তাজা কলিজার ওপর তোমার তক্তে তাউস প্রতিষ্ঠিত। তোমার সাধের মসনদ আজ স্বাধীনতাকামী মানুষের রোষানলে ভস্মীভূত হতে চলেছে। এই পরিণতি জগতের নিয়ম।[৩৬]

ফতে খান পাঠান মায়ের সন্তান, তিনি কোনো নিয়মকানুন মানেন না। শার্দুলের মত তার বুকে রক্তের তৃষ্ণা। তিনি প্রতিষ্ঠা চান, রাজ্য চান, অর্থ চান, সুরা, নারী, ভোগ বিলাস চান। বাঙালিরা তাদের শত্রু, এই শত্রুর নিধন চান, তবে বিচারে একাকী আসামি হতে চান না ; তার সঙ্গীদেরও শাস্তি চায়। যাদের কুপরামর্শে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন—

> এ বিচারে আমি একা আসামী কেন? জেনারেল হামিদ, পীরজাদা, টিটিয়া নবাবজাদা, নিয়াজী, ফরমান আলী আহাম্মুখ ফরিদ এরা সব কোথায়? এরাইতো আমাকে দিয়ে বাঙালিদের মৃত্যু সমনে সই করিয়েছে। ওদের জন্যই তো বাঙালিদের রক্তে আমি হাত রাঙিয়েছি, ঘর জ্বালিয়েছি, নারীর ইজ্জত কেড়ে নিয়েছি। ডাকো সেইসব বর্ণচোরা কুচক্রীদের, এই গণ আদালতে জনতার সামনে তাদের বিচার করো। ন্যায় দণ্ড দাও।[৩৭]

পট পরিবর্তিত হয়েছে। দরবারে একাকী কেল্লা ফতে খান কিছুক্ষণ পর দুর্মুখ খান আসে। কেল্লা ফতে খান গত রাতের দুঃস্বপ্নের কথা দুর্মুখ খানকে বলেন—

> হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখলাম, জনতার আদালতে আমার বিচার শুরু হয়েছে। আর সেই বিচারকের আসনে—না-না-এসব দুঃস্বপ্ন—সব বিভীষিকা।[৩৮]

কেল্লা ফতে খান টিটিয়া খানকে জরুরি তলব পাঠিয়েছেন। টিটিয়া খান তাকে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে, কিন্তু তবুও তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না। দুর্মুখ খান তার সামনে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সত্যকে উপস্থাপন করেছেন—

---

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

> কোতল নয়, বলুন মুক্তি ফৌজের কোঁৎকা খেয়ে আপনার সৈন্যদের বোতলের নেশা ছুটে যাচ্ছে। তাই তো জনাবের কয়েক বাণ্ডিল বেস্ট সোলজার 'ছেড়ে দে মা—কেঁদে বাঁচি' বলে ক্যান্টনমেন্ট থেকে লোটা কম্বল বগলে করে ঢাকা বিমান বন্দরের যাত্রীবাহী বিমানে চড়ে বসে—মা'র ছেলে মা'র কোলে ফিরে এসেছে। সিপাহসালার তাদের 'বাবা, বাছা' বলে ফেরাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু হুজুরের সৈন্যরা কাঁচ কলা দেখিয়ে পিণ্ডিতে এসে জনাবের পিণ্ডি চটকাচ্ছেন।[৩৯]

লারকানার নবাবও ফতে খানের দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। যুদ্ধের অবস্থা ভাল নয়, তাদের সৈন্যরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এছাড়াও চার মাসের যুদ্ধে চার হাজার বীর সৈন্য নিহত হয়েছে। বিশ্বজনমতও বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। নবাব পরামর্শ দিয়েছেন—

> জাহাপনা, এখনও ভেবে দেখুন, ভারত আক্রমণ করাই শ্রেয়ঃ। নইলে বাংলাদেশের বিদ্রোহীরা ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করছে, বিশ্বজনমত ক্রমশ বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের বিদেশী কিছু দূতাবাসগুলির বেশ কর্মী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করছে।[৪০]

নবাব ক্ষমতালোভী, সে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা লাভের জন্য ফতে খার কাছে দাবি জানিয়েছে—

> ...আমার মতে এই পশ্চিম খণ্ডের ক্ষমতা অবিলম্বে আমার হাতে তুলে দেওয়া উচিত। কারণ বর্তমানে আমিই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান। আমিই এই মসনদের একমাত্র উত্তরাধিকারী।[৪১]

নবাব ফতে খানকে বশীভূত করতে না পেরে তাকে হুমকি দিয়েছে ; ইসলাম বিপন্ন হওয়ার ভয় দেখিয়েছে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে দুর্মুখ খান সত্যকে তুলে ধরেছেন—

> হ্যাঁ এ যাবৎ ইসলামকে বাঁচাতে গিয়ে ইতিপূর্বে পাকিস্তানের আল্লার খাস বান্দারা কত রঙ্গই দেখালেন। এই ধরুন ইস্কাবনের মিঞা সাহেব ইসলামের জাত মেরে বিলেতে হোটেল খুলে গোস্ত, সুরা, নারীর ব্যবসা করছেন। আর জাঁহাপনার ওস্তাদজী বেকুফ খান সাহেব তো কিলারের প্রেমে কিল হয়ে এক হাতে তসবী, অন্য হাতে সুরার পেয়ালা নিয়ে বাগিচায় পায়চারী করছেন। আর আমাদের জাঁহাপনা তো হাফেজ আদমী—ইসলামের সোল এজেন্ট—[৪২]

পিণ্ডির দরবারে সিংহাসনের সামনে দণ্ডায়মান সিপাহসালার টিটিয়া খান। পিণ্ডির মসনদ লাভের দুর্লভ সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চায় না—

---

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

> তুমি অভিশপ্ত—তুমিই ষড়যন্ত্রের উৎস। তোমারই জন্যে গত তেইশ বছর কতো নিরীহ প্রাণ বলিদান গেল, কতো ষড়যন্ত্রের ইতিহাস রচিত হল। আজ তুমি বিশ্বের দরবারে ঘৃণিত—ধিকৃত। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার এই ঝলসানো তক্তে তাউসে আমি একদিন বসবো রাজদণ্ড হাতে নিয়ে। তামাম পাকজাঁহা আমার পদতলে থাকবে। কাপুরুষ কেল্লা ফতে খান, তোমার যোগ্য নয়। তাই তাকে একদিন সরে যেতে হবে—হয়তো চিরকালের জন্য দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবো আমরা।[৪৩]

বাঙালিদের ভয়াবহ দুর্দিনে অসহায় মানুষের উপর শোষণের খড়গ চাপিয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী উল্লাসে মেতে উঠেছে—

> হা-হা-হা-ঠিক বলেছো—বাংলাদেশ আজ কারবালা। বাংলার ক্ষেত খামারে আমি বিষ ছড়িয়ে দিয়েছি দুর্মুখ খান। অনাহারে মরবে বাংলার লাখো লাখো মানুষ।[৪৪]

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী মুখে যত আস্ফালনই করুক না কেন বাঙালিদের দৃঢ় মনোবল ও অসীম সাহসের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। অত্যাচারী যত শক্তিশালীই হউক না কেন দৃঢ় মনোবল, আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে না। তাই হঠাৎ আলো নিভে যেতেই সিপাহসালার অন্ধকারে অশরীরী বস্তু দর্শন করতে শুরু করেছেন—

> অন্ধকার—চারদিকে অন্ধকার। আমি একাকী এই মসনদের সামনে। একি ! হঠাৎ মসনদটা নড়ে উঠল যেন। হ্যাঁ হ্যাঁ—মসনদ কাঁপছে। ওকি—ওকি। মসনদের উপর বসে কারা? উঃ উঃ —ছিন্ন মস্তক মানুষগুলো সর্ব্ব শরীরে রক্ত মেখে মসনদের চারিপাশে ঘুরছে। ঐ-ঐ ঐযে দেহহীন রক্তাক্ত মাথাগুলো আমার পানে অগ্রসর হচ্ছে। ওদের দৃষ্টি আমার প্রতি ! উঃ কি বীভৎস। দাঁড়াও দাঁড়াও তোমরা ওখানে। আর অগ্রসর হয়ো না। আমি বলছি তোমরা দাঁড়াও। আ-আ-আ—কই হ্যায়? বাঁচ-বাঁচাও।[৪৫]

যতই দিন যেতে লাগল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অবস্থা ততই শোচনীয় হয়ে উঠল। একদিকে ইয়াহিয়া খান রূপী ফতে খানের সিংহাসন টলায়মান, অন্যদিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের মধ্যে অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি হলো। সুযোগ বুঝে দুর্মুখ খান ফতে খানের সম্মুখে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের কাহিনী তুলে ধরেছেন—

> ... আপনার রাজ্যে নির্ব্বাচন দিলেন। সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাচন নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হলো। গণতন্ত্রের পূজারীর মুখোশ পরে বিশ্বকে বললেন, এমন সুষ্ঠু নির্বাচন কোনো দেশে হয়নি। আওয়ামী লীগ নব্বই ভাগ

---

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

> আসন পাওয়াতে ভাবে গদগদ হয়ে বঙ্গবন্ধুকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে আগাম ঘোষণা করলেন। ২৫ মার্চের আগ পর্যন্ত একবারও বললেন না, আওয়ামী লীগ বিচ্ছিন্নতাবাদী, দুষ্কৃতকারী, খুনী। একবারও আপনার কণ্ঠে উচ্চারিত হলো না যে, ভারত আপনার নাক কাটতে উদ্যত। অথচ ওই সাদা চিঠিতে কালো কালিতে একেবারে উল্টো গীত গাইলেন। তাই তো বিশ্ববাসী আপনার শ্বেতপত্রের নাম দিয়েছে বোগাস লেটার। এতে শেখ মুজিব মহাপ্রাণ নেতার স্থান পেলেন। বিশ্ব জেনেছে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাসঘাতক নয়—বিশ্বের এক মহান নেতা।[৪৬]

মদের নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে ফতে খান প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন—

> ঐ উলঙ্গ মানুষটা আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। কে–কে তুমি? কে তুমি ছায়া মানুষ ! কে কে ?[৪৭]

দুর্মুখ খানের সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন ও সামরিক বাহিনীর অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করেছেন। 'মানুষ' প্রতীক ধর্মী চরিত্র, নাট্যকার তার সংলাপের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন—

> জল্লাদ, তুমি বাংলাকে দেখনি? তুমি বাংলার মানুষ আর তার প্রেমিক দেখনি? দেখেছো। তাই তো তুমি, আর তোমার পদলেহী কুত্তারা শিউরে উঠে, ঘাতকের ঘড়গ হাতে তুলে নিয়েছো। স্বাধিকার, গণতন্ত্রের বুকে কামান দেগে বাংলার বুকে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছো। তোমার লেলিয়ে দেওয়া নেকড়েদের হিংস্র থাবায় আমার সোনার বাংলা আজ ক্ষতবিক্ষত। রক্তাক্ত বাংলার বুকে আজ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, তার বুকজোড়া আর্তনাদ আর হাহাকার।[৪৮]

ফতে খানের ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বোধ নেই, হত্যা, ধ্বংস আর লুণ্ঠনেই তার উল্লাস। তিনি ক্ষুধিত, হিংস্র, এক নায়কতন্ত্রের রাজদণ্ড হাতে নিয়ে মসনদে বসে আছেন। তিনি উদ্ধ্যত, আত্মঅহংকারী এক নরপশু। বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষ তার ভয়ে পদানত নয়। এদেশ—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, সালাম, বরকত, মতিউরের শোণিত ধারা আজও বাংলার বুক থেকে মুছে যায়নি, মানুষ চরিত্রটি সেই দুর্বার সংগ্রামী মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বররূপে প্রতিভাত হয়েছে—

> গর্বিত কাফের, তুমি শয়তানের বাদশাহী করছো ! তুমি খোদার ঘর জ্বালিয়েছো, বাংলার মানুষকে ভিটে ছাড়া, দেশ ছাড়া করেছো, আমার বোনকে বিধবা করেছো, মাকে পুত্রহারা করেছো, ভাইয়ের কাছে থেকে ভাই কেড়ে নিয়েছো,—কত বঙ্গনারীর ইজ্জত কেড়ে নিয়েছো। কিন্তু কি অপরাধ করেছিল তারা ?[৪৯]

---

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ ভেবেছিলেন খুব সহজেই বিদ্রোহীদের দমন করে এদেশ দখল করবেন। কিন্তু তাদের সেই আশা চিরতরে ভঙ্গ হলো। পররাষ্ট্র শক্তিগুলোও বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করে। ঘরে বাইরে সর্বত্রই ফতে খানের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে। তার বেগমও তার এই অন্যায় কার্যের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছেন—

> খোদা এখনও তোমার আরশ কেঁপে উঠছেনা। আসমান জমিন তোমরা এখনও ভীরুর মতো স্তব্ধ হয়ে বসে আছো। ভূমিকম্প, প্রলয়, ঝড়, আগুন এই পিণ্ডির মসনদটাকে দলে, পিষে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে না কেন? নারীর ইজ্জত যে কেড়ে নেয়, শিশুর বুকের রক্ত যে পশু চুষে খায়, সেই জল্লাদ আজও কেন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে? তবে কি কোরান, হাদিস, বিশ্বসংসার বিশ্ব বিবেক সব মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে?[৫০]

পররাষ্ট্র শক্তিসমূহ বাংলাদেশের পক্ষে রায় দিয়েছে—

> ... সোভিয়েত আফ্রো এশিয়া কমিটি বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রহসন বন্ধ রেখে পূর্ব বাংলার ইচ্ছা অনুযায়ী বাঙালিদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।[৫১]

সুদীর্ঘকাল ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফতে খান দিশাহারা হয়ে পড়েছেন, তার চারিদিকে নিকষ কালো অন্ধকার, কোনো সঠিক পথের সন্ধান খুঁজে পাচ্ছেন না—

> একটি জাতি—একটি ইতিহাস। একটি বিস্ফোরণ—একটি অভ্যুদয়। একটি দাবানল—একটি যুদ্ধ। বিশ শতকের মানুষ—তাকিয়ে আছে বিস্ময়ে আমার পানে। চেয়ে দেখছো বুঝি শত শত মাইলাই, হিরোশিমা, হিটলারের গ্যাস চেম্বার এর মতো বধ্যভূমির দিকে। তোমরা যারা হত্যা, রক্ত দেখে শিউরে উঠেছো—ঘৃণায় আমার প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করেছো তারা নিভৃতে বসে ইতিহাস রচনা করো। আর যারা এ হত্যাযজ্ঞে আমাকে সাহায্য করেছো তারা সক্রিয়ভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়াও। আমাকে অস্ত্র দাও—শক্তি দাও—সাহস দাও। যদি আমি আজ পরাজিত হই—তাহলে জানবে, তোমাদের ঘরেও একদিন দাবানল সৃষ্টি হবে। সাম্রাজ্যবাদের হাত গুটিয়ে নিতে হবে। আজ আমি জীবনের এক অশুভ লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি। নিকষকালো তমসা আমার সামনে। তোমরা আমাকে পথের সন্ধান দাও—আমাকে পথ করে দাও।[৫২]

দুর্মুখ খান ফতে খানের সামনে শ্লোমোশন ছবির মত ১২ নভেম্বরের মহাপ্রলয়ংকারী ঝঞ্ঝা—জলোচ্ছ্বাস থেকে শুরু করে ১৯৭০-এর নির্বাচন, বঙ্গবন্ধুর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ও বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবি পর্যন্ত তুলে ধরেছেন। এরপর দুর্মুখ খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন প্রসঙ্গ শুরু করলেন—

---

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

...আপনি ঘোষণা করলেন—২৬ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বললেন—"শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে আমি অধিবেশনে যেতে পারি না।" শুরু হলো অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। কোটি কণ্ঠ এক কণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠল। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন—"আমার নিরীহ মানুষের বুকে আর গুলি চালিও না—ভাল হবে না।

....

নাটক শুরু হলো। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় অভিনয় শুরু করলেন আপনি। পশ্চিম পাকিস্তানের জাঁদরেল ব্যক্তিরা উপস্থিত হলেন, আলোচনা বৈঠকে। এরই মধ্যে পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী টিটিয়া খানের সঙ্গে গোপনে মিলিত হলেন আপনি।[৫৩]

ফতে খানের পক্ষে বেশিদিন আলোচনা চালানো সম্ভব হলো না, তিনি সিপাহসালার টিটিয়া খানকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বললেন। লারকানার নবাবজাদাও সুন্দরভাবে অভিনয় করলেন তাদের আলোচনা ব্যর্থ হলো পূর্ব পরিকল্পনা মতো। রাতের অন্ধকারে নবাবজাদা ও টিটিয়া খান গোপনে মিলিত হলেন, ফতে খান সিপাহসালার টিটিয়া খানের হাতে পূর্ববাঙলাকে ধ্বংস করার দায়িত্বভার দিলেন—

...আমার আদেশ, বাংলাকে ধ্বংস করুন গণতন্ত্রকে, বাঙালিদের স্বাধীকারকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিন। বাংলার ছাত্র, বুদ্ধিজীবীদের খতম করুন। যদি প্রয়োজন হয় বাংলাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করুন। পঙ্গ করে দিন এই উদ্ধত বাঙালি জাতটাকে।[৫৪]

টিটিয়া খানও তাকে আশ্বস্ত করলেন—

...৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাকে—বাংলার আশা আকাঙ্ক্ষাকে আমি চূর্ণ করবো। বাংলার মানুষের উন্নত শির আমার বুটের তলায় নিস্পেষিত করবো। আমি সিপাহসালার টিটিয়া খান। বাংলার মানুষ আমাকে এবার চিনবে—আমি কে।[৫৫]

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর অনুচরদের বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। ই.পি.আর. আর পুলিশ বাহিনীর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। রাতের অন্ধকারে নিরীহ বাঙালির উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের অত্যাচারে একটি জাতি—একটি ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

এরপর মঞ্চে একে একে মীর জাফর, চেঙ্গিস খান, নাদির শাহ, হিটলারের আবির্ভাব ঘটেছে। মীর জাফরের সংলাপের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বদেশ প্রেম ও আত্মত্যাগের মহিমা বর্ণিত হয়েছে—

---

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

> আমিও আস্ফালন করেছিলাম—বাংলার স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়ে বিদেশী বেনিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু বজ্রাঘাতে আমি পুড়ে মরলাম। বেনিয়ার হাত থেকে কেড়ে নিল বাংলার মানুষ স্বাধীনতা। ওদের কাছে সবার ওপরে দেশ। আর এই দেশের জন্য, স্বাধীনতার বেদীমূলে ওরা হাসতে হাসতে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে।[৫৬]

দিল্লীর শাহী দরবার, দুর্মুখ খান সিপাহসালার পিয়াজীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। সিপাহসালার নিয়াজী বাঙালিদের রণকৌশল, সৎসাহস আর বুদ্ধিমত্তায় আশ্চর্য হয়েছেন—

> পিয়াজী। বাংলার সংগ্রামী মানুষের হিম্মত দেখে আমি তাজ্জব হয়ে গেছি।
>
> দুর্মুখ। এখানেই তো আপনাদের অঙ্কে মহা ভুল হয়েছে। ১৯৬২ এবং '৬৯ সালে বাংলার ছাত্র সমাজ রক্ত দিয়েছে, ১৯৭১ সালেও লাখো লাখো বাঙালির রক্তে বাংলার শ্যামল প্রান্তর লাল হলো ! এই নিরীহ বাঙালি জাতটা আর কতো রক্ত দেবে ? তাই বাঁধভাঙ্গা নদীর মতো ওরা আছড়ে পড়েছে আপনাদের ওপর।[৫৭]

দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারে বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। সাড়ে সাতকোটি মানুষ মুক্তিযোদ্ধা, বাংলার প্রতিটি ঘর দুর্ভেদ্য দুর্গ। মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে পাক সেনাবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়েছে—

> ... মুক্তিবাহিনীর গায়েবী মার ঠেকাবেন কি করে? এই যে সেদিন মারের চোটে কসবা, ছাতক মেহেরপুর, রংপুর, বরিশাল, ফরিদপুরে আমাদের কয়েকশ' সৈন্যের জিবে বার হলো, আলমডাঙ্গায় মাইনের গুতোয় চলন্ত ট্রেন গুঁড়ো হয়ে খান সেনাদের নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে বিদিখিচ্ছিরী ব্যাপক হলো—ঠেকাতে পারলেন? আবার পানিতেও কি নিস্তার আছে? সালদা নদীর কাছে খানসেনা বোঝাই এগারোটা গানবোট মুক্তিসেনার অতর্কিত আক্রমণে—উঃ আমার কান্না পাচ্ছে।[৫৮]

ফতে খান অনেক কৌশল অবলম্বন করেও শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা করতে পারেনি। একে একে সমস্ত এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে এসেছে। অনেক রাজাকার অস্ত্রসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দুটি ব্রিটিশ জাহাজ, রাষ্ট্রসঙ্ঘের ছাপ দেওয়া মার্কিন সরবরাহ জাহাজ মুক্তিযোদ্ধারা বিনষ্ট করে দিয়েছে। ফতে খানের আসন্ন পরাজয় দেখে দুর্মুখ খান তাকে পরামর্শ দিয়েছেন—

> ... ওদের তথা গোটা পাক জাঁহার সর্ব্বনাশ বাঙালির রক্তের পিছল পথ ধরে আসছে? বাংলার মুক্তিবাহিনী এগুচ্ছে। সব বাধা চূর্ণ করে ওরা স্বাধীনতার মশাল হাতে এগিয়ে আসছে। সাবধান—সব হুঁশিয়ার।

---

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের হৃদয় থেকে যে জাতি নবজীবন নিয়ে জন্ম নিল—পারেন যদি সময় থাকতে তাদের স্বাগত জানান।[৫৯]

ফতে খান তবুও ক্ষান্ত দেয়নি—

ফতে। দুর্মুখ খান। এই জাতির স্বাধীনতা আঁতুরেই খতম হবে। ঝাঁঝরা করে দেবো ওদের বুক। কণ্ঠকে স্তব্ধ করবো। শুধু দেখে যাও অবাক বিস্ময়ে একটা জাতিকে আমি কিভাবে ক্রীতদাসে পরিণত করি।

দুর্মুখ। হা-হা-হা-জাঁহাপনা নেশায় আছেন তাই এমন কথা বলছেন। যেদিন নেশা ছুটে যাবে—সেদিন সব যাবে। আপনিও যাবেন—আপনার তক্তও যাবে। পড়ে রইবে শুধু তপ্ত কিছু তাজা রক্ত।

ফতে। খামোশ কমবক্ত। নিকাল যাও হিয়াসে।[৬০]

'জল্লাদের দরবার' নাটকের ১ম খণ্ডে নাট্যকার কল্যাণ মিত্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। নাটকে বর্ণিত ফতে খান, টিটিয়া খান, নবাব, নুরুল আমিন, দান্দাল—চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন জঙ্গীশাহী শাসকবর্গের চিত্র তুলে ধরেছেন। বাঙালি জাতি তার মনোবল আর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে—তারই ভাষাশিল্প 'জল্লাদের দরবার'।

১৯৭১ সালের গোড়ার দিকেই জ্বলে উঠলো মুক্তিযুদ্ধের দাবানল, চারিদিকে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়লো সে আগুন, বিপন্ন দেশবাসী শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে অমিতাবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো রক্তলোলুপ, নরপশু হায়েনার বিরুদ্ধে। বাংলার এই চরম দুর্দিন—নাট্যকার, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের করেছিল ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। রাজকর্মীরা লড়েছেন মাঠে, ময়দানে, রাজপথে, সভা-সমিতিতে, বীরযোদ্ধারা লড়েছেন—যুদ্ধক্ষেত্রে। নাট্যকর্মীরা মঞ্চে, রেডিওতে লড়াই চালিয়ে গেছেন নাটকের মাধ্যমে। সমকালীন সময়ে বাংলাদেশের সমাজ-সচেতন নাট্যকারবৃন্দ যে নাটক উপহার দিয়েছেন তা কখনো শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে উচ্চকিত, কখনোবা স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত।

'জল্লাদের দরবার' (২য় খণ্ড) নাটকের মধ্য দিয়ে কল্যাণ মিত্র সমকালীন স্বৈরাচারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার এই দুঃসাহসিক প্রয়াস মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস ছিল। গ্রামে, গঞ্জে ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধের প্রোজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাকে তিনি ধারণ করেছেন—এ নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে। নাটকে অঙ্কিত চরিত্রাবলীর মধ্য দিয়ে তিনি স্বৈরাচারী শাসকবর্গকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন। তার এই আক্রমণের ভাষা সুতীক্ষ্ণ ও বলিষ্ঠ। পিণ্ডির বাদশা কেল্লা ফতে খান থেকে শুরু করে, লারকানার নবাব, সিপাহসালার টিটিয়া খান, সিপাহসালার পিয়াজী খাঁন, লাট বাহাদুর দান্দাল, প্রাক্তন গভর্নর মোনেম খান—একে একে সবাইকে

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮
৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন। যারা এই ভয়াবহ মুক্তিযুদ্ধ আর রক্তাক্ত সংগ্রামের নেপথ্যে অবস্থান করে হত্যাযজ্ঞ আর ধ্বংসলীলার নীল নক্শা অঙ্কন করেছেন তারা কেউই নাট্যকারের বেয়োনেট সদৃশ ক্ষুরধার সম্পন্ন লেখনী থেকে অব্যাহতি পায়নি। দীর্ঘ নয় মাসের তিক্ত-অভিজ্ঞতা, মানসিক নির্যাতন, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে তাদের জল্লাদের দরবারকে জনসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পিণ্ডির দরবারের সেই অভিশপ্ত সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান ন্যায়-সত্যের প্রতীক দুর্মুখ খানের সংলাপের মধ্য দিয়ে জল্লাদের দরবার নাট্যকাহিনীর (২য় খণ্ড) পট উন্মোচিত হয়েছে—

> দুর্মুখ। পিণ্ডির মসনদ, সালাম—সালাম তোমাকে। আমি সত্যান্বেষী দুর্মুখ খান তোমাকে সালাম জানাচ্ছি এই জন্য যে, সত্যই তুমি বিশ্বের বিস্ময়! এই দীর্ঘ চব্বিশ বছরে তুমি কতই না রঙ্গ দেখালে। কিন্তু এবার বোধহয় তোমার রঙ্গ শেষ। তোমার সামনে নেমে আসছে এক কলঙ্কিত রক্তাক্ত যবনিকা। গাঢ় তমসা ধীরে ধীরে গ্রাস করবে তোমাকে। তুমি হারিয়ে যাবে—আঁধারে মাথা খুঁড়ে মরবে। কেউ সমবেদনা জানাবে না। ঘৃণা ধীক্কারের পঙ্কে পতিত হবে তুমি। তোমার জন্মলগ্নের ইতিহাস নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে। জানো নিশ্চয়ই, কতো রক্তের বিনিময়ে তোমার এক একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দীর্ঘ চব্বিশ বছরের কলঙ্কের কালিমা, ষড়যন্ত্র, অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ আর অভিশাপে তোমার সেই এক একটি স্তম্ভ আজ ভেঙ্গে পড়েছে। যেদিন এই উপমহাদেশ বিভক্ত হলো, সেদিন থেকেই তোমাকে ঘিরে ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত সবাই। তুমি শোষিত, আছে শুধু তোমার কঙ্কাল। কিছু শকুনী, গৃধিনীর দল তোমার এই কঙ্কালকে সম্বল করে জিঘাংসায় মেতে উঠেছে।[৬১]

পিণ্ডির এই সিংহাসন নিয়ে যত বিরোধ—নবাব ফতে খান পিণ্ডির এই সিংহাসনে তার স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশকে কারবালায় পরিণত করেছেন। লাখো লাখো শহীদের রক্তে বাংলাদেশের মাটি আজ রক্তাক্ত। বাংলাদেশের মানুষও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেনি। 'বিসুভিয়াসের' মত অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে পড়েছে। ফতে খান তবুও দমবার পাত্র নয়, নিলর্জ্জের মত তার অধিকার আঁকড়ে ধরে বসে আছেন—

> খামোশ। অধিকার। আমি বাদশা কেল্লা ফতে খান। আমার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এই তক্তে তাউস আমার। আমি লাখো বাঙালিকে হত্যা করেছি, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবো বলে। আমার বিরুদ্ধে যার হস্ত উদ্ধত হবে, সেই হস্তকে আমি গুড়িয়ে দেবো, পিণ্ডির মসনদের বিরুদ্ধে যার কণ্ঠ সোচ্চার হবে সেই কণ্ঠকে ফাঁসির দড়ি দিয়ে স্তব্ধ করে দেবো।[৬২]

---

৬১. শ্রী কল্যাণ মিত্র, জল্লাদের দরবার (২য় খণ্ড) প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ১৯৭২, পৃ. ১০৩
৬২. পূর্বোক্ত, ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধের পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে টিটিয়া খান মাত্র চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বাঙলার বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার বাসনা পোষণ করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন—

টিটিয়া। জাঁহাপনা, আরও অর্থ, আরও সৈন্য আমি চাই। বিদ্রোহীরা নূতনভাবে রণসাজে সজ্জিত হয়ে আমাদের আক্রমণ করেছে। লড়াই চলছে বহু স্থানে।

দুর্মুখ। সাবাশ বঙ্গবীরেরা।

ফতে। অর্থ-সৈন্য। প্রতিদিন দেড় কোটি পরিমাণ অর্থ যুদ্ধে ব্যয় হচ্ছে। কোষাগার শূন্য হতে চলেছে। তার উপর আমার শত শত যোদ্ধার নিষ্ফল মৃত্যু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে সিপাহসালার। আর কতোদিন—আর কতদিনে বাংলার বিদ্রোহ দমন করতে পারবেন।[৬৩]

অন্যদিকে নবাবজাদা ক্ষমতার লোভে ফতে খানকে হুমকি দিয়েছেন—

> খাঁ সাহেব, যদি শক্তির আতিশয্যে যদি ক্ষমতা হাতে রাখতে চান তাহলে আমিও বলে রাখছি, এক অশুভ দিন আপনার সামনে এগিয়ে আসছে। কোনো শক্তি দিয়েই তাকে প্রতিরোধ করতে পারবেন না।[৬৪]

ফতে খান, শেখ মুজিবর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পূর্ব বাঙলায় যে ভয়াবহ দুর্যোগ ডেকে এনেছেন তা শেষ পর্যন্ত তার সিংহাসনকে টল টলায়মান অবস্থায় নিয়ে এসেছে। তার উপর ক্ষমতার লোভে নবাবজাদার হুমকি। ফতে খান চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন—

> ...কতো আয়েশে আমি বাদশাহী করছি। চারিদিকে ষড়যন্ত্র। সবাই মসনদের ভাগ চায়। এক এক সময় মনে হয় মসনদটাকে পুড়িয়ে সেই ভস্মরাশী ওদের মুখে ছুঁড়ে দি। একি দুর্মুখ খান, তুমি আমার মুখের পানে অমন বিস্ময়ে চেয়ে আছো কেন?[৬৫]

চারদিক থেকে দুঃসংবাদ আসছে, সিংহাসনের ভোগ-দখল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে, ফতে খান দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, বিবেকের দংশনে তিনি জর্জরিত হয়েছেন—

> ...জলসা ঘরের সুরা, সাকী তোমাকে শান্তি দিতে পারবে না। জীবনের সব জলসা তোমার শেষ হতে চলেছে। ইতিহাস, মহাকাল, বিশ্ববাসী তোমরা দেখে যাও, কিভাবে সত্যের অসিতে মিথ্যার মৃত্যু হয়।[৬৬]

'পিণ্ডির হারেমের জলসাঘরে' সুরা পানে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে, অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় তার চোখের সামনে ইতিহাসের সেই কলংকিত অধ্যায়ের সমস্ত দৃশ্যপট একে একে ভেসে উঠেছে—

---

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১
৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

...আমি চেয়েছিলাম বাংলার বুকে গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে, বাংলার সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজকে হত্যা করে, পঙ্গু করে—তাদের লাশের ওপর আমার সাম্রাজ্যবাদী কায়েমী শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো। মাসরেকী বাঙ্গাল আমার কাছে যেন একটা সোনার থালা। তাই আমি চেয়েছিলাম আমার সৈন্যদের পদতলে দলিত মথিত বাংলাকে আমি ক্রীতদাস করবো। বাংলাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু বাংলার মানুষ আমার শত্রু। কিন্তু একি হলো ! কোথায় গেল আমার সব স্বপ্ন। সব পরিকল্পনা, সব আশার ইমারত আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। কি জবাব দেব আমি দেশবাসীর কাছে? আমি আজ লাঞ্ছিত, ধিকৃত। আমি সীমার, আমি চেঙ্গিস, আমি কুইসলিং, আমি হিটলার। কেউ বলে আমি কাফের, আর কেউ বলে আমি জল্লাদ, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি মহাত্রাস—মহাভয়। কিন্তু আমার অস্তিত্ব—আমার সত্তা যেন বলছে—'বাদশা কেল্লা ফতে খান, তুমি শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছো। আর একটু এগুলেই তুমি মৃত্যু গহ্বরের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।' ইযারের বুকে কান পেতে যেন শুনতে পাই সেই সাবধান বাণী। সেই গায়েবী কণ্ঠ বলছে—'ফিরে যাও কেল্লা ফতে খান, এ পথ শান্তির নয়—মৃত্যুর।'[৬৭]

হঠাৎ জলসা ঘরের আলো নিভে যায়। ফতে খান মোনেম খানের শ্বেত মূর্তি দর্শন করেছেন। মোনেম খান তার দুর্ভাগ্যের কথা একে একে সব ব্যক্ত করেছেন—

মোনেম। ...বাংলার গর্দারীর ইতিহাসের অন্যতম বিশ্বাসঘাতক। যার নির্দেশে ১৯৬২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত, বাংলার পথে প্রান্তরে কতোশত মুক্তিকামী মানুষের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারাগারের অন্তরালে শত শত তরুণ জীবন, যৌবনকে খুইয়েছে, আমি সেই কুখ্যাত ক্রীতদাস মোনেম খান।

ফতে। কিন্তু আপনি আমার পিণ্ডির জলসা ঘরে কেন?

মোনেম। পিণ্ডির মসনদের জন্যেই তো আমি আমার জন্মভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমার ভাইয়ের রক্ত নিয়েছি, বাংলার কৃষ্টি, সাংস্কৃতির মাথায় কুঠারাঘাত করেছি। পিণ্ডির স্বার্থেই বাংলার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কারারুদ্ধ করেছিলাম।[৬৮]

মোনেম খান* উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর হাতে গড়া পুতুল হয়ে ক্ষমতার লোভে দেশের মাটির সঙ্গে, জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ইতিহাসের কলংকিত নায়ক 'মীর জাফর' হিসাবে তিনি চিহ্নিত

---

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

* দেশবাসী যখন স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শরিক তখনই রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হলো আবদুল মোনেম খান। প্রথমে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন এবং পরে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করা হয়। মোনেম খান এদেশের লোক হলেও এদেশবাসীর স্বার্থের চেয়ে নিজের গদির প্রতি তাঁর বেশি আকর্ষণ ছিল। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পদে আসীন থাকা সত্ত্বেও নিজেকে আইয়ুব খানের একজন সামান্য খাদেম মনে করতেন। রাও ফরমান আলী লিখেছেন 'কথা বলার সময় প্রায়ই তিনি 'মাই প্রেসিডেন্ট' বলতেন। এ ধরনের তোয়াজ বৃত্তির জন্য বাঙালিরা তাঁকে মনে প্রাণে ঘৃণা করত। তাঁর দীর্ঘ সাত বছরের

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছেন। বাঙালি জাতি বিশ্বাসঘাতককে কোনোদিন ক্ষমা করে না তাই শেষ পর্যন্ত বাঙালির বুলেটের আঘাতেই তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। মোনেম খান ফতে খানকে সতর্ক করে দিয়েছেন—

মোনেম। এতদিন ধরে আমার মতো চাটুকারের সাহায্যে বাংলায় যে উপনিবেশ তোমরা গড়েছো, এবার তা তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়বে।

ফতে। মৃত্যুর পরে বহুৎ জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন দেখছি মোনেম সাব।

মোনেব। কিন্তু শুনে রাখো গর্বিত বাদশা, দিন বদলের পালা আসছে। আমার গদ্দারীর শাস্তি আমি পেয়েছি। কিন্তু বাংলার বুকে আমারই মতো যে সব বিশ্বাসঘাতক বেঁচে আছে—তাদের মৃত্যু শমন নিয়ে আজরাইল এগিয়ে আসছে। তাদের তোমরা বাঁচাতে পারবে না। মালিক, ফকা, ফরিদ, নূরুল আমিন সবাইকে গদ্দারীর শাস্তি একদিন নিতে হবে।[৬৯]

ফতে খান দমবার পাত্র নয়। তিনিও তার শেষ শক্তি দিয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবেন—

ফতে। ...আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে বাংলার জমি থেকে এক ইঞ্চি আমি সরে দাঁড়াবো না। এ আমার প্রতিজ্ঞা—

মোনেম। তাহলে এও জেনে রাখো, তোমার দুর্দ্দিন অতি নিকটে। অভিশাপ নিয়ে এগিয়ে আসছে আগামী দিন। উনসত্তরের বাংলাকে দেখে আমি জানি, বাংলার মানুষ একবার যদি মাথা উঁচু করে, তাহলে কামান, বন্দুক দিয়ে, সেই উঁচু মাথাকে নীচু করা যায় না। বাংলার মাটি আজ বারুদ। বাংলার মানুষের চোখের জল শুকিয়ে আজ আগুন হয়েছে। এই দাবানল কি দিয়ে নেভাবে?[৭০]

বাংলা মুলুকের লাট বাহাদুর দাঁন্দাল তার অবস্থাও মোনেম খানের মতই শোচনীয়। তার ধারণা ছিল আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর সামনে বিদ্রোহীরা বেশিদিন দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু তার সে ধারণা ভ্রান্ত, বিদ্রোহীরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে :

...আচ্ছা দুর্মুখ খান, তোমার কি মনে হয়, বাংলাদেশ কখনও স্বাধীন হতে পারবে?

দুর্মুখ। পারবে মানে স্বাধীন হয়ে বসে আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার কায়েম হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বের বহু দেশ, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। আপনি আছেন কোথায়? তাছাড়া বঙ্গবীরেরা মৃত্যুর

শাসনকালে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সন্তুষ্টির জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রকার প্রগতিশীল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দাবিয়ে রাখেন। মোনেম খান বাংলার ইতিহাসে এক ঘৃণিত ব্যক্তিত্ব।

তথ্যসূত্র : রাও ফরমান আলী, ভূট্টো, শেখ মুজিব, বাংলাদেশ, তথ্য সংগ্রহ, কে, এম রাইসউদ্দিন খান—বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৯৪, পৃ. ৬৫৩

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

> সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আমাদের সৈন্যদের পিটাতে শুরু করেছে—তাতে আমাদের ঘোরেল সেনাপতিদের পর্যন্ত হেঁচকী ওঠা শুরু হয়েছে।[৭১]

দান্দাল বাংলাদেশেরই সন্তান, বাংলার আলো বাতাসে লালিত পালিত বর্ধিত হয়ে এই মাটির সঙ্গেই বেঈমানী করেছেন। দুর্মুখ খানের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেটি তুলে ধরেছেন—

> ওই আনন্দেই বাহু তুলে নাচুন লাট বাহাদুর। বাঘ এবার কেঁদোয় পড়েছে। আচ্ছা দাঁন্দাল সাহেব, আপনি বাঙ্গালী হয়ে আপনার জন্মভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আপনার ভাইকে কি হত্যা করেছেন? যে মাটিতে আপনি ভূমিষ্ট হয়েছেন, আপনার মৃত্যুর পর যে মাটি আপনাকে বক্ষে ধারণ করবে, সেই জন্মভূমি মায়ের সঙ্গে কি করে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।[৭২]

পিণ্ডির দরবারে ফতে খান ও দুর্মুখ খান আলোচনারত। যুদ্ধের অবস্থান ভাল নয়, ফতে খান খুব চিন্তিত। মাঝে মাঝে দুর্মুখ খান তাকে বিদ্রোহীদের খবরাখবর সরবরাহ করছেন—

> বিদ্রোহীরা আর চোরাগোপ্তা নয়—এবার আপনার সৈন্যদের সম্মুখ সমরে পরাজিত করে বিদ্রোহীরা বিজয় কেতন উড়িয়ে মুক্ত এলাকায় প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেছে। এই বিপ্লব—এই বিদ্রোহ দমন করার সাধ্য আপনার সেনাবাহিনীর নেই।[৭৩]

ফতে খান হতাশার মধ্যেও তার হিমাদ্রি সদৃশ অটলতার কথা ব্যক্ত করেছেন—

> বিদ্রোহ—বিদ্রোহ চারিদিকে। এই বিদ্রোহ—শুধু আমার ঘরে নয়, গোটা বিশ্বের মানুষ যেন আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তবু আমি হিমাদ্রির মতো অটল—অচল।[৭৪]

ফতে খান তার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য হত্যা, লুণ্ঠন আর ধর্ষণে বাঙলার মাটিকে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন। এখনও তিনি বাঙালিকে পদানত রাখতে চান। বিদ্রোহীদের তিনি কঠিন হস্তে দমন করবেন—

> প্রতিটি রক্ত চক্ষুকে আমি উপরে নেবো। ওদের জিহ্বা আমি সাঁড়াশী দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো।[৭৫]

দুর্মুখ খানও দমবার পাত্র নন, ফতে খানের কথার যথার্থ উত্তর দিয়েছেন—

> একথা তো গত সাত মাস ধরে শুনে আসছি জনাব। আপনার তর্জ্জন গর্জ্জন যতো বাড়ছে—ওদের তর্জ্জনী তত বলিষ্ঠ হচ্ছে। আপনার সৈন্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করে আপনাদের ঔপনিবেশিক শাসন বলবৎ রাখবার চেষ্টা

---

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪
৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

করছে, ওদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ততই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হচ্ছে। প্রবল বিক্রমে বিদ্রোহীরা আমাদের সৈন্যদের ওপর আঘাতের পর আঘাত হেনে এখন এক একটি অঞ্চল তারা দখল করছে। আর আপনার আমলাবাজ হুজুরে আলারা এখন পাকিস্তানকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।[৭৬]

ফতে খান এত শীঘ্রি দমবার পাত্র নন, পিণ্ডির সিংহাসনের লোভ তাকে এক মরণ খেলার নেশায় উন্মত্ত করে তুলেছে। তিনি একের পর এক আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত সেনাদল পাঠাচ্ছেন বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য। কিন্তু বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখে তার সৈন্যরা টিক্‌তে না পেরে পিছু হটে আসছে। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্মুখ খানকে বলেছেন—

ইচ্ছে করে, আমি নিজে একবার বাংলায় গিয়ে, আমার সৈন্যদের হুকুম দিই যে, গোটা মসরেকী বাঙ্গালটাকে অগ্নি সংযোগ করো। এক সঙ্গে আগুন জ্বলুক বাংলার প্রতিটি ঘরে। সেই আগুনে ঝলসে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক প্রতিটি বাঙালি। বাংলার আগুনের লেলিহান শিখা আকাশকে স্পর্শ করুক। বিশ্ব দেখুক তাকত দিয়ে কিভাবে তাবত রক্ষা করতে হয়। আমি বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই।[৭৭]

বাংলাদেশের উপর এত অত্যাচার—ধ্বংস, হত্যা ও অগ্নিসংযোগের পরও স্বাধীনতার জন্য বাঙালি তার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে সংগ্রাম করে চলেছে। বিশ্ববাসীও বাংলাদেশের এই অকুতোভয় সৈনিকদের সমর্থন জানিয়েছেন। এরপরও ফতে খান তার ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করতে পারেননি—

দুর্মুখ, আমার সাজানো গুলবাগ ঝড়ের ঝাপটায় তছনছ হতে চলেছে। সর্বদা একটা যেন ভূকম্পন—মসনদকে কাঁপিয়ে তুলছে। বাতাসে বারুদের সোঁধা গন্ধ, চারিদিকে মৃত্যুর হাহাকার, বিদ্রোহের আগুনে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তবু—তুব আমি মসনদ চাই, রাজ্য চাই, অর্থ চাই, সুরা, সাকী, ভোগ, বিলাস সব চাই। একনায়কত্বের এই তক্তে তাউস তাই আমার কাছে এতো পেয়ারা—মেরা জান্‌সে পেয়ারা—হা-হা-হা।[৭৮]

পিণ্ডির দরবারের সম্মুখে একাকী দণ্ডায়মান বাদশা কেল্লা ফতে খান। লোভী, স্বার্থপর আর রক্ত লোলুপ বাদশা ফতে খান স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছেন তবুও তার লোভ লালসার সীমা নেই। বাঙালির স্বাধীন সত্তাকে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর—

...রক্ত নিতে গিয়ে রক্ত দিলাম। স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ইতিহাসের ডাষ্টবিনে নিক্ষিপ্ত হলাম। যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে ফেরার কোনো পথ নেই। ক্রমশ যেন অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ইতিহাসে

---

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪-৪৫

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

> আমি এক স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, জল্লাদ নামে চিহ্নিত হলাম। না–না এসব আমি কি বলছি। আমি মনের দিক থেকে কেন এতো দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি। না–না মনকে শাসন করবো আমি। আমি আরও কঠোর, আরও জালিম হবো। যাদের পায়ের নীচে দাবাতে চাই, তারা উঠবে মাথায়? হরকিস নেহি। বাংলার প্রতিটি ঘর আমি অন্ধকার করে দেবো। প্রতিটি জীবনকে আমি পঙ্গু করে দেবো।[৭৯]

হঠাৎ ঝড় উঠলো, বজ্রপাত হলো, দরবারের সমস্ত আলো নিভে গেল। অন্ধকারে এক নারীমূর্তি ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। নারীমূর্তি দর্শন করে ফতে খান ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন, তিনি চিৎকার করে বললেন—

> যাও—চলে যাও।[৮০]

নারীমূর্তি ধীরে ধীরে তার সামনে এগিয়ে এল, তাকে রূঢ় ভাষায় অভিযুক্ত করেছে—

> তোমার সৃষ্টি এইরূপ। তাই তো গলিত কাফন থেকে উঠে এসেছি তোমার সামনে। আমারও ঘর ছিল, সংসার ছিল, এক স্কুল মাস্টারের আটপৌরে সংসারের বৌ আমি। কিন্তু যেদিন বাংলার মাটি কাঁপিয়ে ঝড়ের মতো এলো তোমার হার্মদ ফৌজ। সব শেষ করে দিয়ে গেল। আমার স্বামী আর দুটি সন্তানকে নিয়ে আমি সুখের সংসার গড়েছিলাম। তুমি—তুমি জল্লাদ, আমাদের বাঁচতে দিলে না।[৮১]

ফতে খান পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বাঙালিদের অস্তিত্বকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য ধ্বংসলীলা আর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছেন তবুও বাঙলার বীর সন্তানেরা থেমে থাকেনি, স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনার জন্য মরণ পণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। ফতে খান ও নারী মূর্তির সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেটি তুলে ধরেছেন—

> ফতে। আমি ইচ্ছে করলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে তোমাদের অস্তিত্ব মুছে দিতে পারি। আমি বাংলার মাটি জ্বালিয়েছি, ঘর জ্বালিয়েছি। বাংলার বুকে আজ শুধু মৃত্যুর হাহাকার। সে সব নির্ব্বোধের দল, এখনও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে, তাদেরও স্থান হবে বাংলার মাটির নীচে।
>
> নারী। তবু তুমি আমাদের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিতে পারবেনা দস্যু। আমাদের রক্তের পিছল পথ ধরে এসেছে স্বাধীনতার জয়রথ। মায়ের অশ্রুধারা, বীরের রক্তদান কোনদিন বৃথা যেতে পারে না। আমরা রক্ত দিতে

---

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

> শিখেছি—প্রয়োজন হলে আরও রক্ত দেবো, স্বাধীনতার বেদীমূলে আরও প্রাণ দেবো বলিদান—তবুও স্বাধীনতা দেবো না।[৮২]

পিণ্ডির দরবারে একাকী বসে ফতে খান মানচিত্র হাতে নিয়ে তার পরিণতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করছেন—

> ... আমি আজ অনাগত অনিশ্চিতের পানে চলেছি। আঘাতে আঘাতে আমার বজ্রমুষ্ঠিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহীরা তাদের বাংলাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। পারলাম না—পারলাম না বাংলাকে হাতের মুঠোয় রাখতে। পরাজয়—উঃ কি নিদারুণ পরাজয়।[৮৩]

ফতে খান অন্ধকারে কেবলমাত্র বাংলাদেশের অত্যাচারিত নারী মূর্তিই দর্শন করেননি, নিজের দেশের রমণীদের মূর্তিও দর্শন করেছেন, তারাও তাকে অভিযুক্ত করেছে—

> না, আমি বঙ্গনারী নই। আমি পেশোয়ার রমণী। আমার তিন পুত্র তোমার সেনাবাহিনীতে ছিল। সমুদ্রের পানি লাল হয়েছে আমার পুত্রদের রক্তে। আমি মা হয়ে তিন পুত্রকে হারিয়ে কি নিয়ে বেঁচে থাকবো? তাই পোড়া নসীব আর দগ্ধ বুকের জ্বালা নেভাবার জন্য আমি আত্মহত্যা করেছি। আমার পুত্রদের এই মৃত্যু আত্মহত্যারই সামিল। কিন্তু কেন তারা প্রাণ দিল?[৮৪]

মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত নিহত পাকসেনার প্রেতাত্মাও তিনি দর্শন করেছেন, জনৈক সৈনিকের অভিযোগ—

> না, এ শহীদের মৃত্যু নয়—এ বীরের মৃত্যু নয়। কাপুরুষের ন্যায় আমরা প্রাণ দিয়েছি। কারণ এ যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ নয়। এ জং মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর স্বার্থরক্ষার লড়াই। তুমি আমাদের ধোকা দিয়েছো—ঠকিয়েছো। একটা নিরীহ জাতির ওপর আমার ভাইয়ের বুকে গুলী চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলে। বলেছিলে ওরা সব কাফের। তাই সরল বিশ্বাসে আমরা তোমার হুকুম তালিম করেছি।[৮৫]

ফতে খানের দরবারে সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য, আনন্দ, উৎসব কোনটিই নেই—আছে শুধু পরাজয়ের গ্লানি, ধিক্কার আর ঘৃণা। চব্বিশ বছরের শাসনের অবসান ঘটেছে, বাংলার মানুষ মিথ্যার দেওয়ালকে ভেঙ্গে ফেলে সত্য, ন্যায়ের পথে অগ্রসর হয়ে বিজয়ের স্বর্ণ শিখরে আরোহন করেছে। হত্যা আর ধ্বংসলীলার মধ্যেই ফুটেছে স্বাধীনতার রক্ত গোলাপ।

---

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০
৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮
৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯
৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

৫

'একটি জাতি একটি ইতিহাস' নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। নাট্যকার কল্যাণ মিত্র তার এই নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামের খণ্ড ইতিহাস তুলে ধরেছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে দু'বার 'একটি জাতি একটি ইতিহাস' নাটকটি প্রচারিত হয়। এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন—'শতাব্দীর নৃশংস রক্তস্নাত হয়ে স্বাধীনতার যে রক্তাক্ত সূর্যটা বাংলার ভাগ্যকাশে উদিত হলো, সেই সূর্য প্রণাম করি।'

এই নাটকের মধ্য দিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের পাশাপাশি যুদ্ধকালীন মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী চেতনার বহির্প্রকাশ ঘটেছে। নাটকটি আলোচনা প্রসঙ্গে আবু হেনা মোস্তফা কামাল লিখেছেন—

> 'একটি জাতি একটি ইতিহাস'-এ ব্যঙ্গ প্রশমিত হয়ে উদ্বেল হয়েছে দেশাত্মবোধ। আমাদের মুক্তি আন্দোলনের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতিকে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনীর ভেতরে স্থাপন করে কল্যাণ মিত্র তাঁর কুশলী হাতে তাতে যোগ করেছেন উজ্জ্বল বাস্তবধর্মী সংলাপ, নাট্যিক পরিস্থিতি এবং মঞ্চোপযোগী দৃশ্যাবলী। দুটি চরিত্রের নামকরণে প্রতীক ধর্মিতার আভাস লেগেছে। স্বদেশের মৃত্যু হলেও সে অমর ; কেননা তার পতাকা বহন করে নিয়ে যাবে সিরাজ। এক সিরাজের হাত থেকে বাংলাদেশের পতাকা কেড়ে নিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্ত, বিশ শতকের মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ যেন তারই প্রায়শ্চিত্ত করলো। হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ভয় প্রতিরোধ, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশ্বাসঘাতকতা—নিকট অতীতের এইসব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই নাটক যে বাংলাদেশের মঞ্চলোকে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করবে, আমার তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[৮৬]

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে নাট্যকার নাট্যকাহিনীর সূচনা করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে জনতা শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করছেন। উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে আর একটি মিছিল এগিয়ে এলো—মিছিলের পুরোভাগে স্বদেশ ও সিরাজ। শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সিরাজ শপথ বাণী উচ্চারণ করলো—

> এই শহীদ বেদীর পদতলে দাঁড়িয়ে আসুন সবাই শপথ গ্রহণ করি। বলুন, ... আমরা শপথ করছি, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাংলার যে সব অমৃতের সন্তান প্রাণ দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেছেন, আমাদের সেই মায়ের ভাষাকে আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবো। আমরা শপথ নিচ্ছি, বাংলার স্বাধিকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করবো। আমাদের শপথ, শোষণ, বঞ্চনাহীন বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলবো। প্রয়োজন হলে এক নদী রক্ত দেবো, তবু স্বাধীনতা হীনতার নাগপাশ থেকে বাংলাকে মুক্ত করবো। সোনার বাংলা আমাদের অস্তিত্ব—আমাদের আত্মার আত্মীয়— আমাদের সত্তা।[৮৭]

---

৮৬. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নাটক প্রসঙ্গে, একটি জাতি একটি ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২

৮৭. কল্যাণ মিত্র, একটি জাতি একটি ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে অত্যাচার, শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হয়ে বাঙালিরা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত আলোয় বেরিয়ে আসার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিল। ইমানের সংলাপের মধ্য দিয়ে সেটি প্রকট হয়ে উঠেছে—

> দেবো—দেব বাবু, স্বাধীনতা খরিদ করতে যদি গরীবের রক্ত লাগে—দেবো, মুঠো মুঠো রক্ত দেবো। যদি প্রয়োজন হয় কলিজাটা উপড়ে দেবো। আর পারিনে বাবু—আর শেকল পরে থাকতে পারিনে।[৮৮]

স্বদেশ চরিত্রটি প্রতীকধর্মী, সে স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারক ও বাহক, নাট্যকার তার সংলাপের মধ্য দিয়ে স্বদেশ প্রেমিক, বিপ্লবী এক যুবকের আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার পরিচয় তুলে ধরেছেন—

> স্বাধীনতা—স্বাধিকার চাই। শোষণ, বঞ্চনাহীন স্বদেশ আমরা চাই। শহীদ বেদীর ইটের পাঁজরে স্মৃতি গেঁথে রাখলে কিম্বা একুশের প্রভাতে কয় একমুঠো গাঁদা ফুলের গন্ধে শহীদের আত্মা শান্তি পাবে না। ভূখা মানুষের মিছিলে ধূলিকণা মাখা শহীদের শুকনো রক্ত আজ বাতাসে উড়ছে। গোটা বাংলায় আজ হাহাকার—হতাশা। বাংলার মানুষ যেদিন মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেবে—যেদিন গ্রহণ মুক্ত সূর্য তাপে পরিপূর্ণ উত্তাপ নেবে—সেদিন হয়তো শহীদের আত্মা শান্তি পাবে।[৮৯]

ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে ধোকা দিয়ে, দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনার নামে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। প্রস্তুতি গ্রহণ শেষ হলে সমস্ত আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে বন্দি করে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছেন। যাওয়ার সময় সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার উপর লেলিয়ে দিয়ে গেছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রথমেই ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সংগ্রামী যুবক স্বদেশ মিলিটারীদের গুলীতে নিহত হয়েছে। তার বন্ধু সিরাজ প্রতিজ্ঞা করেছে—

> স্বদেশ, তোর রক্তের কসম, রক্তের বদলে রক্ত নেবো। গুলীর জবাব গুলীতে দেবো।[৯০]

সিরাজের পিতা মিলিটারীদের গুলীতে নিহত হয়েছেন। সিরাজের মা তার দুই পুত্র মামুন ও সিরাজকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। স্বদেশের মা ও সিরাজের মার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সিরাজের মার চরিত্রের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের প্রকাশ ঘটেছে—

> স্বদেশের মা : যুদ্ধে তোর ছেলেদের যদি কোনো অঘটন ঘটে, কোন্ প্রাণ নিয়ে সহ্য করবি হতভাগী?

---

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজের মা : আজ এদেশের বহু মা ছেলে হারিয়েছে, অনেক স্ত্রী বিধবা হয়েছে, বহু বোন ভাইকে খুইয়েছে, বহু মেয়ের ইজ্জত লুটে নিয়েছে জালিম দস্যুরা। তারা যদি সহ্য করতে পারে তাহলে আমিও পারবো। তোমরা—তোমরা আমাকে আশীর্বাদ করো দিদি, আমি যেন বীর সন্তানের মা হয়ে বাঁচতে পারি।[৯১]

মামুন সিরাজের সহোদর, সেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, সে খান সেনাদের হত্যা করে পিতৃঋণ পরিশোধ করবে। দেশের নিরীহ জনসাধারণকে খান সেনাদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে চায়, এদেশকে শত্রু মুক্ত করতে চায়—

> গুলীর জবাব গুলী, রক্তের বদলা রক্ত—এই আজ বাঙালিদের সব চাইতে বড় কসম। যার যা হাতিয়ার আছে তাই নিয়ে সকলে আজ হানাদার শত্রুর মোকাবেলা করছে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাঙালি জাতি আজ প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন বাংলাদেশ। এখন শুরু হয়েছে সেই স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। এ'দেশ থেকে প্রতিটি হানাদারকে বিতাড়িত করতে হবে—নিশ্চিহ্ন করতে হবে। জানো মা কি দুর্জয় সাহস, কি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মুক্তিফৌজরা শত্রুর মোকাবেলা করছে।[৯২]

এ নাটকের বৈরাগী চরিত্রটি সেও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী সিরাজের মায়ের দুর্দিনে, তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে সাহস আর প্রেরণা যুগিয়েছে, তার এই ত্যাগ-তিতিক্ষা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে—

সিরাজের মা : খোদাকে ডাকছি দিনরাত, যে স্বাধীনতার জন্য এতো রক্তপাত, এত বলিদান, সেই স্বাধীনতা বাঙালি যেন পায়।

বৈরাগী : নিশ্চয়ই পাবে মা। সত্য যুদ্ধে কেউ পরাজিত হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসে একটি জাতি এতো বড় আত্মত্যাগ—এতো বড় অভ্যুত্থান কেউ কি কোনোদিন দেখেছে! আজ গোটা বাংলা মহামিলনের মহাক্ষেত্র। আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান সকলের রক্ত এক হয়ে তার একটি মাত্র পরিচয় তারা বাঙালি।

সিরাজের মা : আর কত রক্ত বাঙালি দেবে?

বৈরাগী : স্বাধীনতা কেউ এমনি দেয় না মা। রক্ত, রক্ত দিয়ে খরিদ করা হয় স্বাধীনতাকে। ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, সালাম, বরকত, শেখ মুজিবের বাংলা আজ রক্ত দিতে শিখেছে। বাংলার স্বাধীনতাকে কোনো দস্যু কেড়ে নিতে পারবে না।

সিরাজের মা : তাই যেন হয় বৈরাগী—তাই যেন হয়।

---

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

বৈরাগী : একটু সাবধানে থেকো মা। জল্লাদ ইয়াহিয়ার পোষা কুত্তাগুলো শহর, গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। নির্বিবাদে নিরীহ বাঙালিদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। জানো মা, বাংলার কতো নারী ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে জহরব্রত গ্রহণ করেছে, শাড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ইজ্জত বাঁচিয়েছে।[৯৩]

মাস্টার সাহেব একজন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক ও আদর্শ কর্মী। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই নাটকে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। তার সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরেছেন—

> ... এদেশে একনায়কত্ববাদী শাসন আর পুঁজিবাদী, আমলাতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী সামরিক চক্রের খুনের রক্তাক্ত হাতকে গুড়িয়ে দেওয়া। আমরা গত চব্বিশ বছর অনেক সয়েছি। এই চব্বিশ বছর অনেক গুলী, জেল, জুলুম, সহ্য করেছি। এই চব্বিশ বছরের ইতিহাস জেল, জুলুম, লুণ্ঠন, বঞ্চনা, শোষণ, অত্যাচারের ইতিহাস। ইসলামের নামে পাকিস্তানি হার্মদরা আমাদের নিষ্পেষিত করেছে। কিন্তু আজ সেই অত্যাচার, জুলুম, বুমেরাং হয়ে পিণ্ডির মসনদকে আঘাত করেছে। আগুন পানিতে নেভে কিন্তু দাবানল নেভানো যায় না।[৯৪]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুর শোষণ চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে অনুপম সেনের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়—

> তাঁর মতে, রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল সার্বিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের, বিশেষভাবে পাঞ্জাবিদের করায়ত্ত। পাকিস্তানের অস্তিত্বের অধিকাংশ সময়েই এই রাষ্ট্রটি শাসিত হয়েছে সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের দ্বারা।[৯৫] পাকিস্তান সামরিক শাসনের মৌল প্রকৃতিও ছিল, সামরিক ও বেসামরিক আমলার অংশীদারি শাসন।[৯৬] পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের উপস্থিতি ছিল কত অকিঞ্চিতকর ; আর এর মধ্যেই নিহীত রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে শোষণের মূল কারণটি।[৯৭]

'একটি জাতি একটি ইতিহাস' নাটকে মাস্টার সাহেবের সংলাপে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

> বর্ব্বর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে আমরা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছি। কিন্তু কেন এই সংগ্রাম? কিছু আমলাতন্ত্রী, ঔপনিবেশিক শাসক আর পুঁজিপতিদের নিয়ে গঠিত পাকিস্তান আজ চব্বিশটা বছর ধরে বাংলাকে শোষণ করছে। প্রতি মিনিটে ষাট হাজার টাকার পরিমাণ অর্থ আর সম্পদ বাংলাদেশ থেকে পাচার হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। আমাদের ওরা ঔপনিবেশিক দাসত্বের শেকলে বাঁধতে চেয়েছিল। তাই বাংলায়

---

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২
৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০-৪১
৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
৯৬. সংগ্রহ, সৈয়দ শওকতুজ্জামান, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধান, পৃ. ১৪
৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

> নির্বাচনের গণরায়কে ওরা কামানের গোলার মুখে উড়িয়ে দিতে চাইল। বাঙালি জাতিকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দিতে চাইল। তাই আমরা মানুষের অধিকারে বাঁচবার দাবি নিয়ে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছি।[৯৮]

জনতা এসে মাস্টার সাহেবের সাথে সংগ্রামে যোগ দিয়েছি—

> আমরা লড়াই করে বাঁচবো।[৯৯]

মাস্টার সাহেব দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন, বিদেশী রাষ্ট্রগুলোও বাংলাদেশকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে—

> ... ভারত আর সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুজিবনগরের ঐতিহাসিক আম্রকাননে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়েছে। তোমরা শত্রুর সরবরাহ আর যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দাও। দেড় হাজার মাইল দূর থেকে রসদ এনে যুদ্ধ করা শত্রুর পক্ষে সম্ভব নয়। মুক্তিফৌজ ভায়েরা অসম সাহসিকতার সঙ্গে দখলদার বাহিনীকে ঘায়েল করেছে। শত্রুর মনে ভয় ঢুকেছে। জঙ্গীশাহী দেউলে হতে চলেছে। প্রতিদিন দলে দলে যুবকেরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। দখলদার বাহিনীর ধ্বংস অনিবার্য। এই জেনো সাইড, এই গণহত্যার জবাব আমাদের দিতে হবে।[১০০]

বাঙালি সৈন্যদের কাছ থেকে পাক সেনাবাহিনী অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদের নিরস্ত্র করে নানাভাবে অত্যাচার করেছে। মোশারফ পাকবাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দেননি বরং তাদের সাতাশ জনকে হত্যা করেছেন। সেই প্রতিশোধের শিকার হয়েছে মোশারফের পরিবারবর্গ—

> যশোর ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈন্যদের হাত থেকে যখন অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে গেল পাক জল্লাদ বাহিনী, আমরা অস্ত্র দেইনি। লড়াই করেছি ইয়াহিয়ার পোষা কুত্তাগুলোর সঙ্গে। সাতাশটা কুত্তাকে হত্যা করে আমি পালিয়ে এলাম বাড়িতে। বাড়িতে এসে দেখলাম আমার ঘর জ্বলছে, স্ত্রী আগুনে পুড়ছে, আমার দুটি ছেলে বুক চাপড়ে কাঁদছে। এতবড় জুলুম করেও পাক হার্মদ বাহিনী আমাকে রেহাই দিল না। আমাকে আর আমার দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে মিলিটারী ছাউনিতে নিয়ে গেল।[১০১]

মাস্টার সাহেব মোশারফকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, তাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন—

---

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
১০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
১০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

মোশারফ, বুকে পাথর বাঁধো—মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াও। নিভৃতে চোখের জল ফেললে কোনো কাজ হবে না, হাহাকারে আকাশ কাঁপিয়ে দিলেও কোনো ফায়দা হবে না। আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ো, জলোচ্ছ্বাসের মতো পশু শক্তির উপর আছড়ে পড়ো, বুমেরাং হয়ে আঘাত করো, পুত্র হত্যা, স্ত্রী হত্যার প্রতিশোধ নাও।[১০২]

তৎকালীন পাক সেনাদের সাহায্যকারী দালালদের চরিত্রও এ নাটকে বিশ্বস্ততার সাথে অঙ্কিত হয়েছে। চেয়ারম্যান কামাল ও তার সহযোগী ছানাউল্লাহ পাক সেনাবাহিনীদের সাহায্য সহযোগিতা করেছে। কামাল ও ছানাউল্লাহ'র কথোপকথনে সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

কামাল : না—না আপনি আমাদের চিনতে ভুল করবেন না। দেশের দেখমত করার জন্যে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে চেয়ারম্যান হয়েছিলাম। এখন সেই আইয়ুবও নেই, মোমেনও নেই।

ছানাউল্লাহ : মানে হল গিয়ে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব হচ্ছেন তরল পদার্থ। যখন যে পাত্তরে রাখবেন—সেই পাত্তরের আকার ধারণ করবেন। মুসলিম লীগের পাত্তরে ছিলেন, এবার আপনাদের পাত্তরে আসবেন।[১০৩]

পাক সেনাবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে নিরস্ত্র বাঙালি কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত হলেও তারা দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে পাক সেনাবাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, বিশ্ববাসী বাঙালিদের এই সৎসাহস আর দৃঢ় প্রত্যয় দেখে বিস্মিত হয়েছে—

..... বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অশুভ হাতকে আঘাত করেছে। বাংলার বিস্ফোরণে হোয়াইট হাউস কেঁপে উঠেছে। তাই আজ যারা বিশ্বের গণতন্ত্রের মুখোশধারী মোল এজেন্ট, যারা স্ট্যাচু অব লিবার্টির বিড়াল তপস্বী, তারা বাংলার গণজাগরণে আঁতকে উঠেছে। আর এই আমলাতন্ত্রীদের বৈঠকখানা রাষ্ট্রসংঘের দরবার, তার ঠুঁটো জগন্নাথের কাছে ধর্না দিয়ে কোনো ফায়দা হবে না।[১০৪]

ইয়াহিয়া সরকার ধর্মের নামে অধর্ম করেছে। ধর্মের ছত্রছায়ায় বসে একের পর এক শোষণ করেই চলেছে। এই শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে মাস্টার সাহেবের সংলাপে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

... ধর্মকে যারা সুবিধাবাদী রাজনীতির হাতিয়ার করে, তাদের পরিণতি এটাই স্বাভাবিক। 'ইসলাম খতরে মে হ্যায়' এই ভূয়া জিগীর তুলে যারা মনুষ্যত্ব, মানবতাকে পদানত করতে চায়, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।[১০৫]

---

১০২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় পাক সেনাবাহিনীর দোসর রাজাকাররা খানসেনাদের পথ দেখিয়ে গ্রামে নিয়ে আসতো, আর গ্রামে এসেই তারা করতো নিরীহ জনসাধারণের উপর অকথ্য নির্যাতন—

> ...রাজাকাররা খান সেনাদের পথ দেখিয়ে গ্রামে নিয়ে আসছে। তারপর গ্রামের মানুষের ওপর চালাচ্ছে অকথ্য নির্যাতন। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে পশুরা। তাছাড়া আলবদরদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।[১০৬]

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পথে অনেক মায়ের শিশু অনাহারে, অর্ধাহারে, রোদে পুড়ে বিনা চিকৎসায় পথের মাঝে মারা গেছে। হতভাগ্য পিতা-মাতা সেই মৃত সন্তানদের রাস্তার পাশে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। 'একটি জাতি ও একটি ইতিহাস' নাটকে নাট্যকার সেই ঘটনাবলীর বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরেছেন—

> ... কত সর্বহারা মা, বোন ভারতে পালিয়ে যাবার সময়, তাদের কোলের বাচ্চা রোদে পুড়ে, অনাহারে পথের মাঝে মরেছে। অভাগা বাপ-মা সেই মরা সন্তানদের রাস্তার পাশে ফেলে পালিয়েছে। ভারতে স্মরণার্থী শিবিরে, প্লাটফর্মে কতো শিশু, মিলিটারীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েও—রোগের হাত থেকে বাঁচলো না।[১০৭]

প্রায় এক কোটি মানুষকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে আর শত শত নারীকে ধর্ষণ করেছে। দলে দলে তরুণীদের গ্রেফতার করেছে। বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে আটক তরুণীদের একেবারে উলঙ্গ রেখে পাকবাহিনী এক নারকীয় আনন্দ উপভোগ করছে। শত শত তরুণীকে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দেওয়া হয়েছে।[১০৮]

সিরাজের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তুলে ধরেছেন—

> .... বর্বর পাক বাহিনী আমাদের দেশের কয়েক লক্ষ মা বোনের ইজ্জত কেড়ে নিয়েছে। ঘৃণ্য হার্মদ বাহিনী তাদের 'কনসেনটেশন ক্যাম্পে' কত বাঙালি মেয়েদের ... উঃ। পৃথিবীর কোনো সভ্য জাতি সে দৃশ্য চিন্তা করতে পারে না। হাজার নারী আজ ধর্ষিতা।[১০৯]

যুদ্ধের সময় পাক শাসনগোষ্ঠী এদেশে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল ; সুযোগ সন্ধানী মুসলিম লীগ আর আলবদররা রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাচ্ছিল—

মোশারফ : ... বাংলায় পাক দস্যুরা শুধু বাঙালির রক্ত নিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না। তারা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে বাংলায়। এমনকি চাষীর বলদগুলো পর্যন্ত পাক জানোয়াররা খাচ্ছে। বিদেশী রিলিফের জিনিসগুলো পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর কাজে লাগাচ্ছে।

সিরাজ : হ্যাঁ। তবে মুসলিম লীগ, জামায়তে ইসলাম এর দালাল আর আল্-বদররা রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাচ্ছে।[১১০]

---

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
১০৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ১৪৭
১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সুদীর্ঘ নয় মাস ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এদেশ স্বাধীন হলো—

> বিশ্ব বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো, একটি জাতি রক্তের বিনিময়ে সেই অমিত দীপিত স্বাধীনতার সূর্যটাকে কি করে ছিনিয়ে এনেছে। আমরা ঔপনিবেশিক দাসত্বের শেকল ছিঁড়ে ফেলেছি। আমাদের মধ্যে ছিল ঐক্য, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। তাই তিরিশ লক্ষ বাঙালির রক্তের ওপর দিয়ে এসেছে এই স্বাধীনতার জয়রথ।[১১১]

যুদ্ধের পর পাকবাহিনীর দোসর, আল্-বদর আর রাজাকাররা রাতারাতি ভোল পাল্টে দেশ-দরদি হয়ে ওঠে—

> .... আল্-বদর, দালাল আর রাজাকাররা রাতারাতি ভোল পাল্টাইয়া দেশ-দরদী হইছে। আমাগো চক্ষের সামনে ময়ুর পুচ্ছ লাগাইয়া কাকের দল ঘুইরা বেড়াইবে, তা সহ্য করুম না। এই জালিমগোরে যে বাঁচাইবার চেষ্টা করবো, তাগো ছাড়ুম না আমরা। তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্ত দিয়া ধুইয়া বাংলার মাটিরে খাঁটি সোনা করছি। সেই খাঁটি সোনার মধ্যে খাদ রাখতে দিমুনা।[১১২]

দেশ স্বাধীন হয়েছে সিরাজ মামুন তাদের পিতৃহত্যার ঋণ পরিশোধ করেছে, সিরাজের মা আজ গর্বিত, আনন্দিত—

> ...দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমার দুটি ছেলে ওদের বাপের রক্তের প্রতিশোধ নিতে পেরেছে—এর জন্য সত্যিই আমি আনন্দিত।[১১৩]

সদ্য প্রাপ্ত স্বাধীনতার আনন্দে গ্রামবাসীরা সবাই উল্লসিত, মাস্টার সাহেবও ওদের সাথে এই আনন্দোৎসবে শরিক হয়েছেন—

> চেয়ে দেখো চারিদিকে নিঃস্ব, রিক্ত মানুষগুলো আজ মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ধ্বংসের মাঝেই নূতনের জন্ম। চারিদিকে নূতন জীবন গড়ার ছুটাছুটি। ঐ দেখো বুড়ো শিবের মন্দিরে পূজা হচ্ছে, খোদার ঘর আজ প্রাণবন্ত, ঐদিকে তাকিয়ে দেখো, ঐ ধূলোমাখা উলঙ্গ শিশুটা গালভরা মধুর হাসি নিয়ে কেমন সূর্যের পানে চেয়ে আছে।[১১৪]

হিলি সেক্টরে মামুন একাই শত্রু সেনাদের এক বাঙ্কার ধ্বংস করে বহু শত্রু সেনাকে খতম করে। কিন্তু হঠাৎ শত্রুপক্ষের একটা সেলের আঘাতে তার মৃত্যু হয়। মুক্তিফৌজরা মামুনের লাশ বহন করে মায়ের কাছে নিয়ে এসেছে। মামুনের হতভাগ্য মা মামুনের রক্তাক্ত মুখটা বুকে তুলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে—এইভাবে ফিরে এলি বাবা—এইভাবে মাকে ফাঁকি দিলি হতভাগা ! তোর মা যে তোর পথ চেয়ে বসে ছিল। খোদা[১১৫]—

---

১১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪
১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪
১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

মামুনের নেপথ্য সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্য কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে—

> মা, মাগো, কেঁদোনা মা, হানাদাররা তোমার ছেলেকে বাঁচতে দিল না। কিন্তু মাগো, তোমার বুকের মাঝে আমি বেঁচে আছি, বাংলার মাটিতে আমার রক্ত মিশে আছে। সেখানেও আমি বেঁচে আছি। মাগো, আমাকে চিনে নিও। বাংলার লক্ষ শিশুর হাসিভরা মুখের মাঝে আমাকে খুঁজো, তোমার ছেলেকে পাবে, বাংলার আঁধার ঘরের মাঝে আমাকে খুঁজো, আমি প্রদীপ হয়ে জ্বলবো, বাংলার মাটিতে আমাকে খুঁজো আমি রক্তপলাশ হয়ে ফুটে তোমার পানে চেয়ে থাকবো। বাংলার মাটি আর তোমার মতো মায়ের বুকের স্নেহের উত্তাপ আমাকে ধন্য করেছে মা। মাগো, আমি আব্বার খুনের প্রতিশোধ নিয়েছি, বাংলার মানুষের রক্তের প্রতিশোধ নিয়েছি—তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো মা। আমি আছি—আমি তোমার বুক জুড়ে আছি মা—আমি তোমার কোল জুড়ে আছি।[১১৬]

একটি জাতি একটি ইতিহাস নাটকটিকে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন—তুষানল, প্রলয়, জাগরণ, রক্ত, বিস্ফোরণ, অভ্যুত্থান, সংগ্রাম, বারুদ, সূর্যোদয়, ইতিহাস। নাটকের অধ্যায়গুলো নাট্যকার পর পর সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত—ঘটনাবলীর ইতিহাস তুলে ধরেছেন। স্বদেশের মৃত্যু হলেও তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেছে সিরাজ। স্বদেশের বুকের রক্তে রাঙানো পতাকা বহন করে নিয়ে যাবে একালের সিরাজ। পলাশী প্রান্তরে এক সিরাজ-উদ-দৌলার হাত থেকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ পাক-হানাদার বাহিনীর হাত থেকে সেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে এদেশ থেকে চিরদিনের জন্য বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে।

৬

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত 'নিঃশব্দ যাত্রা' আলাউদ্দিন আল আজাদের স্বল্পায়তন বিশিষ্ট বেতার নাটক।[১১৭] বিগত মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শওকতের হৃদয়বৃত্তির পাশাপাশি অসৎ নিজামের স্বার্থপরতা ও কপটতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকে নাট্যকারের ত্রৈমাত্রিক উপস্থাপন সার্থকতার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে।

দেশপ্রেমিক আদর্শ ছাত্রনেতা শওকত মাতৃভূমির চরম দুর্দিনে তার প্রেমিক লায়লাকে ছেড়ে মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শওকতের সংলাপের মধ্য দিয়ে তার স্বদেশ প্রেমের জাগ্রত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—

---

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১১৭. বাংলাদেশ বেতার থেকে ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাত পৌনে দশটায় প্রথম প্রচারিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

শওকত : ... ওরা অতর্কিতে আক্রমণ করেছে আমাদের, কাপুরুষের মতো। হয়তো শুনেছো এই ঢাকা শহরেই একরাত্রে হাজার হাজার লোক হত্যা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বিধ্বস্ত, চারশো ছাত্র, একশ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, সাতজন প্রফেসর নিহত। লায়লা, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধ।

লায়লা : তুমি ভীষণ উত্তেজিত শওকত।

শওকত : উপায় নেই। আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। নরপিশাচ পাষণ্ডদের এতবড় ধৃষ্টতা। অস্ত্র ধরেছে আমার সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে? আমি কৃষক, আমি শ্রমিক, আমার অশ্রু আমার ঘামের টাকায় কেনা অস্ত্র দিয়ে মারছে আমাকেই? কিন্তু আর নয়। অস্ত্রের জবাব অস্ত্রে। এটাই সত্য, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতার নবজন্ম হলো। আমরা এখন মুক্ত জাতি, আমাদের রাষ্ট্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। গতরাত থেকে আমরা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছি। যুদ্ধ শেষ হবে তখনই, যখন প্রতিটি হারমাদ সৈন্যকে খালে বিলে নদীতে সাগরে ডুবিয়ে মারতে পারবো।

লায়লা : ... ওদের কত অস্ত্র কত গোলা বারুদ, তা'ছাড়া শুনছি ওদের সঙ্গে আছে দুটি বিগ পাওয়ার।

শওকত : ... জনতার শক্তির কাছে, সব শক্তি তুচ্ছ। আমরা লড়ছি সত্য, ন্যায় ও শান্তির জন্য। ওদের অনেক অস্ত্র আছে, আর সত্যই আমাদের অস্ত্র। আমরা এগিয়ে যাবো রাশি রাশি অস্ত্র এসে হাতে ধরা দেবে। আমরা শত্রুর অস্ত্র দিয়েই শত্রুকে আঘাত হানবো।[১১৮]

সুযোগ সন্ধানী নিজাম দেশ সেবার নামে কলকাতা থেকে শর্টকোর্স ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে শওকতের প্রেয়সী লায়লার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, শওকতের সরলতার সুযোগ নিয়ে সে লায়লার দিকে হাত বাড়ায়। তাকে পাওয়ার জন্য শঠতার আশ্রয় নেয়। শওকতের নামে মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করে লায়লাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে—

নিজাম : ...আমরা মিলিটারীর সামনে পড়ি সি এ্যান্ড বি রোডের উপর। ওরা আমাদের দেখতে পেয়েই গুলী শুরু করলো। দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিন্তু কয়েকজন প্রথমেই শেষ। তাদের একজন শওকত। বলেছিলাম আর লায়লাকে দেখছিলাম। সবটা শুনলো না লায়লা। নিজের কোঠায় গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।[১১৯]

নিজাম এক সময় লায়লাকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অবস্থানকালে এই সংবাদ পেয়ে শওকত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। যুদ্ধ শেষে জয়ের আনন্দ নিয়ে ঘরে ফেরার বাসনা ত্যাগ করে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ শুরু করলো, তুলসীর আমবাগানে শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি হলো। অসীম বীরত্ব নিয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলো—

১১৮. পূর্বোক্ত, নিশঃব্দ যাত্রা, পৃ. ২৪০
১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

... শত্রু সংখ্যায় অনেক বেশি। তারপরও তাদের উন্নত অস্ত্র। ওদের প্রবল চাপে তোমার সঙ্গীরা পিছু হঠতে লাগলো। কিন্তু তুমি রইলে একই জায়গায়। কারুর কথা শুনলে না। ...... গুলীতে গুলীতে জর্জরিত হতে লাগলো তোমার শরীর। ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তোমার চোখ মুখ হাত পা রক্তাক্ত। শেষ গুলীটি পর্যন্ত খরচ করে তুমি শুয়ে পড়লে তোমার রক্তের বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়লে চিরতরে।[১২০]

দেশ স্বাধীন হয়েছে, নিজামের মত স্বার্থপর ব্যক্তিরা রাতারাতি তাদের চেহারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। সে নিজেকে দেশপ্রেমিক বলে প্রচার করে, শহীদ দিবসে বক্তৃতা দেয়। মাইকের সামনে দাঁড়ালেই গরগর করে কথার পর কথা বেরিয়ে আসে—

... স্রোতের মতো, বিশেষ করে শহীদ দিবস তো সেট বিষয়। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে গণতন্ত্র। স্বাধিকার আন্দোলন। মুক্তি সংগ্রাম। সেদিনের রক্ত আজকের বিপুল স্রোতে এসে মিশেছে। সে রক্তই উৎস।[১২১]

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শওকতের অশরীরী আত্মার উপস্থাপন করে নাট্যকার নিজামের বিবেকবোধকে জাগ্রত করেছেন। সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছে—

নিজাম : ... তুফানীর আমবাগানে আমি একটা স্মৃতিস্তম্ভ করব। আর আত্মপ্রতারণা নয়। এবার কাজে নামবো। দেশকে গড়ে তুলতে পারলেই শান্ত হবে ওর আত্মা।[১২২]

যুদ্ধের সময় চাটগাঁয়ে নিগৃহীতা হওয়ার কারণে ফরিদার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে। শোকে-দুঃখে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। 'নিঃশব্দ যাত্রা' নাটকে নাট্যকার যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'নিঃশব্দ যাত্রা' আলাউদ্দিন আল আজাদের সার্থক সৃষ্টি।

৭

মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের 'বর্ণচোরা' নাটকটি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রচিত। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য তিনি 'বর্ণচোরা' নাটকটি লেখার তাগিদ পেয়েছিলেন। এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে নাট্যকার লিখেছেন —

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং স্বজন প্রিয়জন হারিয়ে আমাদের মন তখন ভীষণ ক্লান্ত, স্বাধীনতা বিরোধী শত্রুদের সম্পর্কে আমাদের অন্তরে তখন দারুণ ক্ষোভ। প্রতারকের চেহারা অসহ্য লাগত। সেই যন্ত্রণা, ক্রোধ এবং জ্বালা নিয়ে বর্ণচোরাকে চিহ্নিত এবং বর্ণালী নামের বাংলার রমণীয় যুদ্ধ ক্ষতকে উপলব্ধি করতে চেয়েছি। অপরাধ গোপন করার জন্য বর্ণচোরা প্রগলভ বলেই এ নাটকে বর্ণালী শব্দ নীরব। মঞ্চে যখন বর্ণচোরা এল

---

১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

১২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬

১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১

Dhaka University Institutional Repository

দর্শক তাকে ক্রোধ দিয়ে তিরস্কার করেছে। বাংলাদেশে ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত প্রথম নাটক বর্ণচোরা শ্রবণ করে একজন চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল, বর্ণচোরাকে মৃত্যুর শাস্তি দিয়েছেন কিন্তু যারা বর্ণচোরাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয় তাদের জন্য আপনার নাটকের শেষ দৃশ্যে একই পরিণাম থাকবে তো? পত্র লেখকের সে চিঠির উত্তর আমি এখনও রচনা করিনি।[১২৩]

'বর্ণচোরা' নাটকটি চারটি দৃশ্যে বিভক্ত। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার লিখেছেন—

প্রথম দৃশ্যের ঘটনাকাল ২৫ মার্চ ১৯৭১। এবং শেষ দৃশ্যের ঘটনা ঘটেছে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সকালে।[১২৪]

মমতাজ উদ্‌দীন আহমদে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'এবারের সংগ্রাম' এবং 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' তিনটি নাটক লিখেছিলেন। এই রূপকাশ্রয়ী নাট্যত্রয়ের বিষয় হয়েছিল তৎকালীন অবাঙালি শাসকের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মানুষের চেতনা। স্বাধীনতার ঠিক অব্যবহিত পরে লেখা 'বর্ণচোরা' নাটকে উদঘাটিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের স্বরূপ। তবে এবারের শত্রু কোনো বহিরাগত কেউ নয়, সে শত্রু হচ্ছে বাংলাদেশের দালাল, যারা অবলীলাক্রমে পাকবাহিনীদের সাহায্য সহযোগিতা করেছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় নাট্যকার মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ গোলাম সাদেক নামের পাক সেনাবাহিনীর সাহায্যকারী এক দালালের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় ঘটার সুযোগ দিয়েছেন। সাদেকের বাড়ির বাইরের ঘরে একটি সভা হচ্ছে, সেই সভায় জনতার উদ্দেশ্যে এক ভাষণে সে বলেছে—

...আপনারা আমার মত একজন প্রবীণ এর দাওয়াত কবুল করেছেন, এযে কত বড় ভাগ্যের কথা। আপনারা হলেন আমাদের হতভাগ্য নির্যাতিত, নিষ্পেষিত দেশের মানুষ। আপনারা দুঃখের সঙ্গে, মসিবতের সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, জীবন দেবার জন্য তৈরি হয়েছেন। আল্লাহ্ রাহমানুর রহীম, একমাত্র আল্লা জানেন, আপনাদের দুঃখ কষ্ট দেখে আমি দিনরাত কেঁদেছি। আমি কিন্তু মানুষটা অন্য জাতের, সবার সামনে পাবলিকলি কাঁদতে পারি না। রাতের অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছি, তাহাজ্জুদের নামাযে জায়নামাজে বসে চোখের পানি ফেলেছি। আমাদের সোনার বাংলা স্বাধীন হতে যাচ্ছে, আমরা মুক্ত হতে চলেছি। চিন্তা করে দেখেন ভাইসব, এ একটা কত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। আমাদের মধ্যে সব বিভেদ, সব রাগ, সব মতভেদ দূর হয়ে যাবে। আমরা সবাই ভাই ভাই। হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ সবাই আমরা একই মাতৃজননীর আওলাদ। এই যে বাবা জহুরুল হক, তোমার তো আমার সম্পর্কে অজানা কিছু নাই, তোমাকে তো সব কথা আমি দিল খুলে বলেছি।[১২৫]

---

১২৩. মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ, বর্ণচোরা, গ্রন্থ প্রসঙ্গ ,স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭, পৃ. ১৩

১২৪. মমতাজ উদ্‌দীন, বর্ণচোরা, স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, পৃ. ৬০

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

জনতার ভীড় থেকে জহুরুল মঞ্চে উঠে এসেছে, গোলাম সাদেকের কুকীর্তি জনতার সম্মুখে তুলে ধরেছে—

–উপস্থিত সংগ্রামী জনতা। আপনাদের সামনে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। ইনি গোলাম সাদেক, আমাদের জাতীয় আন্দোলনে এবং প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক চেতনায় অতীতে বেশ কয়েকবার আঘাত হেনেছেন। ইনি পশ্চিমাদের সঙ্গে আঁতাত করে আমাদের জাতীয় সম্পদ ও সুযোগকে বিনষ্ট করেছেন। ইনিই ভাষা আন্দোলনের সময় আমাদের ভাইদের হত্যা করেছেন।[১২৬]

জহুরুল দেশপ্রেমিক প্রতিবাদী যুবক, পাকশাসক গোষ্ঠীর ধামাধরা গোলাম সাদেককে সে ঘৃণা করে, জনতার আদালতে তার বিচার প্রার্থনা করে। সে জনতার সম্মুখে তার মুখোশ খুলে দিয়েছে—

যে নেতা তার সেক্রেটারীর ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করে সে নিজেও জনগণের একজন দুশমন। আমাদের ভাষা, সম্পদ আর বাঁচার অধিকার নিয়ে যারাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে আমরা কোনোদিন তাদের ক্ষমা করতে পারব না। আমরা ইতিহাসের এক মহাবিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, এখন ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের রাত এগারটা। হয়তো আগামীকাল সকালে আমাদের এ পবিত্র মাতৃভূমি সম্পূর্ণ শত্রু মুক্ত হবে।[১২৭]

গোলাম সাদেক ধূর্ত ব্যক্তি, সে সুকৌশলে তার দোষ–ত্রুটি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে—

… আমি তোমাদের দেশের একজন প্রবীণ মানুষ। চল্লিশ বছর ধরে রাজনীতি করছি কিন্তু নিজের জন্য কখনও কিছু করতে পারিনি। আমি বেকুফ, ক্লাশওয়ান ইডিয়ট। আমি ভুল করেছি কিন্তু আজ আবার আমি ভুলের মাফ চাইছি। বলুন, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি ক্ষমা চাই, ক্ষমা না করলে আমি আত্মহত্যা করব। একজন প্রবীণ নেতা আমি, যদি আত্মহত্যা করি তাহলেই কি আপনাদের সুখ। বেশ তাই করব।[১২৮]

চল্লিশ বছর ধরে পাক শাসকদের গোলামি করে তাদের অন্যায় অপকর্মে ইন্ধন যুগিয়ে গোলাম সাদেক রাতারাতি চল্লিশ বছরের গাদ্দারের পোশাক খুলে দেশপ্রেমিকের লেবাস পরেছে—

আমার একমাত্র ছেলে মতিউর রহমান। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। পাগল হয়ে গেছে। দিনরাত এক কথা, বাবা আমাকে একটা ফুল দাও। কত সখ করে বিয়ে দিলাম। ঐ মেয়েকে সে ভালবাসতো। একদিন এসে বলল, বাবা আমি বর্ণালীকে বিয়ে করব, খুব সখ করে বিয়ে দিয়েছিলাম। সব আমার তকদির। আমার ঘরের শান্তি চলে গেছে। বাইরের জগতে, দেশের মানুষের কাছে আমার ইজ্জত নেই। আমি কি? কি একটা হয়ে গেছি আমি। এমন সময় আমার স্ত্রীও বেঁচে নেই। যাক সব চলে যাক।

---

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

> আমার সব কিছু ভেঙ্গেচুরে খান খান হয়ে যাক, আমি বাঁচতে চাই না। ভাইসব আপনারা গুলী করে আপনার হতভাগ্য প্রবীণ নেতাকে হত্যা করুন। হত্যা করুন একটা আনফরচুনেট, আনব্রেশেড মানুষকে কতল করুন। তবু ক্ষমা চাই ভাইসব। যদি বিশ্বাস না হয় দেখুন, আপনারা দেখুন, আমি নিজের হাতে আমার চল্লিশ বছরের পোশাক খুলে ফেলেছি। দেশের খাঁটি পোশাক পরছি। আজ এই আমার [শেরওয়ানী খুলে মুজিব কোট পরল] পরিচয়, আমি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিতে চাই। আমিও বলতে চাই, এই প্রবীণ নেতা আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলতে চায়, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা। বাবা জহুরুল বল তোমরা আমাকে ক্ষমা করলে, বল।[১২৯]

গোলাম সাদেক জহুরুল ও তার সাথীদের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছে সে আর কখনও দালালী করবে না—

> ...ভাইসব এই আমার লক্ষ্মী মা, আমার একমাত্র পুত্রবধূ। ওর চোখে মুখে ক্লান্তি আর হতাশার মলিন ছায়া। আমার মা আজ এক বছর ধরে হাসতে ভুলে গেছে। বৌমা, আমাকে এদেশের সুন্দর সংগ্রামী মানুষ ক্ষমা করেছে। এই দ্যাখ আমি পোশাক বদলে ফেলেছি। আমি কসম করছি আর কোনোদিন কোনো কারণে দালালী করব না।[১৩০]

অকস্মাৎ আহত অবস্থায় স্বপনের অনুপ্রবেশ, সে এসে সংবাদ দেয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এদেশবাসীর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছে—

> পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আমাদের আক্রমণ করেছে। ট্যাংক মেশিনগান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে ফেলছে। ওরা কাউকে বাঁচতে দেবে না জহুর ভাই। রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু দেখে এলাম।[১৩১]

পাক সেনাবাহিনীদের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে প্রবীণ নেতা গোলাম সাদেক তার লেবাস পাল্টে ফেলেছে। সে শেরওয়ানী আর টুপি পরেছে এবং উপস্থিত সংগ্রামী যুবক জহুরের উদ্দেশ্যে বলেছে—

> আমি চল্লিশ বছর ধরে রাজনীতি করি। যতসব সেন্টিমেন্টাল আর উজবুকের দল। স্বাধীনতা নিব? কিসের স্বাধীনতা? কায়েদে আযম সাহেবের পবিত্র দেশ ভেঙ্গে খান খান করবে আর বসে বসে আমি তামাশা দেখব? না তা' হবে না।[১৩২]

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গোলাম সাদেকের বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে এবং গোলাম সাদেক নিজেকে পাকিস্তানি বলে পরিচয় দেয়। তারই কুপরামর্শে ক্যাপ্টেন জহুরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সিপাহীদের আদেশ দেয়। গোলাম সাদেক পুনরায় পাকিস্তানিদের দালালী শুরু করে—

---

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪
১৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

... এদেশে বাঙালি কেউ থাকবে না। সবাই পাকিস্তানী। আমরা আপনাদের বংশধর। যদি মেহেরবাণী করে ইজ্জাত দেন, তাহলে আজ থেকে আমার নাম খান গোলাম সাদেক খান, আমার আব্বাজানের নাম খান গোলাম রাব্বানী খান। আমি খানের বংশ খান।[১৩৩]

গোলাম সাদেক তার পুত্রবধূকে সাবধান করে দিয়েছে যাতে সে আর রবীন্দ্রসঙ্গীত না গায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে শুনলে সে তাকে খুন করে ফেলবে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে গোলাম সাদেকের বাইরের ঘরে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথোপকথন চলছে। স্বদেশ প্রেমিক একমাত্র পুত্র মতিউরকে সে পাগল বলে ক্যাপ্টেনের কাছে পরিচয় দিয়েছে, একমাত্র পুত্রবধূ বর্ণালীকে সে ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি—

... আপনি আমার দোস্ত। কম কথা। আপনি আমার পুত্রবধূকে মেহেরবাণী করে ঘরে নিয়ে যাবেন, শাদী করবেন, আমার ঘরে খানের বংশধর আসবে, আমার বাঙালি বংশের কলঙ্ক ঘুঁচে যাবে। আমি, আমি আল্লা আল্লারে। ক্যাপ্টেন এস সিনাতে মিনা মিলাও। আহা ভরে গেল, ভরে গেল।[১৩৪]

তৃতীয় দৃশ্যের সময়কাল রাত্রি ১২টা, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। সাদেক খানের সহচর বাতেন নিহত বাঙালিদের সংবাদ নিয়ে এসেছে—

বাতেন : এক হাজার সাতশো আটানব্বই জন।

সাদেক : মারহাবা। সমস্ত বাঙালি অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অফিসার, সাংবাদিক, ছাত্রনেতা, সব বেঈমানকে খতম করে দিতে হবে। বাঙালির বুদ্ধিকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দাও বাতেন ইবনে খাইয়াম। কাউকে বাঁচতে দিও না যদি কায়েদে আজমের এই পাকভূমি পাকিস্তানকে বাঁচাতে চাও।[১৩৫]

বাতেনের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তৎকালীন দালালদের অত্যাচারের ও নিষ্ঠুরতার চিত্র তুলে ধরেছেন—

কারো দুটো চোখ উপড়ে নিয়েছি, কারো মুখের মধ্যে গরম লোহার রড অহিস্তা ঢুকিয়ে দিয়েছি। কোনো কোনো কাফেরের সিনা চিড়ে কলিজা টেনে আনলাম। মাগীগুলোর হাত পা বেঁধে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলাম। কারো শরীর থেকে চামড়া চড় চড় করে টেনে নিলাম, তারপর মরিচ আর নুন ছিটিয়ে দিলাম চর্বিতে।[১৩৬]

চতুর্থ দৃশ্য, সময়কাল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। গোলাম সাদেকের পুত্রবধূ লাঞ্ছিতা হয়ে ফিরে এসেছে। তাকে দেখে সে ধিক্কার দিয়েছে—

---

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
১৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
১৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

বৌমা। তুমি ফিরে এলে কেন মা? ক্যাপ্টেন সাহেব তোমাকে পাঠিয়ে দিল কেন? ছি, ছি, তোমার মন বড় ছোট। ওরা আমাদের দোস্ত, ঈমানের ভরসা। ওদের দেহ মনে আনন্দ ঢেলে দাও মা। আনন্দ না পেলে ওরা লড়বে কেমন করে?[১৩৭]

১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে মতিউরের ছেলে পলাশের জন্ম হয়। মতিউর রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে তাকে বরণ করেছিল। কিন্তু তার পিতা সাদেক খান এক ভয়ংকর দৃষ্টি নিয়ে তার ছেলের দিকে তাকিয়েছিল। ঠিক এক বছর পর ঘটনাটি ঘটেছিল—

...ঠিক আর এক একুশ ফেব্রুয়ারিতে আমি আর বর্ণালী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে এসে দেখলাম, আমাদের পলাশ কথা বলে না, হাসেনা। পলাশের শরীর ঠাণ্ডা, পলাশ মরে পড়ে আছে। তোমার কাছে আমাদের পলাশের অপরাধ, একুশে ফেব্রুয়ারিতে পলাশের জন্ম হলো কেন। এত ঘৃণা তোমার একুশে ফেব্রুয়ারিকে।[১৩৮]

সেই থেকে মতিউর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, পাগল সেজেছে—

তুমি ফেব্রুয়ারিকে ভয়ংকর ভয় কর। সেই থেকে গুম হয়ে গেছি, পাগল সেজেছি। তোমাকে তিলে তিলে চেনবার জন্য আমি পাগল হয়ে বসে আছি। আমরা তো জানি তুমি দুধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে আমার পলাশকে হত্যা করেছিলে সেদিন।[১৩৯]

দেশ স্বাধীন হবার লগ্নে সাদেক খান নতুন করে দেশপ্রেমিকের পোশাক পড়তে চায়—

'আমি পোশাক খুলে বদলে ফেলেছি। বাঙালি পোশাক পরব।[১৪০]

সে তার পুত্র মতিউরের কাছে শেষবারের মতো ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। মতিউর তার সিদ্ধান্তে অটল—

শান্তি চাও? শুধু তুমি শান্তি চাও। আমি শান্তি চেয়েছিলাম, শান্তি চেয়েছিল আমার বর্ণালী। রব,, কুলসুম এদেশের কোটি কোটি মানুষ। সেজন্য তুমি আর তোমার শ্রেষ্ঠ সৈনিকরা এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছ। আমাদের সুখের ঘরকে বিষাক্ত করেছ। আমরা কাঁদতে ভুলে গেছি, হাসতে পারি না। আমাদের শান্তি দেবে কে? তোমরা আমার সোনার বাংলায় পুঁজিপতি আর সাম্রাজ্যবাদীদের ডেকে এনেছ, তারা আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে। এখন জ্বালা আর সর্বনাশের শেষ সীমায় তোমার আমার দেখা। বল কে মরবে?[১৪১]

---

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
১৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
১৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
১৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মতিউর তার বিশ্বাসঘাতক পিতাকে ক্ষমা করতে পারেনি। লাঞ্ছিতা স্ত্রীর হাতে অস্ত্র তুলে দেয়—

> বর্ণচোরা, কেউ আর তোমাদের বাঁচাতে পারবে না, কেউ না। বর্ণালী, আমার ঐ বাবার কপালে পিস্তলটা রেখে ট্রিগার টিপে ওকে হত্যা কর, শোভন কর দেশকে পলাশ আর শাপলাগুলো প্রাণভরে ফুটুক এবার বাংলাদেশে।[১৪২]

৮

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নরকে লাল গোলাপ' যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নিগৃহিতা নারীদের নিয়ে রচিত স্বল্পায়তন বিশিষ্ট বেতার নাটক।[১৪৩] বিগত মুক্তিযুদ্ধে খান সেনারা এদেশের মানুষের উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, শত শত মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। নাটকে বর্ণিত সাজেদা, মঞ্জুরি, আলেয়া সেই দুর্ভাগ্যের শিকার। আত্মীয়-স্বজন সমাজের কাছে এই সমস্ত ধর্ষিতা নারীরা উপেক্ষিত, অবহেলিত।

পাক সেনাদের অতর্কিত আক্রমণে সাজেদার সাজানো সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। স্বামী পরিত্যক্তা সাজেদা নার্সিংহোমে আশ্রয় পেয়েছে—

> সাজেদা : ... বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে ওর সংসার গড়েছিলাম। ছেলেমেয়ের পালা পোষা, অল্প রোজগার, কত কষ্ট। কিন্তু কোনোদিন অভিযোগ করিনি। পশুরা পাড়া ঘিরে ফেললো, ওকে বাঁচাতে গিয়েই আমি ওদের হাতে পড়লাম। অথচ সে। সে বলে কিনা আমি নষ্টা, আমাকে ঘরে তুলে নেবে না। ...কিন্তু আমি ছাড়বো না। আমি দেখে নেবো কে আমার অধিকার হরণ করতে পারে।[১৪৪]

অধ্যাপক আহমদ এর একমাত্র কন্যা মঞ্জুরীর উপর খান সেনারা পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে, তাঁর একটি পা গুলী করে করে উড়িয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানি সৈন্যদের এই নিষ্ঠুরতা তিনি নীরবে সহ্য করেছেন। কাগজপত্রে প্রকাশিত গণহত্যা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে তিনি থিসিস লিখছেন। রাত জেগে বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করছেন—

> আহমদ : ... আমার নেশা ধরে গ্যাছে। কাগজে কাগজে রোজ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে সব তথ্য বেরুচ্ছে তা থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার, বাংলাদেশের গণহত্যার পিছনে ছিল আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা।

---

১৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

১৪৩. 'নরকে লাল গোলাপ', বাংলাদেশ বেতার থেকে ২৩শে জুলাই, ১৯৭২ সালে প্রথম প্রচারিত হয়

১৪৪. আলাউদ্দিন আল আজাদ, শ্রেষ্ঠ নাটক, নরকে লাল গোলাপ, পৃ. ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

আনোয়ারা : পরিকল্পনা ?

আহমদ : হ্যাঁ পরিকল্পনা। জিনিসটা গুরুতর, বাইরের ডালপালা থেকে আমাদের মূলে পৌঁছুতে হবে। প্রথমে অনুমান তারপর প্রমাণ এবং শেষে কংক্লুশান। এই জেনোসাইডের মূলনীতি কৌশল এবং বিস্তৃতির স্বরূপ উদঘাটন শুধু বাংলায় নয় সারা বিশ্বের জন্যই দরকার। সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে সভ্যতার বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করা চাই।[১৪৫]

রোজী ও রহমান দুটি চরিত্র সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থপর মানুষের প্রতিনিধি। যুদ্ধের সময় রহমান সাহেব প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিব্যি চাকুরি করে যাচ্ছেন—

রহমান : ... সারা জাতি লড়ছে, মরছে আর আমি চাকুরি করছি। ভাবতে পারো? এখন লাইন ঠিক করতে না পারলে, গ্রেটডেঞ্জার।[১৪৬]

কামাল ভালোবাসতো মঞ্জুরীকে কিন্তু এই ভালোবাসার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বড়বোন রোজী। মঞ্জুরীর দুর্ঘটনার কথা জেনেও সে তাকে ভালোবেসেছে। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা কামাল যুদ্ধকালীন অত্যাচারিত প্রেমিকার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। আহমদ সাহেবের দুর্দিনে অকৃতজ্ঞ বন্ধু নাজমুল তাঁর বাড়িটি দখলের পরিকল্পনা করেছে। আহমদ সাহেবের এককালের পুরোনো ছাত্র উদার যুবক ফরহাদ সব জেনে শুনে মঞ্জুরীকে গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে। আসন্ন প্রসবা মঞ্জুরী ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নগরীর এক প্রান্তে এসে থেমেছে—

মঞ্জুরী : ... কাপুরুষ। মনুষ্যত্বের চেয়ে সমাজটাই যার কাছে বড়, সে আবার শিক্ষিত। ...বলে কিনা আমাকে ছেড়ে যেওনা তুমি, অথচ বোনের সামনে মাথা তোলবারও সাহস নেই। ...ওকে কেন দোষী করছি। এই তো আমার ভাগ্য ...আঁধার হয়ে এলো। কেমন করে পথ চলবো? পেটের ভিতরে বাচ্চাটাও গুতোচ্ছে। একটু জিরিয়ে নিই। বাতিওয়ালা কেউ যদি আসে।[১৪৭]

রাস্তায় ক্লান্ত পথিক মেজর জলিলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। সর্বস্ব হারিয়ে বিপর্যস্ত এক মুক্তিযোদ্ধা—

পথিক ...ওরা আমার বৌকে মেরেছে, ছেলেমেয়েদের খুন করেছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পশুরা বুঝতে পারেনি আমি মাটির সন্তান, আমাকে মারা যায় না।[১৪৮]

---

১৪৫. পূর্বোক্ত, নরকে লাল গোলাপ, পৃ. ২৫৯
১৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১
১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩
১৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযোদ্ধা পথিক শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন, সেক্টরে সেক্টরে উল্কার মত ঘুরেছেন, যুদ্ধ শেষে রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে আপন গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছেন। যাত্রাপথে ধর্ষিতা নারী মঞ্জুরীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার অনাহুত সন্তানকে তিনি গ্রহণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন—

পথিক : তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবো আমি। আমরা যখন পৌছবো, নয়নতারা তখন ভোর হয়ে যাবে। লোকজন ভিড় করবে আমাদের দেখার জন্য। আমি কিছু বলবো—না, একটু হাসবো শুধু। ওরা বুঝবে তুমি কে?[১৪৯]

মঞ্জুরীর প্রিয় লাল গোলাপটি তিনি মাটি থেকে তুলে নিয়ে ওর খোঁপায় গুজে দিয়েছেন। যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এ নাটকের বিষয়বস্তু হয়েছে। সেই সঙ্গে যুদ্ধপীড়িত জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা চিত্রও বর্ণিত হয়েছে। এদেশের শত শত নারী এই যন্ত্রণার শিকার হয়েছে, যুদ্ধের অনাহুত সন্তান নিয়ে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছে আবার কেউ গ্লানিকর জীবনের বোঝা বহন করে বেঁচে থেকেছে। নরকে লাল গোলাপ, যুদ্ধে লাঞ্ছিতা এক নারীর গ্লানিকর জীবনের শিল্পভাষ্য, নাট্যকারের সফল সৃষ্টি।

১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন এদেশের রাজনীতিতে এবং সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সঞ্চার করেছে স্বাধিকার প্রত্যাশী চৈতন্য। বাহান্নর এই প্রতিবাদ সামন্ত মূল্যবোধাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের শিকড়ে আঘাত হানলো। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে সামন্ত মূল্যবোধাশ্রয়ী মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় এবং প্রগতিশীল শক্তি যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় পাকিস্তানি শাসকবর্গকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের মহাপ্রলয় এবং সাধারণ নির্বাচনে স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্যে বাঙালির অকুণ্ঠ রায়ের প্রতি অবজ্ঞা ও একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা, এই মুক্তিসংগ্রাম সমগ্র জাতির অন্তর্লোকে যে চেতনা সঞ্চার করেছে তা এদেশের নাট্যক্ষেত্রে সংযোজন করেছে এক নতুন শিল্পমাত্রা। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নাটকে জড়িয়ে আছে যে সংগ্রাম ও বিজয়ের বিমিশ্র অভিব্যক্তি তা একান্তভাবেই মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার।

---

১৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদেশের রাজনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তন, সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য, সামন্ত মূল্যবোধাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শোষণমূলক ক্রিয়াকলাপ জনমনে যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে তারই প্রতিবাদস্বরূপ গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের নাটকের প্রেক্ষাপট। এ বিদ্রোহ প্রচলিত নিয়মনীতির বিরুদ্ধে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে। একটি পরাধীন জাতির সুদীর্ঘ সময়কালের সংগ্রামী ইতিবৃত্ত ও সমাজ সচেতনতার বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের নাটকে। প্রতিকূল পরিবেশে ও বিরুদ্ধ সমাজ কাঠামোতে সংগ্রামরত মানুষের দ্রোহ-বিদ্রোহকে আধুনিক চিন্তা-চেতনা লালিত নাট্যকারবৃন্দ তাঁদের নাটকে নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন।

ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এদেশের রাজনীতিতে একটি প্রাগ্রসর মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটে। এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁদের অন্তর্প্রেরণায় বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ, সমাজমনস্ক ও মৃত্তিকা সংলগ্ন নাট্যধারার সূত্রপাত ঘটে। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন বাতিল আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন—এই সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে সাহায্য করেছে। সচেতন বিবেক সম্পন্ন লেখকগণ সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়কে উপজীব্য করে নাট্যরচনায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। মানুষের অন্নবস্ত্র আর বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাঁদের কলম সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্মাণ ও গঠনশৈলীর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। গতানুগতিক নাট্যধারার পট পরিবর্তিত হয়ে যেখানে সমাজ ও জীবনের রূঢ় বাস্তবতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত রচিত বাংলাদেশের নাটকে মুনীর চৌধুরী, আস্‌কার ইবনে শাইখ, শওকত ওসমান, নুরুল মোমেন, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে ভাষা-আন্দোলনের রাজনীতি সচেতন দৃষ্টিতে তৎকালীন সামাজিক চালচিত্র। বিষয়বস্তু অনুসারে সমকালীন সময়ে রচিত নাটকের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিন্যাস করা যায় :

ভাষা আন্দোলন

ক. রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু রূপায়ণে :

নষ্টছেলে (১৯৫০), দুর্যোগ (১৯৫১), কবর (১৯৫৩)।

খ. সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নাটক :

Dhaka University Institutional Repository

১. শ্রেণী সংগ্রাম, গণচেতনা ও নির্যাতিত মানুষের দাবি প্রতিষ্ঠা :

বিদ্রোহী পদ্মা (১৯৫৩), আওয়াজ (১৯৫৩), যাত্রী (১৯৫৩), বাগদাদের কবি (১৯৫৩), তিতুমীর (১৯৫৪), পোড়োবাড়ী (১৯৫৫), বিলবাওড়ের ঢেউ (১৯৫৫), অগ্নিগিরি (১৯৫৯), মরক্কোর জাদুকর (১৯৫৯)।

২. চোরাকারবার, কালোবাজারী, নীতিহীন ব্যবসা, অন্যায়-অবিচার ও দুনীর্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ :

আওয়াজ (১৯৫৩), ব্ল্যাকমার্কেট (১৯৫৩), প্রতীক্ষা (১৯৫৪), অদ্বিতীয়া (১৯৫৬), যদি এমন হোত (১৯৬০)।

৩. মুসলিম লীগ সরকার, জমিদার শ্রেণী ও মুসলমান সমাজের ভন্ডপীর মুশীদদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ :

দুরন্ত ঢেউ (১৯৫৩), বাগদাদের কবি (১৯৫৩), তিতুমীর (১৯৫৪), পোড়োবাড়ী (১৯৫৫), অগ্নিগিরি (১৯৫৯), বহিপীর (১৯৬০)।

৪. দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, মোহাজের সমস্যা, বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, বহুবিবাহ ও সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার :

ব্ল্যাকমার্কেট (১৯৫৩), এই পার্কে (১৯৫৩), প্রতীক্ষা (১৯৫৪), অগ্নিগিরি (১৯৫৫), বিল বাওরের ঢেউ (১৯৫৫), ঋণ পরিশোধ (১৯৫৫), অদ্বিতীয়া (১৯৫৬), বোবামানুষ (১৯৫৬), অনুবর্তন (১৯৫৯)।

৫. কৃত্রিম নাগরিক সমাজ ও আধুনিক সমাজব্যবস্থার কুরুচিপূর্ণ আচার-আচরণ :

অদ্বিতীয়া (১৯৫৬), ঝড়ের পাখি (১৯৫৯), আবর্ত (১৯৬০)।

৬. স্বদেশ প্রেম, সর্বস্তরে শিক্ষাবিস্তার, আদর্শ ও নীতি প্রচার :

দুরন্ত ঢেউ (১৯৫৩), পোড়োবাড়ী (১৯৫৫), বিল বাওরের ঢেউ (১৯৫৫) করিম খাঁর বাড়ী (১৯৫৮), অগ্নিগিরি (১৯৫৯), মরক্কোর জাদুকর (১৯৫৯), মা (১৯৬০), আবর্ত (১৯৬০), যদি এমন হোত (১৯৬০)।

৭. অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার সংঘাত :

বিদ্রোহ পদ্মা (১৯৫৩), পোড়োবাড়ী (১৯৫৫), অভ্যুদয় (১৯৬০)।

৮. অর্থ ও আভিজাত্যবোধ, খান্দান ও বংশ মর্যাদাবোধের অহংবোধ দূরীকরণ :

ঋণ পরিশোধ (১৯৫৫), সয়লাব (১৯৫৬), সামনের পৃথিবী (১৯৬০), অহংকার (১৯৬০), বহিপীর (১৯৬০)।

Dhaka University Institutional Repository

৯. লোককাহিনী ভিত্তিক নাটক :

মধুমালা (১৯৫৬), পল্লীবধূ (১৯৫৬), বাদল বাঁশী (১৯৫৬)।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ নাটকই গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত। এ সময়ে রচিত নাটকে সমকালীন সমাজ-জীবন ও দেশকাল তির্যকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ষাটের দশকে নাট্যচর্চার এই প্রতিবাদী চেতনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও প্রাগ্রসর নাট্যকারবৃন্দ সমকালীন সমাজসত্যকে ইউরোপীয় নাট্য আঙ্গিকে রূপায়িত করে তুলেছেন। বিষয়বস্তু নির্মাণ, প্রকরণ পরিচর্যা ও গঠনশৈলীর দক্ষতায় নাট্যসাহিত্যে সংযোজন করেছেন এক ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পমাত্রা। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য নাট্যকারবৃন্দ হচ্ছেন--মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, শওকত ওসমান, নুরুল মোমেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সিকানদার আবু জাফর, সাঈদ আহমদ ও জিয়া হায়দার। বিষয়বস্তু অনুসারে সমকালীন সময়ে রচিত নাট্যসমূহের নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা যায় :

ষাটের দশকের ছাত্র-জনতার আন্দোলন :

ক. রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ নাটক

অনেক তারার হাতছানি (১৯৬৫), চিঠি (১৯৬৬), মাকড়সা (১৩৬৬)।

খ. সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নাটক

১. স্বদেশ প্রেম, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, আদর্শ ও নীতি প্রচার :

রক্তপদ্ম (১৯৬২), এপার ওপার (১৯৬২), যা হতে পারে (১৯৬২), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৬৪), সংযুক্তা (১৯৬৫), শিলা ও শৈলী (১৯৬৭), সুর ও ছন্দ (১৯৬৭), শতকরা আশি (১৯৬৯), রূপান্তর (১৯৬৯), ধানকমল (১৯৬৯), হোসেন সফদারের উইল (১৯৭০), শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ (১৯৭০)।

২. যুদ্ধ বিরোধী, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনা :

রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), মানুষ (১৯৬৬), একটি মশা, মিলিটারী, শকুন্ত উপাখ্যান।

৩. বংশ মর্যাদাবোধ, খান্দান ও আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত :

নয়াখান্দান (১৯৬২), ইহুদির মেয়ে (১৯৬২), যা হতে পারে (১৯৬২), কাঞ্চন (১৯৬২), সংযুক্তা (১৯৬৫), প্রচ্ছদপট (১৯৭০), শেষ অধ্যায় (১৯৭০)।

৪. শ্রেণী সংগ্রাম ও জনতার জাগ্রত চেতনা :

রক্তপদ্ম (১৯৬২), মায়াবী প্রহর (১৯৬২), এপার ওপার (১৯৬২), ধন্যবাদ (১৯৬৪), শেষ অধ্যায় (১৯৭০)।

Dhaka University Institutional Repository

৫. কৃত্রিম নাগরিক সমাজ ও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার কুরুচিপূর্ণ আচার-আচরণ :

যা হতে পারে (১৯৬২), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৬৪), শিলা ও শৈলী (১৯৬৭), সুর ও ছন্দ (১৯৬৭), একে একে এক (১৯৬৯), প্রচ্ছদপট (১৯৭০)।

৬. আধুনিক নরনারীর প্রেম, দাম্পত্যজীবন ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত :

আলোছায়া (১৯৬২), দন্ড (১৯৬৬), দন্ডধর (১৯৬৬), দন্ডকারণ্য (১৯৬৬), একতালা-দোতলা (১৯৬৯), বংশধর (১৯৬৯), বেশরিয়তি, গুন্ডা, যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০)।

৭. চোরাকারবার, কালোবাজারী, নীতিহীন ব্যবসা, অন্যায় অবিচার ও দুর্নীতি :

নয়াখান্দান (১৯৬২), মায়াবী প্রহর (১৯৬২), এপার ওপার (১৯৬২), আইনের অন্তরালে (১৯৬৭), হোসেন সফদারের উইল (১৯৭০)।

৮. যৌথ খামার, কৃষি আন্দোলন ও সমবায় সমিতি গঠন :

এপার ওপার (১৯৬২), শিলা ও শৈলী (১৯৬৭), সুর ও ছন্দ (১৯৬৭), ধানকমল (১৯৬৯)।

৯. দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, অর্থনৈতিক সমস্যা ও পুলিশ কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ :

নয়াখান্দান (১৯৬২), মায়াবী প্রহর (১৯৬২), মানচিত্র (১৯৬৩), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৬৪), সংযুক্তা (১৯৬৫), এ্যালবাম (১৯৬৫), পলাশী ব্যারাক (১৯৬৯), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০), মাইলপোস্ট।

১০. গোয়েন্দা পুলিশের কর্মতৎপরতা ও মুসলিম লীগ নেতাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত :

ফিট-কলাম (১৯৬৯), আপনি কে (১৯৬৯), নেতা।

১১. জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার :

শেষ অধ্যায় (১৯৭০), প্রচ্ছদপট (১৯৭০)।

১২. শিক্ষা সংক্রান্ত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা :

রূপলেখা (১৯৭০)।

১৩. স্বৈরাচারী শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের জীবন যন্ত্রণা :

তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪), উজানে মৃত্যু, ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬৮), মাইলপোস্ট, তৃষ্ণায়।

১৪. বিবিধ :

ক. ঘূর্ণিঝড়ের পটভূমিতে রচিত : কালবেলা

খ. মানুষের মনোজগতের গোপন রহস্য উদঘাটন : সুড়ঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

ষাটের দশকে রচিত নাটকে রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে বক্তব্য উপস্থাপনের পাশাপাশি ইউরোপীয় অভিব্যক্তিবাদী চেতনা ও অধিবাস্তববাদী ধারার সফল প্রয়োগে এ সময়ের নাট্যসমূহ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ঘিরে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় যে ধারাটি সংযোজিত হয়েছে তা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। বক্ষমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে সময়সীমা বাহাত্তর পর্যন্ত নির্ধারিত থাকায় খুব স্বল্প সংখ্যক নাটকই এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাক বাহিনীর সুদীর্ঘ নয় মাসের অমানবিক অত্যাচার গণহত্যা, লুণ্ঠন আর ধর্ষণ জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মমতাজ উদদীন আহমেদ লিখলেন 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (১৯৭১), 'এবারের সংগ্রাম' (১৯৭১), 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' (১৯৭১) এবং কল্যাণ মিত্রের 'জল্লাদের দরবার' (১৯৭১) জনমনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তারা পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বাঙালির দুর্বার সংগ্রাম ও স্বদেশ চেতনা মুক্তিযুদ্ধের নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। কল্যাণ মিত্রের 'একটি জাতি ও একটি ইতিহাস' (১৯৭২) নাটকে মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। মমতাজ উদদীনের 'বর্ণচোরা (১৯৭২) নাটকে চিত্রিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের ভণ্ডামী, পাশবিকতা ও মনুষ্যত্বহীনতার কাহিনী। আলাউদ্দিন আল আজাদের নিঃশব্দ যাত্রা' (১৯৭২) ও 'নরকে লাল গোলাপ' (১৯৭২) যুদ্ধকালীন ধর্ষণের কলঙ্কিত অধ্যায়। নির্যাতিত নারীদের অপরিমেয় বেদনা ও যন্ত্রণার করুণ ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে পরবর্তী সময়ে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। শামসুল হকের কাব্য নাট্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৪), নীলিমা ইব্রাহিমের 'যে অরণ্যে আলো নেই' (১৯৭৪), আল মনসুরের 'হে জনতা আরেকবার' (১৯৭৪), রণেশ দাশ গুপ্তের 'ফেরী আসছে' (১৯৭৪), মোহাম্মদ এহসানুল্লাহ্‌র 'কিংশুক যে মরুতে' (১৯৭৪), সাঈদ আহমদের 'প্রতিদিন একদিন' (১৯৭৮), জিয়া হায়দারের 'সাদা গোলাপে আগুন' (১৯৮২), পঙ্কজ বিভাস' (১৯৮২), মমতাজ উদদীন আহমদের 'বিবাহ' ও 'কি চাহ শঙ্খচিল' (১৯৮৫) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রায় শতাধিক নাটক রচিত হয়েছে। এই সমস্ত নাটকে রাজনৈতিক সত্যের পাশাপাশি সমাজ-জীবন বিশ্বস্ততার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ ও সমাজ-মনস্ক সকল নাট্যগ্রন্থই (দুষ্প্রাপ্য কিছু গ্রন্থ বাদে) এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা' (১৯৫২-১৯৭২) শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমকালীন নাট্যসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিষয়বস্তু নির্বাচন, আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শৈল্পিক প্রাতিস্বিকতায় বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য-সাহিত্য ক্ষেত্রে সংযোজন করেছে একটি ভিন্নমুখী শিল্পধারা। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে যে আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও সমাজমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির স্ফূরণ ঘটেছে তা একান্তভাবেই বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত নাট্যচর্চার অনিবার্য ফলশ্রুতি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি
আলোচিত নাট্যগ্রন্থের তালিকা

ক. ভাষা-আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটক (১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত)

রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনাসমৃদ্ধ নাটক

নাট্যকার	নাটক		প্রকাশনার তথ্য
মুনীর চৌধুরী	'নষ্টছেলে'	:	('কবর', নাট্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) চট্টগ্রাম, ১৯৬৬, শাহীন বুক ক্লাব
আসকার ইবনে শাইখ	'দুর্যোগ'	:	('দুরন্ত ঢেউ' নাট্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) ঢাকা, ১৯৫৩, শান্তি প্রকাশনী
মুনীর চৌধুরী	'কবর'	:	চট্টগ্রাম ১৯৬৬, শাহীন বুক ক্লাব

সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নাটক

নাট্যকার	নাটক		প্রকাশনার তথ্য
আসকার ইবনে শাইখ	'বিদ্রোহী পদ্মা'	:	ঢাকা, ১৯৫২ (১৩৫৯), শান্তি প্রকাশনী
আসকার ইবনে শাইখ	'আওয়াজ'	:	(দুরন্ত ঢেউ' নাট্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) ঢাকা, ১৯৫৩, শান্তি প্রকাশনী
আসকার ইবনে শাইখ	'যাত্রী'	:	(দুরন্ত ঢেউ' নাট্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) ঢাকা, ১৯৫৩, শান্তি প্রকাশনী
আসকার ইবনে শাইখ	'দুরন্ত ঢেউ'	:	(দুরন্ত ঢেউ' নাট্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) ঢাকা, ১৯৫৩, শান্তি প্রকাশনী
শওকত ওসমান	'বাগদাদের কবি'	:	চট্টগ্রাম, ১৩৫৯, কোহিনূর লাইব্রেরী
ওবায়েদ-উল-হক	'এই পার্কে'	:	ফেনী, ১৯৫৩, গুলনাহার হক
ফররুখ শিয়র	'ব্ল্যাক মার্কেট'	:	ঢাকা, ১৯৫৩ (?)
আসকার ইবনে শাইখ	'প্রতীক্ষা'	:	১৯৫৪ সালে রচিত, নাটকটি আসকার রচনাবলীতে (২য় খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত করা হয়
মোসলেম উদ্দীন	'তিতুমীর'	:	রাজশাহী, ১৯৫৪, বি.এস নাহার
আলি মনসুর	'পোড়োবাড়ী'	:	ঢাকা, ১৯৫৫, শেখ মনিরুদ্দিন এণ্ড কোং

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহিম খাঁ	'ঋণ পরিশোধ	:	ঢাকা, ১৩৬২, (১৯৫৫) ওয়ার্সী বুক সেন্টার
আসকার ইবনে শাইখ	'বিল বাওড়ের ঢেউ'	:	রচনাকাল ১৯৫৫, পরবর্তীতে আসকার রচনাবলীর (১ম খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত করা হয়
আলি মনসুর	'বোবা মানুষ'	:	ঢাকা, ১৯৫৬, পড়াশুনা
আবদুল হক	'অদ্বিতীয়া'	:	ঢাকা, ১৯৫৬, নওরোজ কিতাবিস্তান
আশরাফ উজ-জামান খান	'সয়লাব'	:	ঢাকা, ১৯৫৬, ওদুদ পাবলিকেশন্স
জসীম উদ্দীন	'মধুমালা'	:	ঢাকা, ১৯৫৬, শেখ মনিরুদ্দিন এণ্ড কোং
জসীম উদ্দীন	'পল্লীবধূ'	:	ঢাকা, ১৯৫৬, নওরোজ কিতাবিস্তান
জসীম উদ্দীন	'বাদল বাঁশী'	:	পল্লীবধূ, বাদল বাঁশী ও 'করিম খাঁর বাড়ী' একত্রে ১৯৫৬ সালে প্রকাশ করেন
জসীম উদ্দীন	'করিম খাঁর বাড়ী	:	ঐ
আসকার ইবনে শাইখ	'অগ্নিগিরি'	:	ঢাকা, ১৯৫৯ (১৩৬৬) সাতরং প্রকাশনী
আসকার ইবনে শাইখ	'অনুবর্তন'	:	ঢাকা, ১৯৫৯, ঈসা ব্রাদার্স
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	'ঝড়ের পাখি'	:	ঢাকা, ১৯৫৯, লিয়াকত পাবলিশিং কোং
আলাউদ্দিন আল আজাদ	'মরক্কোর জাদুকর'	:	ঢাকা, ১৯৫৯, জয়নাল আবেদীন, শ্রেষ্ঠনাটক গ্রন্থে সংযোজিত
ফররুখ শিয়র	'সামনের পৃথিবী'	:	সিরাজগঞ্জ, ১৯৬০, বেগম খালিদা খাতুন
আযীম উদ্দীন	'মা'	:	ঢাকা, ১৯৬০, ওরিয়েন্ট লংম্যানস
আযীম উদ্দীন	'অহংকার'	:	ঢাকা, ১৯৬০, ইতিকথা বুক ডিপো
রাজিয়া খান	'আবর্ত'	:	ঢাকা, ১৯৬০, ওরিয়েন্ট লংম্যান
নুরুল মোমেন	'যদি এমন হোত'	:	ঢাকা, ১৯৬০, আমেনা মোমেন
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	'বহিপীর'	:	ঢাকা, ১৯৬০, ওরিয়েন্ট লংম্যানস
আবদুল মতিন সরকার	'অভ্যুদয়'	:	ঢাকা, ১৯৬০, ৫৪ ইসলামপুর রোড

খ. ষাটের দশকের ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটকে তার প্রভাব
(১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত)

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনাসমৃদ্ধ নাটক

নাট্যকার	নাটক		প্রকাশনার তথ্য
আসকার ইবনে শাইখ	'অনেক তারা হাতছানি'	:	ঢাকা, ১৯৬৫, বাংলা একাডেমী আসকার রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত
মুনীর চৌধুরী	'চিঠি"	:	ঢাকা, ১৯৬৬, বাংলা একাডেমী
সিকান্দার আবু জাফর	'মাকড়সা'	:	ঢাকা, ১৩৬৬, সমকাল পত্রিকা

সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নাটক

নাট্যকার	নাটক		প্রকাশনার তথ্য
আশকার ইবনে শাইখ	'রক্তপদ্ম'	:	ঢাকা, ১৯৬১, বাংলা একাডেমী আসকার রচনাবলীতে (৪র্থ খণ্ড) সংযোজন করা হয়
মুনীর চৌধুরী	'রক্তাক্ত প্রান্তর'	:	ঢাকা, মাঘ ১৩৬৮, ১৯৬১, বাংলা একাডেমী
নুরুল মোমেন	'নয়াখান্দান'	:	ঢাকা, ১৯৬২, বাংলা একাডেমী
আলাউদ্দিন আল আজাদ	'ইহুদির মেয়ে'	:	ঢাকা, ১৯৬২, সাহিত্য ভবন (শ্রেষ্ঠ নাটক' গ্রন্থে সংযোজিত)
নুরুল মোমেন	'আলোছায়া'	:	ঢাকা, ১৯৬২, মোমেন পাবলিকেশন্স
আলাউদ্দিন আল আজাদ	'মায়াবী প্রহর'	:	সিলেট, ১৩৬৯, (১৯৬২) সাহিত্য ভবন (শ্রেষ্ঠ নাটক গ্রন্থে সংযোজিত)
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	'যা হতে পারে'	:	ঢাকা, ১৯৬২
আসকার ইবনে শাইখ	'এপার ওপার'	:	ঢাকা, ১৯৬২, পূর্ব পাকিস্তান সমবায় দপ্তর। নাটকটি আসকার রচনাবলীতে সংযোজন করা হয়নি
আযীম উদ্দিন আহমেদ	'কাঞ্চন'	:	ঢাকা, ১৯৬২, গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী
আনিস চৌধুরী	'মানচিত্র'	:	ঢাকা, ১৯৬৩, বাংলা একাডেমী
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	'উত্তর ফাল্গুনী'	:	ঢাকা, ১৯৬৪, বাংলা একাডেমী
আলাউদ্দিন আল আজাদ	'ধন্যবাদ'	:	ঢাকা, ১৯৬৪, গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	'তরঙ্গভঙ্গ'	:	ঢাকা, আষাঢ়, ১৩৭১ (১৯৬৫), বাংলা একাডেমী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	'সুড়ঙ্গ'	:	ঢাকা ১৯৬৪, বাংলা একাডেমী

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	'উজানে মৃত্যু'	:	ঢাকা, ১৩৭০ (১৯৬৩) সমকাল পত্রিকা
আনিস চৌধুরী	'এ্যালবাম'	:	ঢাকা, ১৯৬৫. বাংলা একাডেমী
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	'সংযুক্তা'	:	ঢাকা, ১৯৬৫, বাংলা একাডেমী
সিকানদার আবু জাফর	'সিরাজ-উ-দ্দৌলা	:	ঢাকা ১৯৬৫, বাংলা একাডেমী
মুনীর চৌধুরী	'মানুষ'	:	কবর নাট্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রাম ১৯৬৬, শাহীন বুক ক্লাব
মুনীর চৌধুরী	'দন্ড'	:	(তিনটি একাঙ্কিকা একত্রিত করে 'দন্ডকারণ্য' নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়) চট্টগ্রাম ১৯৬৬, শাহীন বুক ক্লাব
মুনীর চৌধুরী	'দন্ডধর'	:	ঐ
মুনীর চৌধুরী	'দন্ডকারণ্য'	:	ঐ
সিকানদার আবু জাফর	'শকুন্ত উপখ্যান'	:	ঢাকা (১৯৬৮), সমকাল ৫ম বর্ষ ১৩৬৮, ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়
সাঈদ আহমদ	'কালবেলা'	:	ঢাকা ১৯৬৩, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা মাসিক পরিক্রম কালবেলা, মাইলপোস্ট, তৃষ্ণায় তিনটি নাটক একত্রিত করে সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক নাম দিয়ে ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমী গ্রন্থটি প্রকাশ করে।
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	'শিলা ও শৈলী'	:	ঢাকা ১৯৬৬, বেগম হাসনাত রশীদ
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	'সুর ও ছন্দ'	:	ঐ
নুরুল মোমেন	'আইনের অন্তরালে'	:	ঢাকা ১৯৬৭, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স
শওকত ওসমান ও রামেন্দু মজুমদার	'ক্রীতদাসের হাসি'	:	ঢাকা ১৯৬৮, পুথিঘর
মুনীর চৌধুরী	'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য	:	(পলাশী ব্যারাক, ফিটকলাম, আপনি কে, একতলা-দোতলা, মিলিটারী ও বংশধর কয়েকটি একাংকিকা সংকলন), ঢাকা ১৯৬৯, মাওলা ব্রাদার্স
মুনীর চৌধুরী	'একটি মশা'	:	একাংকিকা সহূহ চল্লিশের দশকে রচিত।
মুনীর চৌধুরী	'নেতা'	:	একাংকিকাসমূহের মধ্য দিয়ে সমকালীন দেশকাল সুতীক্ষ্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরী	'গুণ্ডা'	:	একাকিংকাগুলি পরবর্তীতে 'মুনীর চৌধুরী রচনাবলী' প্রথম খণ্ডে সংযোজন করা হয়েছে।
মুনীর চৌধুরী	'বেশরিয়তি'	:	ঐ
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	'একে একে এক'	:	ঢাকা ১৯৬৯, বেগম হাশমত রশীদ
নুরুল মোমেন	'শতকরা আশি'	:	ঢাকা ১৯৬৯, মোমেন পাবলিশিং হাউস
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	'রূপান্তর'	:	ঢাকা ১৯৬৯, বাংলা একাডেমী
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	'ধানকমল'	:	ঢাকা ১৯৬৯, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা
নুরুল মোমেন	'যেমন ইচ্ছা তেমন'	:	ঢাকা ১৯৭০, বাংলা একাডেমী
নুরুল মোমেন	'রূপলেখা'	:	ঢাকা ১৯৭০, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ
নুরুল মোমেন	'হোসেন সফদারের উইল'	:	ঢাকা ১৯৭০, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ
আসকার ইবনে শাইখ	'শেষ অধ্যায়'	:	ঢাকা ১৯৭০, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ
আসকার ইবনে শাইখ	'প্রচ্ছদ পট"	:	ঢাকা ১৯৭০, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ
সাঈদ আহমদ	'মাইল পোস্ট	:	ঢাকা ১৩৭৬, মাসিক মোহাম্মদী, ৬৭শ বর্ষ : ২য়–৪র্থ সংখ্যা
সাঈদ আহমদ	'তৃষ্ণায়'	:	ঢাকা ১৯৬৯, বাংলা একাডেমী কালবেলা, মাইলপোস্ট, তৃষ্ণায় তিনটি নাটক একত্রিত করে 'সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক' নাম দিয়ে বাংলা একাডেমী ১৯৭৬ সালে প্রকাশ করে।
জিয়া হায়দার	'শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ'	:	ঢাকা ১৯৭০, বাংলা একাডেমী

গ. বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত)

নাট্যকার	**নাটক**		**প্রকাশনার তথ্য**
মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ	'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (রচনাকাল : ১৯৭১)	:	'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাম দিয়ে তিনটি নাটক ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ	'এবারের সংগ্রাম' (রচনাকাল : ১৯৭১)	:	ঐ
মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ	'স্বাধীনতার সংগ্রাম' (রচনাকাল : ১৯৭১)	:	ঐ
কল্যাণ মিত্র	'জল্লাদের দরবার' (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড) (রচনাকাল : ১৯৭১)	:	বগুড়া ১৯৭২, সাহিত্য কুটির
কল্যাণ মিত্র	'একটি জাতি ও একটি ইতিহাস (রচনাকাল : ১৯৭২)	:	কুষ্টিয়া ১৯৭২, জয়শ্রী মিত্র, আমলাপাড়া
আলাউদ্দিন আল আজাদ	'নিঃশব্দ যাত্রা' (রচনাকাল : ১৯৭২)	:	('শ্রেষ্ঠ নাটক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) ঢাকা ১৯৯৯, বাংলাবাজার
মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ	'বর্ণচোরা' (রচনাকাল : ১৯৭২)	:	('স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত), ঢাকা ১৯৭৭
আলাউদ্দিন আল আজাদ	নরকে লাল গোলাপ (রচনাকাল : ১৯৭২)	:	('শ্রেষ্ঠ নাটক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত), ঢাকা ১৯৯৯, বাংলাবাজার।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

বাংলা গ্রন্থ

১. অজিত কুমার ঘোষ : বাংলা নাটকের ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ১৯৭০, কলিকাতা

২. -ঐ- : নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, ১৩৯৭, কোলকাতা দে'জ পাবলিশিং

৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৭৮, কলিকাতা-১২

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬১, কলিকাতা-১২

৫. আশুতোষ ভট্টাচর্য ও অজিত কুমার ঘোষ : শতবর্ষে নাট্যশালা (সম্পাদিত) প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৭৩, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা-৯

৬. আজহার ইসলাম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ) ১৯৬৯

৭. আজহার ইসলাম : সাহিত্যে বাস্তবতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫

৮. আসকার ইবনে শাইখ : পূর্ব পাকিস্তানের নাটক, ১৩৭০

৯. আব্দুল মতিন : ভাষা ও একুশের আন্দোলন, ঢাকা প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬

১০. আবুল মনসুর আহমদ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ২য় মুদ্রণ ১৯৭০, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

১১. আবদুল হক : ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব : ঢাকা ১৯৭৬

১২. আব্দুল হাই ও আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৯

১৩. ইসমাইল মোহাম্মদ : নাট্যকলার ক্রমবিকাশ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

১৪. কবীর চৌধুরী : প্রসঙ্গ নাটক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১

১৫. কবীর চৌধুরী : এ্যাবসার্ড নাটক ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৬. কবীর চৌধুরী : গডোর প্রতীক্ষায় ১৯৮১, ঢাকা, মুক্তধারা

১৭. কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য : বাংলা একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব, প্রকৃতি ও বিকাশ, ১৯৮৮, কোলকাতা, নবগ্রন্থ কুটির

১৮. কে.এম. রাইছউদ্দিন খান : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা (প্রাচীন যুগ ও আধুনিক যুগ), প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৬, ঢাকা

১৯. গোলাম মুরশিদ : সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ১৩৯০

Dhaka University Institutional Repository

২০. গোলাম মুরশিদ : বাংলা নাট্য সাহিত্যের বিষয়বস্তুর বিবর্তন (১৮৫২-১৮৭৬) ১৩৯০

২১. জিয়া হায়দার : নাট্য ও নাটক, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২২. জিয়াউল হাসান : মুনীর চৌধুরীর নাটক, ১৯৯০, মুক্তধারা, ঢাকা

২৩. জীনাত ইমতিয়াজ আলী : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা। শিল্পতরু প্রকাশনী ১৩৯৯/১৯৯২

২৪. বিপুল রঞ্জন নাথ : বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮০

২৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলাদেশের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯১

২৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ : নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

২৭. বশীর আল হেলাল, : ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫

২৮. বদরুদ্দীন উমর : পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৭০

২৯. বদরুদ্দীন উমর : ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল (২য় খণ্ড) প্রথম প্রকাশ ১৩৯২/১৯৮৫

৩০. বৈদ্যনাথ শীল : বাংলা সাহিত্যের নাটকের ধারা, কলিকাতা ২য় সংস্করণ ১৯৭৭

৩১. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৭, দ্বিতীয় ১৯৮১

৩২. মুকুল চৌধুরী (সম্পাদিত) : ভাষা আন্দোলন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

৩৩. মোহাম্মদ মজির উদ্দিন : বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, রাজশাহী

৩৪. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন : বাংলাদেশের ছোটগল্প জীবন ও সমাজ (১৯৫০-১৯৭২) বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

৩৫. মোহাম্মদ ফরহাদ : ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, ঢাকা

৩৬. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

৩৭. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন : মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

৩৮. ধনঞ্জয় দাস : আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাংলাদেশ, মুক্তধারা, কলকাতা ১৯৭১

৩৯. নীলিমা ইব্রাহিম : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক. বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৬৪

৪০. নীলিমা ইব্রাহিম : বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, ১৩৭৯, ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান

৪১. রফিকুল ইসলাম : ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার, ঢাকা ২য় প্রকাশ ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

৪২. রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক (১৯৭২-১৯৯৮), ঢাকা, ১৯৯৯

৪৩. সাধন কুমার ভট্টাচার্য : নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩৬৯

৪৪. সেলিনা হোসেন : উনসত্তরের গণ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৮৮৯

৪৫. সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় : জসীমউদ্‌দীন, ইস্ট পাকিস্তান পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৬৭

৪৬. সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কলিকাতা-১৯৭২

৪৭. সুকুমার বিশ্বাস : বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা (১৯৪৭-১৯৭০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮

৪৮. সৈয়দ আকরম হোসেন : মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, ১৯৭২, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৪৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবন ও সাহিত্য, মিনার্ভা বুকস, ঢাকা ১৯৮১

৫০. সৈয়দ শওকতুজ্জামান : বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা স্বরূপ ও সমাধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

৫১. সৈয়দ জামিল আহমেদ : হাজার বছর বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

৫২. সৈয়দা খালেদা জাহান : পূর্ব বাঙলার নাটক ও বাঙালি সমাজ, এম.এ শেষ বর্ষ থিসিস (পাণ্ডুলিপি) ১৯৭৮

৫৩. সৈয়দা খালেদা জাহান : নুরুল মোমেন ও তাঁর নাটক এম.ফিল থিসিস (পাণ্ডুলিপি) ১৯৭৫

৫৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১ম খণ্ড থেকে ১৫ খণ্ড পর্যন্ত)

ইংরেজি গ্রন্থ

১. B. Ifor Evans : A Short History of English Literature, Penguin Books, London. 1961

২. Cazamian Louis and Emile Legouis : History of English Literature, Published by J.M. Dent and Sons Ltd. Adline House, Bedford Street, London, Revised Ed. 1971

৩. Eliot, T. S : Elizabethan Dramatist-Published Faber and Faber Ltd. 24, Russell Square. London

৪. Hudsson ; W : An Introduction To The Study of English Literature

Dhaka University Institutional Repository

৫. John Gassner (Ed) : Twenty Best Plays of the Modern American Theatre 16th Printing 1939. New York Crown Publishers

৬. Kabir Chowdhury : Three Plays by Munir Chowdhury, Second Print, 1990, Dhaka, Bangla Academy

৭. P. Guha Thakurta : The Bengali Drama its origin and development, London, 1930

৮. Samuel Beckett : Waiting for Godot, Oxford University YMCA Library Building Jail Singh Road, New Delhi 100001, Ninth impression 1977

পত্র-পত্রিকা

১. আনিসুজ্জামান : কবর, রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত থিয়েটার, পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭, ঢাকা

২. আতাউর রহমান : থিয়েটার ঃ পালা বদলের ইতিবৃত্ত, 'মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত আবহমান বাংলা, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩), ঢাকা, ইন্দিরা রোড

৩. আবু হেলা মোস্তফা কামাল : মুনীর চৌধুরীর নাটক, 'কথা ও কবিতা' ১৯৮১, ঢাকা, মুক্তধারা

৪. আলী ইমাম : 'কবর' প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, থিয়েটার, পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭, ঢাকা

৫. আবু জাফর শামসুদ্দিন : 'আমাদের কবিতা' সমকাল, সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক–অগ্রহায়ণ ১৩৭০

৬. আলী আনোয়ার : বাংলাদেশের নাটক ঃ সমস্যা ও প্রবণতা, রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত 'ত্রৈমাসিক থিয়েটার', ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

৭. ইসমাইল মোহাম্মদ : পুস্তক সমালোচনা 'নয়াখান্দান' সমকাল পত্রিকা, সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৯

৮. ইসমাইল মোহাম্মদ : সামনের পৃথিবী, নাট্য সমালোচনা, মাসিক সমকাল, সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত, ষষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ঢাকা, চৈত্র ১৩৬৯,

৯. ইসমাইল মোহাম্মদ : নাট্যকার সিকানদার আবু জাফর, সমকাল সিকানদার আবু জাফর স্মৃতি সংখ্যা

১০. নীলিমা ইব্রাহিম : নাট্যকার মুনীর চৌধুরী, থিয়েটার, ঢাকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

১১. বেগম আকতার কামাল : তরঙ্গভঙ্গ ঃ একটি অভিব্যক্তিবাদী নাটক,, সাহিত্য পত্রিকা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ষড়বিংশ বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা শীত ১৩৮৯

১২. মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত ঃ থিয়েটার ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

১৩. মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ : মুনীর চৌধুরীর কবর 'থিয়েটার' পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭, ঢাকা

১৪. মাহবুবা সিদ্দিকী : নাট্যকার সিকান্‌দার আবু জাফর 'সাহিত্য পত্রিকা' মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, শীত ১৩৮৬

১৫. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর : স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর ঃ বিষয় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ একুশের প্রবন্ধ ১৯৮৮

১৬. মেহের নিগার : সাঈদ আহমদের নাটকে অ্যাবসার্ড ধর্ম, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এক চল্লিশ বর্ষ॥ তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০৫

১৭. রফিকুল ইসলাম : আজাদী উত্তর নাট্য সাহিত্যে নাগরিক চেতনাবোধ, এলান, ঈদ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৬৮

১৮. একুশের সংকলন ১৯৮০, স্মৃতিচারণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮০

১৯. একুশের সংকলন ১৯৮৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা